আদরিণী।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৫ম খণ্ড]　　১২৯১ সাল।　　[১ ম সংখ্যা।

সম্পাদকীয় উক্তি।

গত বৎসবেব প্রথম দুই মাসেব আদবিণী বাহিব করিয়াই, আমি নানা প্রকার বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, আর আদরিণী বাহির করিতে পারি নাই—তজ্জন্য সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট অপরাধী—আশা কবি, তাঁহারা দয়া কবিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করিতে কৃপণতা করিবেন না।

আজি কত আহ্লাদে অভাগিনী আদবিণীর পঞ্চবার্ষিক জীবনোৎসব লিখিয়া পবম পরিতোষ লাভ করিতাম, কিন্তু সে সুখ আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না, সে দোষ আদরিণীব নয়—আমার। গতবর্ষে আদরিণীর যেরূপ গ্রাহক ছিলেন, তাহাতে আদবিণীর অকুণ্ঠিত ভাবে সাহিত্য কাননে ভ্রমণ

করিবার কোন বাধাই ছিল না, কিন্তু আজি সম্ভবতঃ তাহার সে দিন নাই—আজি আবার তাহাকে নূতন করিয়া অপরিচিতের ন্যায় বঙ্গ সাহিত্য সমাজে অবতীর্ণ হইতে হইল। আশা করি, গ্রাহক ও পাঠকগণ তাহাকে চিনিতে পারিবেন। আদরিণীর মধুর নাম বোধ করি, একেবারে তাহাদের কোমল স্নেহপূর্ণ প্রাণ হইতে অপসৃত হয় নাই।

সরল সাহিত্যের উন্নতি সাধনাই আদরিণীর মুখ্য উদ্দেশ্য। তিন বৎসর ধরিয়া বালিকা সেই হিত সাধন ব্রতে নিযুক্ত রহিয়া বঙ্গভাষার পরিচর্য্যা করিয়াছে। আবার আজি সেই আদরিণী-পাঠকগণের বদন প্রতি চাহিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল। তাহারা কি বালিকাকে উৎসাহ দিবেন না?

আদরিণীতে যে সমস্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন গ্রাহকই এ পর্য্যন্ত কোন কথা উত্থাপন করেন নাই, বোধ হয় তাহা তাঁহাদের মনঃপূত হইয়াছে। কিন্তু আমরা গ্রাহকগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা প্রবন্ধের উপযোগিতা অথবা কিরূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইলে আদরিণী তাঁহাদের নিকট আরও আদর পাইবে, তদ্বিষয় আমাদিগকে উপদেশ দেন। আমরা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আদরিণী আনন্দময়ী বালিকা, আদরিণীর এখনও গভীর চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে নাই, সেই নিমিত্তই আদরিণীতে কষ্টকল্পনাভূত গাঢ়চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় নাই। সংক্ষেপ, আদরিণী যে উদ্দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, আপনাকে গল্প ও ভাবের সাময়িক পত্রিকা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছায় সাহিত্য সংসারে অবতরণ করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় সিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু গ্রাহকগণের রুচিই আদরিণীর রুচি, গ্রাহকগণের মনস্তুষ্টিই আদরিণীর দীক্ষা-মন্ত্র, সুতরাং গ্রাহকগণ যদ্যপি আদরিণীতে সেরূপ চর্ব্বিতচর্ব্বণ প্রভৃতির কূটতর্ক ভালবাসেন, তাহা হইলে আদরিণী বালিকা হইলেও সে কার্য্যে যুবতীর বা কোন বিজ্ঞ যুবকের সমকক্ষ হইতে বোধ হয় অপারগ হইবে না। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে, অনেকে বঙ্গদর্শন প্রভৃতির অনেক প্রবন্ধ পাঠ করেন না। অধিক কি, জোড়া পাতা জোড়াই থাকে, কাটাও হয় না, সেই সকল দেখিয়া শুনিয়াই আমরাও সাহসী নহি, সুতরাং আদরিণীর

কোমল কলেবরে সেরূপ কঠিন দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া, মালিকার উদ্যম ভঙ্গ করিতে সাহস পাই না। আশা করি, আদরিণীর চিরহিতৈষী প্রিয় গ্রাহক ও পাঠকগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যথাযথ মতামত লিখিয়া আমাদিগকে সন্তোষিত করিবেন।

আমাদের এই নব উদ্যমে সাহিত্য সংসারের সুপরিচিত অনেক গুলি লেখক তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত নূতন রত্নালঙ্কারে আদরিণীর কম কলেবর সুসজ্জিত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আরও যাঁহাদের অটুট যত্নে আদরিণী কয় বৎসরে এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, আজি আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদের সহিত আমার এত আত্মীয়তা, এত বন্ধুতা, যে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিলে পাছে তাঁহারা কিছু মনে করেন, সে নিমিত্ত তাহা উল্লেখে বিরত হইলাম।

আজি একটী বৎসরের পর আমাদের প্রিয় পাঠকগণকে বিজয়ার সসম্মান অভিবাদন করিয়া নূতন জীবনে নূতন তেজে উত্তেজিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম। আশা করি, এবার আদরিণী সাহিত্য জগতে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

উপসংহারে ইহা এক মাত্র উল্লেখ্য যে গ্রাহকগণই আদরিণীর আশা ভরসা ও উপলক্ষ। তাঁহারা বালিকাকে তাহার এই ভগ্নোদ্যমে উৎসাহ দিলেই যে তাহার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

একটী কুসুমের প্রতি।

১

নির্জ্জন বিপিন মাঝে একটী কুসুম হের,
ফুটে অনুরাগ ভরে,
নবীন শাখার 'পরে,
মৃদুল পবন ভরে মৃদু মৃদু হাসে ওই,
দেখি তারে প্রাণে হেন কেন বিচলিত হই ?

২

নন্দন-সুরভি-মুগ্ধ বাতাস বহিয়া যায়,
আসে অলি ঘুরে ঘুরে,
তার পানে দেখে ফিরে,
থাকে থাকে ধীরে ধীরে বাতাসে সাঁতার দেয়,
পশি তাহে, মধুপিয়ে, প্রাণ পুরে সুখ নেয়।

৩

প্রকৃতি গড়েছে তোরে, স্বভাবের শোভা তুই,
থরে থরে সাজাইয়ে,
বিবিধ বরণ দিয়ে,
মরি কি মোহিনী শোভা ধরেছ শাখার 'পরে,
ভ্রান্ত মানবের মন সুধু কি লইতে হবে ?

৪

লহ প্রাণ ক্ষতি নাই, আমি তোরে চাই সই,
বুকেতে পুষিব তোরে,
যতনে রাখিব ধরে,
হাসিবে এমনি তুমি চির দিন প্রেম ভরে,
হাসে যথা সোহাগিনী পতিপ্রাণা রমণীরে।

৫

হাসিবে কি? না না, আমি জানি তোরে সুহাসিনী
ভুলিবে দুদিন পরে,
শুকাবে বিরাগ ভরে,
কে জানে কুসুম তব পরাণ কেমন ধারা,
সোহাগ বুঝ না তুমি, কর প্রাণ সুখ হারা।

৬

সংসার কানন মাঝে রমণী কুসুম আছে,
সে কি ফুল তোর মত,
প্রেম হারা, অবিরত—
কাঁদায় প্রেমিক জনে বিরহে দহিয়া হেন,
প্রণয় অশার যদি আমি ভালবাসি কেন?

৭

না ফুল তোমার কথা শুনিব না শুনিব না,
নারীর প্রণয় দেখে,
তুমি না প্রণয় শিখে,
আপন মনের দুখে আপনি শুকায়ে মর,
তাই বল কুহকিনী নারী প্রেম পরিহর?

৮

শিখাতে পিরীতি তোরে, তুলি ফুল নানা জাতি
যতনে গাঁথিয়া মালা,
সাজাব প্রিয়ের গলা,
আমি তোরে পরিব না, ছুঁইব না ছুঁইব না,
প্রণয়ের প্রতিদান যতদিন শিখিবি না।

———

রমণী।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রমণীর প্রেম।

এ নশ্বর জগতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহা সরল হৃদয় রমণীর অতুলনীয় প্রেমের সহিত তুলনা করা যায়? যে প্রণয়ের মধুময় উৎসে গা ঢালিয়া দিয়া পুরুষ পার্থিব সুখের চরম সীমা সন্দর্শন করে, যে প্রেম উপভোগে কঠিন বিশ্ব সংসারকে স্বর্গের সহিত তুলনীয় জ্ঞান করে, যাহার মৃদু আস্বাদনে জগতের যাবতীয় দুঃখ বিস্মৃত হয়, সে প্রণয়ের তুলনীয় বস্তু এ বিশ্ব সংসারে আর কোথায়?

রমণীর অতুলনীয় প্রেমাস্বাদন মানবের তুল্য ভাগ্যধর নর এ জগতে আর নাই। এ সংসারে এমন প্রাণী নাই যে, প্রণয়ের দাস নহে। প্রণয় মনুষ্যকে অন্ধ করে এবং প্রণয়ের জন্যই পুরুষ রমণীর এত বাধ্য। সুতরাং রমণীর প্রেম জগতের অতুলনীয় বস্তু।

যে প্রেমের উৎসব বসন্তে, যে প্রেমে যুবক যুবতীর সন্তোষ, যে প্রেমে বৃদ্ধ যুবা, বর্ষিয়সী যুবতী, যে প্রেমে পুরুষ পাগল, রমণী জ্ঞান রহিতা, যে প্রেমে সংসার, যে প্রেমে পৃথিবী পরিচালিত হইতেছে, সেই প্রেমে মুগ্ধ নয় কে?

রামাচরণ বাবু স্বগৃহে সস্ত্রীক উপবিষ্ট— তাঁহার বয়স পঁচিশের উর্দ্ধ নহে, দেখিতে গৌরবর্ণ, সুন্দর চক্ষু, উন্নত নাসিকা, মনোহর ওষ্ঠ যুগল,—গঠন পরিপাটী। তাঁহার স্ত্রীর নাম রমণী, বয়স পঞ্চদশবর্ষ মাত্র, বর্ণ পূর্ণোজ্জ্বল, নিতম্বলম্বী কেশ, আকর্ণ চক্ষু, মনোহর কর্ণ, মনোমুগ্ধকারী নাসিকা,

বিম্বাধর—তাহা তাম্বুল রাগে রঞ্জিত হইয়া যুগল গোলাপ কলিকার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নয়নের জ্যোতিঃ যৌবনের ছটায় ফাটিয়া বাহির হইয়া যেন সংসারীকে সংসার ভুলিতে বলিতেছে, অপ্রণয়ীকে প্রণয় শিখিতে কহিতেছে, এবং যোগীর যোগ ভঙ্গের প্রয়াস পাইয়া রমণীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারই যেন জগতের সার পদার্থ ইহাই জ্ঞাপন করিতেছে। বক্ষের উচ্ছ্বাস পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের গরিমার অক্ষয় পোষকতা করিতেছে। অঙ্গের গঠন পরিপাটী,—যুবতী স্বামীর স্কন্ধে স্বীয় মস্তকটী রক্ষিত করিয়া দেয়ালের একটী চিত্র প্রতি অনন্যমনে চাহিয়া রহিয়াছে। অধরে মৃদু হাসি চঞ্চল চপলার ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া মৃদু আলোক বিকাশ করিয়া নিবিতেছে। যুবক স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা যুবতীকে বেষ্টন করিয়া, স্থির দৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া, যেন সেই সৌন্দর্য্য সাগরের কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। [illegible]। এ সুখের নিকট কি আর ইহ সংসারে কোন মনোরম পদার্থ আছে?

যুবক ক্ষণেক স্থির দৃষ্টে রমণীর সুন্দর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার প্রাণ বড়ই বিকলিত হইল, চক্ষে জল আসিল, দেখিতে দেখিতে সেই জল যুবতীর গোলাপী অধরে নিপতিত হইল।—যুবতী চমকিয়া উঠিল, দেখিল, স্বামীর চক্ষুর্দ্বয় জলে পূর্ণ, ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া মৃণাল দর্প খর্ব্বকারী দক্ষিণ ভুজে বামাদরণের স্কন্ধ দেশ বেষ্টিয়া বলিল "তুমি কাঁদিছ?"

পরস্পরের চক্ষে পরস্পরের চক্ষু সম্মিলিত হইল, যুবতীর সেই ইন্দীবর নয়ন যুগল হইতে অঝোরে সলিল সম্পাত হইতে লাগিল। দম্পতিদ্বয় রোদন পরায়ণ হইলেও সে ক্রন্দনে যে তাহাদের হৃদয়ে কি অননুভূত আনন্দের উদ্রেক হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করিতে এই দুর্ব্বল ভাষার শব্দ নাই, ক্ষীণ লেখনীর ক্ষমতা নাই। সে সুখ হৃদয় বুঝে, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না,—সে কল্পনার সুখময়ী স্ফূর্ত্তি কবি হৃদয়ে সহজে জাগরূক হয়, কিন্তু বিকাশ হয় না। সে অনন্ত সুখ মন বুঝে, কিন্তু বর্ণনা করিতে পারেনা, তাহা নীরব কবির নীরব ক্ষমতার আয়ত্তাধীন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে বিচ্ছেদ।

বামাচরণ আপন বাহুযুগল দ্বারা রমণীর গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া সেই সুন্দর গোলাপী অধরে একটী চুম্বন করিয়া মৃদু অথচ আর্ত্তস্বরে কহিলেন—"রমণি! দরিদ্রতাই সকল সুখের বিঘ্ন কারক। আমার যদ্যপি প্রচুর অর্থ থাকিত, বা অর্থের অভাব না থাকিত, তাহা হইলে তোমায় ত্যাগ করিয়া অর্থ উপাসনার জন্য বিদেশ যাইব কেন? ঈশ্বর আমার প্রতি নিতান্তই বাম, সেই জন্য তোমার ন্যায় স্ত্রী, যাহার অক্ষয় ভালবাসা আমার হৃদয়কে স্বর্গতুল্য করিয়াছে, যাহার প্রেমময় বদন মাধুরী বিলোকন করিলে নয়ন স্পন্দন রহিত হয়, যাহার মোহিনী মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপটে গাঢ় রূপে অঙ্কিত, যে আমার নিদ্রার স্বপ্ন, যাহাকে আমি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করি, আজি আমার সেই প্রেমরূপিণী জীবন সর্ব্বস্বকে ত্যাগ করিয়া বিদেশ গমন করিতে হইবে, প্রাণাধিকে। ইহা কি সামান্য দুঃখ।"

রমণী আপন মস্তকটী বামাচরণের বক্ষে ধীরে রক্ষিত করিয়া কহিল,—"না বামাচরণ। তাহা হইবে না, আমি তোমায় কোথাও যাইতে দিব না, তুমি এই স্থানে কোন চাকরীর চেষ্টা কর—কম বেতন হয়, তাহাও ভাল।"

বামাচরণ ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সে নিশ্বাসে যেন কত দুঃখ, কত যাতনা, কত ক্লেশ উচ্ছ্বাসিত হইল,—তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"তাহা কিরূপে হইবে, কার্য্য সমাধা হইতে অনেক বাকি, শেষ না হইলে টাকা পাওয়া যাইবে না। বিশেষতঃ বাটী বন্ধক দিয়া কর্জ্জ করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা ত তুমি জান।"

রমণী। কার্য্য শেষ হইয়া বিল পাশ হইতে কতদিন লাগিবে?

বামাচরণ। পাঁচ ছয় মাসের কম নয়।

রমণী। তবে তুমি এখন যাইলে আর পাচ ছয় মাস আসিতে পারিবে না।

বামাচরণ। বোধ হয় না।

রমণীর চক্ষে আবার প্রবল বেগে বারিধারা বহিল, বলিল—"না তাহা হইবে না, আমি থাকিতে পারিব না, তোমায় ছ-মাস না দেখিয়া বাঁচিব ?

বামাচরণ। কি করিবে ভাই।

রমণী। আমায় লইয়া চল।

বামাচরণ। সেখানে কখন কোথায় থাকি তাহার স্থিরতা নাই, নতুবা লইয়া যাইতাম।

রমণী আবার কাঁদিল। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর বলিল—"তবে আজ যাওয়া হইবে না।" বামাচরণের বদন প্রতি দীন নেত্রে চাহিল, দুইহস্তে স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া সজল চক্ষে বলিল—"বল যাবে না ?"

বামাচরণ রমণীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া একটী গাঢ় চুম্বন করতঃ তাহার অপরূপ মুখাবলোকনে আপন নয়ন পরিতৃপ্ত করিয়া বলিলেন "না হয় কাল ই যাইব।"

রমণী তখন ক্ষণেক প্রকৃতিস্থ হইয়া গৃহান্তরে কেশ রচনা করিতে গেল।

তখন বেলা অবসান হইতে আর বিলম্ব নাই—সূর্য্যদেব রক্তিম লোচনে পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে আকাশ পটে ভাসিতে ভাসিতে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিতেছেন। সূর্য্যদেবের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যেন পক্ষিগণ উল্লাসসহ কোলাহল করিতে করিতে, তাহার প্রচণ্ড তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে ভাবিয়া আপনাপন আত্মীয়গণকে তৎসংবাদ প্রদান করিতে নীড়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। জাহ্নবীর অমল বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা মৃদু বাতাসে সঞ্চালিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে; অথবা চন্দ্রদেবের আগমন উপলব্ধি করিয়া অনন্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেন এক দৃষ্টে আকাশ পানে চাহিয়া আছে। বৃক্ষগণ আপনাপন শাখা প্রশাখা

নাড়িয়া যেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে,—দূরে ঝিল্লী ঐক্যতান বাদনে শ্রুতি সম্মোহন করিতে কৃতযত্ন হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিরহ।

সময় কাহারও বাধ্য নহে, সময় কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে না। যথা সময়ে রাত্রি আসিল, ক্রমে সে রাত্রিও পোহাইল। রামাচরণের পশ্চিম যাইবার দিন উপস্থিত হইল। রামাচরণ বাবু এলাহাবাদে কণ্ট্রাক্টের কার্য্য করিতেন, এই তাঁহার প্রথম উদ্যম, সুতরাং তিনি পতিপ্রাণা রমণীর প্রণয় সাগরে ভাসিয়া আর স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিলেন না। তাঁহার এলাহাবাদ যাইবার সময় ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল।

বেলা অবসান কালে রামাচরণ বাবু প্রণয়িনী রমণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। বিদায় কালে দম্পতিযুগলের শোক উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ের কি রূপ উদ্বেল হইয়াছিল তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। সেই ছল ছল চক্ষু, হৃদয়গত যাতনা জনিত মৃদু অধর কম্পন, হৃদয়ের বিদীর্ণ হইবার প্রবল বাসনা—সে কথা, সে ভাব, সে যাতনা, ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে বড় একটা বুঝিবে না।

মনুষ্যের সুখ চিরস্থায়ী নহে, ইহাই বড় দুঃখ। এত প্রেম, এত আহ্লাদ এত সুখ কোথায় গেল, প্রেম নদীতে সুখের যে পূর্ণ জোয়ার স্থির ভাবে ছিল, আজি তাহা একেবারে কমিয়া গেল, যাহারা আজি কয় দিবস আনন্দের উচ্চ শিখরে সমারোহন করিয়াছিল, আজি তাহারা সহসা তথা হইতে নিপতিত হইল। প্রেমতরঙ্গে যে হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল, আজি তাহা সহসা শান্তভাব ধারণ করিল।

রামাচরণ বাবুর বাটী চুঁচুড়ার বড়বাজারে, বাটীটী ইষ্টক-প্রাচির দ্বারা বেষ্টিত, মধ্যে দুইটী পোক্তা ঘর ও একটী মেটে রন্ধন গৃহ। রামাচরণ

বাবুর ইহ সংসারে সেই প্রণয়রূপিণী পতিপ্রাণা পত্নী ব্যতীত অপর কেহই নাই। সেই বাটীর মধ্যে রমণী ও একটী দাসী ব্যতীত অপর কেহই থাকিত না। বামাচরণ বাবুর বাটীর পার্শ্বে তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতির বাটী।

মনুষ্যের চিরবিরহ সহ্য হয়, কিন্তু বিরহ সহ্য করা বড় ক্লেশ সাধ্য। আশা মনুষ্যকে উন্মাদ করিয়া তুলে, রমণী প্রতি দিন প্রতি মূহুর্ত্ত বামাচরণ বাবুর ধ্যানে মগ্ন; তিনি কবে আসিবেন, কবে তাঁহার সহবাসে সুখী হইবে, কবে তাঁহার সহিত প্রাণ ভরিয়া কথা কহিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

এই রূপেই দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দুই মাস অতীত হইয়া গেল।

রমণী নিজে লেখা পড়া জানিত না, বামাচরণ বাবুকে কোন পত্র লিখিতে হইলে বা তাঁহার কোন পত্র আসিলে তাহা পাঠ করিবার জন্য অপরের সহায়তা লইতে হইত।

বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে বামাচরণ বাবুর এক খুল্লতাত ভ্রাতার বাটী, তাঁহার বাটীতে তাঁহার স্ত্রী, একটী শিশুপুত্র ও তাঁহার স্ত্রীর যুবা ভ্রাতা থাকিত। তাঁহার স্ত্রীর সহিত রমণীর বিশেষ প্রণয় ছিল, উভয়কে এক মাতৃ-গর্ভজাত ভগ্নী বলিয়া প্রতীতি জন্মিত। বামাচরণ বাবুর খুল্লতাত ভ্রাতৃ পত্নীর ভ্রাতার নাম বসন্ত—বসন্ত সুবাদে রমণীর ভ্রাতা হইলেন, তিনিই বামাচরণ বাবুকে কোন পত্র লিখিতে হইলে বা তাঁহার নিকট হইতে সমাগত পত্রাদি পাঠ বিষয়ে রমণীকে সহায়তা করিতেন।

এই সকল বিষয়ের সহায়তা করিতে বসন্ত মধ্যে মধ্যে রমণীর নিকটে আসিতেন। মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় কে বলিতে পারে? সময়, সুযোগ, এবং প্রলোভনে কাহার চরিত্র কিরূপ হয় তাহা কে জানে? অতি যে অসৎ চরিত্র সম্পন্ন তাহারও চরিত্র উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, এবং যাহার চরিত্র দেবোপম হয়ত তাহার চরিত্রও পিশাচের ন্যায় জঘন্য হইয়া যায়।

বসন্তের অন্তরের কথা আমরা এখনও জানি না, কিন্তু সে এখন রমণীর

সহিত কিছু অধিক ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল, রমণীর নিকট প্রায় যায়, বাটীতে বসিয়া তামাকু খায়, এবং নানা রকমের নানা গল্প করে। রমণী প্রথমতঃ এত ঘনিষ্ঠতা ভালবাসিত না। বসন্ত সতত তাহার বাটীতে আসিত, গল্প করিত, তামাকু খাইত, ইহা তাহার ভাল লাগিত না, অথচ তাহার বিরক্তির কারণও বসন্তকে বলিতে সাহস করিত না, একবার তাহার ভগ্নীকে বলিয়া তাহাকে সতত আসিতে নিষেধ করিয়া দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু বলিতে পারিল না, মনে করিল পাছে তাহার ভগ্নী রাগ করে।

এইরূপ তদবস্থ ভাবেই কিছু দিন অতিবাহিত হইল, ক্রমে সময়ের ক্ষমতার প্রভাবে মনে হইল—"আসিলেই বা ক্ষতি কি, আমি ত ঠিক আছি, আমার মন খারাপ হইবার নয়, তাহা বিচলিত হইবার উপায় নাই। বসন্ত আসিয়া গল্প করে তাহাতে ক্ষতি কি, আমি একা থাকায় আমার সময় যেন অতীত হয় না, কেবল মন উদাস হয়,—না হয় বসন্তের সহিত গল্প করিলাম, তাহাতে আমার মন অনেকটা ভাল থাকিবে।"

রমণী এত দিনে বসন্তের সমাগম ভালবাসিল এত দিনে তাহাকে পান সাজিয়া দিল, বসন্ত তাহার পরদিন ঠিক সেই সময়ে আবার বলিল "কই আজ পান দিলে না" রমণী আবার পান দিল, সেই পর্য্যন্ত প্রত্যহ পান দিতে হয়।—ক্রমে জল খাওয়ান এবং তাহার ভগ্নীকে সন্তোষ করিতে কখন কখন রাত্রে লুচী ভাজিয়া খাওয়ানও চলিতে লাগিল।

পূর্ণিমা রাত্রে আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে কি চন্দ্রের স্থায়িত্ব আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে না? মনের দৃঢ়তা আছে বলিয়া কি সে দৃঢ়তা বিদূরিত হইতে পারে এ কথা চিন্তা করিতে নাই? যে রমণী এ কথা বুঝেনা তাহাকে সে নিমিত্ত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হয়, যে রমণী স্বামীর অনুপস্থিতে মানসিক প্রচণ্ড দৃঢ়তা সত্ত্বেও অপর পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া গল্প করে, সতত কথাবার্ত্তা কহিতে ভালবাসে, তাহার চরিত্র নিশ্চয়ই পদ্মপত্রস্থিত জলবৎ তরল। আমরা সে চরিত্রের প্রশংসা করি না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুরুষের প্রাণ।

আজি দুইমাস অতীত হইল বামাচরণ বাবু এলাহাবাদে আসিয়াছেন। কণ্ট্রাক্টের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কার্য্য যত শেষ হইয়া আসিতেছে, তাঁহার হৃদয় ততই আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। কেন না কার্য্য শেষ হইলেই তিনি স্বদেশে যাইবেন এবং তথায় তাঁহার প্রণয়িণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিরহ-তাপ-দগ্ধ হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবেন। তিনি যে প্রণয়িণী বিরহে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন তাহা বলা বাহুল্য।

বামাচরণ বাবুর বাসার পার্শ্বে একটী কায়স্থের বাস ছিল, স্বজাতি বলিয়া বামাচরণ বাবু তাঁহার বাসাতেই আহারাদি করিতেন, একদিন সন্ধ্যার পর তিনি আহারান্তে আপন বাসায় বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, এমন সময়ে একটী ষোড়শ বর্ষিয়া সযৌবনা অপরূপ-রূপ-শালিনী রমণী-রত্ন তাঁহার সম্মুখীন হইল। বস্তুতঃ এরূপ রূপের বিকাস, এরূপ নিখুত সুন্দরী, অতি অল্প নয়নই দেখিয়াছে। বিধি বিড়ম্বনায় যুবতী বাল্যকালেই বিধবা হইয়া পিতা মাতার অনন্ত দুঃখের কারণ হইয়াছে। বামাচরণ বাবু যাঁহার বাসায় আহারাদি করিতেন, যুবতীটী তাহারই একমাত্র কন্যা, নাম—গোলাপ।

অবলা বঙ্গবালা। তোমার কোমল ললাটে বৈধব্যের ঘোর মসীলেখা কোন নিষ্ঠুর দিয়াছিল? যুবতীর মধুর ওষ্ঠে বিষাদের ভীষণ চিহ্ন দেখিয়া যে নিষ্ঠুর সমাজের হৃদয় বিকলিত হয় না, যাহার কঠোর চক্ষে জল আইসে না, সে দেশে কেন কোমল কামিনী-পদ্মের বিকাশ হয়? আমরা বলি কামিনী কুলের মধ্যে বঙ্গের বিধবারাই মন্দ ভাগিনী। যদ্যাপি কন্যার চক্ষের অশ্রুধারা দর্শনে পিতা মাতার হৃদয় বিকলিত না হয়, তবে আর কাহার হইবে? হা বিধাতঃ! বঙ্গের ভাগ্যে এমন সুপ্রসন্ন দিন কবে

আসিবে, যে দিন বঙ্গ সমাজ অবলার দুঃখ বুঝিবে, বিধবার নয়ন জল মুছাইবে ? সে অস্বপ্ন-কল্পিত সুখ আশা কি দগ্ধাদৃষ্ট বঙ্গ-ললনার ভাগ্যে ফল-বতী হইবে ? বিধাতা কি তাঁহার বঙ্গবালাগণের প্রতি করুণ-নেত্রপাত করিবেন ? মন্দ ভাগিণী বঙ্গীয় কামিনী কুলের অদৃষ্ট কি এত প্রসন্ন হইবে ?

যুবতী বামাচরণবাবুকে পান দিয়া নিকটে দাঁড়াইল। বস্তুতঃ সেই ক্ষীণ দীপালোকের সাহায্যে সে রূপের যে কি অপরূপ বিভা বিকাশ পাইল, তাহা বলা যায় না। বামাচরণ বাবু একবার যুবতীর প্রতি পূর্ণদৃষ্টি করিলেন, তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, তিনি তাহা সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না, নয়নবারি ধীরে স্খলিত হইয়া অবাধে ভূমি চুম্বণ করিল। সেই নয়নাসার এক একবার, নাসিকাপ্রান্তে আসিয়া আলোক সাহায্যে হীরক খণ্ডবৎ শোভা পাইতেছিল, যুবতী নির্ণিমেষ লোচনে তাহা দেখিতেছিল।

গোলাপ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বলিলেন "বামাচরণ! কথা কহিবে না ?"

বামাচরণ বাবু ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "কি কথা কহিব গোলাপ।"

গোলাপের অধর প্রান্তে বিষাদ সুচক মৃদু হাসি দেখাদিল, বলিলেন "কি কথা, কথার কি সীমা আছে।"

বামাচরণ। গোলাপ, বলিতেকি তোমার সহিত কথা কহিতে আমার ভয়হয়, তোমার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হয়,।

গোলাপ। বামাচরণ, আমার অবস্থা দেখিয়া তোমার দুঃখ হয় ইহাই আমার শ্রুতির অপরিসীম পরিতোষ, দেখ ভাই, আমি কবে বিধবা হইয়াছি জানি না, যৌবনে পদার্পন করিয়া এই কএক বৎসর যে কি দুর্নিবার যাতনাকে পদ দলিত করিতেছি, তাহা আমিই জানি। যখন প্রথম তোমায় দেখি, তখনই আত্ম সমর্পণ করি, তখন বালিকা, জ্ঞানশূন্যা, কেন করিলাম জানিনা। মনে হইল, তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, হয়ত তোমার সহবাসে আমি সুখী হইব, তুমি আমার হইবে, আমি তোমার

হইব, আমি তোমায় ভালবাসি, হয়ত তুমিও আমায় ভালবাসিবে, কিন্তু আশা বিফল হইল। কত কষ্টে, কত করিয়া মনোভাব নির্লজ্জ ভাবে তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, কিন্তু ছিল এক, হইল আর, যে আশাটুকু ছিল তাহাও গেল। এখন নিরাশ হৃদয়েও তোমায় ভালবাসি। অনেক সময়ে মনকে বুঝাই যে নিস্ফল ভালবাসিয়া লাভ আছে কি? মন বলে নাই, কিন্তু ভালবাসিতেও ছাড়ে না। ভাই বামাচরণ, মনে করিওনা যে আমি তোমায় প্রতারণা করি, নানা কথা কহিয়া তোমার মনকে মুগ্ধ করি, তোমায় আমার প্রতি সমধিক অনুরক্ত করিতে কৃতযত্ন হই। না না সে ভাব যেন তোমার হৃদয়ে স্থান পায় না। আমি সকল কথা সকল অপবাদ অবনত শিরে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু আমার হৃদয় দুর্ব্বল এ কথা প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারি না। কেহ যদ্যপি আমার হৃদয়ে উত্তপ্ত সীসক ঢালিয়া দেয়, তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারি কিন্তু প্রলোভনা আমার ভালবাসা লাভের পথ প্রদর্শক একথা আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি জানি, যে কোন ভাগ্যবতী তোমার হৃদয়-পটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তোমার হৃদয়-কাননের মান্দার কুসুম, তোমার প্রণয়-নদীর সুখ তরঙ্গ। আমি জানি যে তুমি প্রাণ অপেক্ষা তাহাকে ভালবাস, তোমায় সমস্ত ভালবাসা তাহার চারু করতলে সমর্পণ করিয়াও তোমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় নাই, যেন তাহা অপূর্ণ রহিয়াছে, যেন কিছুতেই মন উঠেনা।—যদি প্রণয় আকাশ ব্যাপী হইত, যদি তাহা সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত হইত, যদি তাহা সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ সম্পন্ন ও প্রকাণ্ড হইত, যদি নক্ষত্রের ন্যায় অগণ্য হইত, তাহা হইলেও তোমার মন তৃপ্ত হইত না, তথাপি তুমি আকাঙ্ক্ষা দগ্ধ হইতে, তোমার হৃদয়ের যে অপূর্ণতা সেই অপূর্ণতাই রহিয়া যাইত। সে দেবতা বাঞ্ছিত প্রেমময় হৃদয়ের অধিকারিণী হইব এমন কি ভাগ্য করিয়াছি ভাই? আমি হতভাগিণী আমার কপালে সে সুখ হইবে কেন?—আর মনে করিও না যে তোমার স্ত্রীর ন্যায় পতিব্রতা রমণীর সুখাধার আমি বঞ্চনা করিয়া আত্মসাৎ করিব। আমার সে বাসনা নাই—এক জনার সুখের কণ্টক হইয়া আপন সুখ বৃদ্ধি লালসা যাহার হৃদয়ে আছে তাহার তুল্য নৃসংশ জীব ইহ জগতে আর নাই, সে মনুষ্য নয়, পশু!

বামাচরণ, বলিতে কি আমি যাহাই হই না কেন, ভালবাসিয়া, না বুঝিয়া আত্ম সমর্পণ করিয়া আমি যদি কোন গর্হিত কার্য্যও করিয়া থাকি, তথাপি আমি যে সেরূপ পশু হইতে অনেক উন্নত এ কথা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি। ঈশ্বর আমায় কষ্ট ও দুর্নিবার যাতনা ভোগ করিতে দিয়াছেন, আমাকে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তাহা ভোগ করিতেই হইবে, কে তাহার ব্যতিক্রম করিবে ভাই? তবে তোমায় ভালবাসি, তোমায় দেখিতে ভালবাসি, কথা কহিতে ভালবাসি, তোমার কথা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে ভালবাসি,—তাই আসি, তাই কই, তাই শুনি, নতুবা অন্য আশা নাই, যত দিন প্রাণ থাকিবে, যত দিন শরীরে এক বিন্দু শোনিত থাকিবে, তত দিন আমার সে ইচ্ছা, সে আশাকে কে প্রতিনিবৃত্ত করে? ইহাতে যদ্যপি পাপ থাকে উপায় নাই—ইহার জন্য যদ্যপি অনন্ত নরক-কুণ্ডে পতিত হইতে হয়, কি করিব, -কিন্তু তুমি তাহাতেও বাদ সাধ, যেন অনিচ্ছা সত্ত্বে কথা কও।

বামাচরণ। না গোলাপ আমি তাহা ভাবি না, আমি ভাবি পাছে ঘনিষ্টতায় তোমার মন সমধিক বিচলিত হয়, ও তুমি আরও কষ্ট পাও, সেই জন্য অধিক কথা কহি না, মনে করি হয়ত তুমিও কহিবে না।

গোলাপ। কথা না কহিতে এক একবার ইচ্ছা করি, কিন্তু মন মানে না, প্রাণ জ্বলিয়া উঠে, বড় কষ্ট হয়,—তাই আবার কত ছলে, কত কৌশলে, ছুটিয়া আসি। আর কি বলিলে,—আমার হৃদয় সমধিক বিচলিত হইবে,—বামাচরণ ছি! ছি! তুমি আমাকে এত দুর্ব্বল হৃদয় বলিয়া জ্ঞান কর? আমি কি তোমার নিকট অভিসারে আসি বলিয়া বিবেচনা হয়?

বামাচরণ বাবু কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "না গোলাপ আমি তাহা ভাবিনা, যদি এ সংসারে কিছু পবিত্র থাকে, তবে তাহা তোমার হৃদয়—কিন্তু মনের ভাবকে বিশ্বাস কি, আমার মনও ত চঞ্চল হইতে পারে।"

গোলাপ। ছি বামাচরণ, তোমার এ কথায় আমি বড় লজ্জিত হইলাম, তোমার স্ত্রী শুনিলে আরও লজ্জিত হইতেন, যাহা হউক তোমার হৃদয় যে এত দুর্ব্বল তাহা জানিতাম না, আমি তোমার হৃদয়গত দুর্ব্বল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিব না,—আমি চলিলাম।

গোলাপ আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন। বামাচরণ বাবু

পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে ক্ষণেক বসিয়া রহিলেন, পরে গোলাপের মনোহর পবিত্রতা সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হৃদয়ের অযস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

— —

নৈশ বিহার।

শ্মশানে।

ঘোর অমাবস্যা রজনী, প্রকৃতি সতী ঘোরান্ধকারে আবৃতা হইয়া ভয়ঙ্কর বেশধারণ করিয়াছে, এই নিস্তব্ধ জগতপ্রাঙ্গণে সেই ফুল, সেই তরু, সেই লতা, সেই সকলি বর্ত্তমান কিন্তু আজি সে সকল শোভা কোথায়? আজি কেন সেই সমস্ত শোভা, সন্তোষ ও আনন্দের পদার্থ মানবের নয়নপথে পতিত হইয়া তাহার মন প্রাণ হরণ করিতেছে না, তাহাকে অতুল আনন্দে মাতাইতেছে না, তাহাকে সেই সুখের, সন্তোষের, আহ্লাদের, প্রীতির শীর্ষ স্থানে উপনীত করিতেছে না। যে মানব এই বসন্ত কালে, এই ঋতুরাজের সুখ কালের পূর্ণিমা রজনীতে এই বিশ্বরাজ্যের অতুল শোভা-সম্পদ বিলোকনে চরিতার্থ ও পুলকিত হইয়াছিল, আজি কেন সেই মানব, সেই সমস্ত শোভার পদার্থ বর্ত্তমান সত্বেও পূর্ব্বমত আনন্দ অনুভব করিতেছে না। মন বিস্ময় সুখ ও শান্তির অনন্ত সহবাসে উধাও হইয়া আনন্ত সাগরে ভাসিতেছে না?

প্রকৃতির ক্ষণ পরিবর্ত্তনের সহিত মানব মন কেন এত নিকট সম্বন্ধে বদ্ধ? মানব তুমি কি বাহ্য চাকচিক্যে ভুলিয়া যাও, মোহিত হও? সুধাংশুর তরল কিরণে তোমার নয়ন দর্পনে যে শোভা যে সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, অমাবস্যার তামসী মূর্ত্তিতে কি তাহার কিছুই দেখিতে পাও না? এই বিশ্বজনিন অতুল অপরিমেয় শোভার গম্ভীর ভাব কি একবারও তোমার

হৃদয়ে উত্থিত হয় না। কি বিড়ম্বনা, কি লাঞ্ছনা, মানব ইহা তোমার পক্ষে বড় লজ্জার কথা।

যে মানব অতুল সুখৈশ্বর্য্যে প্রভুত্বে জগত বিস্মৃত হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, আত্মজ্ঞান হারায়, তাহার নিকট পূর্ণিমা ব্যতীত অমাবস্যা কি প্রীতির বস্তু হইতে পারে? কিন্তু মানব, তুমি না হিতাহিত বিবেচ… তুমি না জগতের যাবতীয় জীব শ্রেষ্ঠ? তবে তুমি চিরকাল জ্যোৎস্না ভা… বাস কেন? এ জীবনে চির জ্যোৎস্না নাই, ইহাতে ক্রমান্বয়ে অমাবস্যা পূর্ণিমার চক্র নেমি ঘূর্ণিত হইতেছে,—পাঠক, বল দেখি তুমি তোমার এই জীবনে কতবার পূর্ণিমা দেখিয়াছ, আর কতবার অমাবস্যা দেখিয়াছ? আমার বোধ হয় সমান,—জ্যোৎস্না ও অন্ধকার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল, তবে মানব তুমি অন্ধকারে এত বিরক্ত কেন?

ইহ জীবনে সুখ দুঃখ ওতপ্রোত ভাবে অমাবস্যা পূর্ণিমার ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল, ইহজগতে ইহসংসারে এমন কে আছে যে বলিতে পারে, আমি সুখ দুঃখের আবর্ত্তনে পতিত হই নাই, কে এমন আছে যে চির সুখভোগ করিয়া আসিয়াছে। এই সংসার এই সাধের সংসার, পৃথিবীর নন্দনকানন আমার নয়নপথে বর্ত্তমান। যেখানে যাহাদিগকে লইয়া আমি একদিন অনন্ত সুখ-সম্ভোগ করিয়াছি, প্রীতির অনন্ত উৎসে উচ্ছাসিত হইয়াছি, আত্মজ্ঞান হারাইয়াছি, ইহ জীবনে সংসারিক সুখ অক্ষয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, আজি আবার কেন সেই সকল, সেই সমস্ত পরিজন বর্ত্তমানেও আমি সে সুখ পাই না, গত সুখ আকাশ কুসুম বলিয়া ধারণা হয়, গত কার্য্যকলাপ স্বপ্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে? তাই বলি মানব তুমি জ্যোৎস্না ভালবাস কিন্তু সংসারে চিরপূর্ণিমা কোথায় পাইবে ভাই?

আবার বলি পূর্ণিমা রজনীতে তুমি যে কুসুমাবলীর মধুর হাসি দেখিয়া মাতিতে, আজি তুমি সে হাসি দেখিয়া মাতনা কেন? ফুল কি অমাবস্যায় সেই পূর্ণিমার ন্যায় হাসে না, না—অমাবস্যার অন্ধকারে তোমার হৃদয় আচ্ছন্ন তাই তুমি তোমার মানস চক্ষে সে হাসি দেখিতে পাওনা, তরু শিরে আর পুষ্পগুলিকে প্রেমভরে সমীরণ সহ হেলিতে দুলিতে নাচিতে ঢলিতে দেখিতে পাওনা? তবে তোমার মানসিক অবস্থার বৈলক্ষণ্যই

এই সমস্ত চঞ্চলতা প্রকাশের কারণ। সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তনেও মানব এই অবস্থার পরিবর্ত্তনে অবস্থিত হয়। এক সময়ে প্রিয়তমার যে হাসি পৃথিবীকে স্বর্গ করে, প্রাণাধিক কুমারের কুন্দদন্তের মধুর হাসি সংসারকে নন্দনকানন বলিয়া প্রতীয়মান করায়, আবার অন্য সময়ে তোমার সেই প্রিয়তমা, সেই যৌবনের সুখ সহচরী আনন্দময়ী প্রাণাধিকা তোমার সুখ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হয় না, তোমার সেই জীবনের সুখ উৎস স্বরূপ প্রিয়পুত্র তোমার হৃদয়ের চিন্তানল নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, তাই বলি, মানব যেমন পূর্ণিমা ভালবাসে, সেই রূপ সুখ ভালবাসে, আবার যেমন অমাবস্যাকে ঘৃণা করে, সেইরূপ দুঃখকেও করিয়া থাকে, কিন্তু কিসে দুঃখ কিসে সুখ তাহা বুঝে না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সত্বা সত্ত্বেও যেমন অমাবস্যা তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, সেইরূপ দুঃখের উৎপত্তি অমূলক প্রকৃত দুঃখমূলক না হইলেও তাহার কারণ নির্দ্দেশে অসমর্থ হইয়া তাহার কবলস্থ হয়, তাহার আয়ত্বাধীন হয়।

যে মানবের হৃদয়গত বৈশম্যের কারণ এত ক্ষীণ, এত অমূলক, সে মানব জগতের শ্রেষ্ঠ জীব কিসে? আমি মানব মাত্রকেই এ শ্রেণির অন্তঃর্ভুক্ত করিলাম না, কিন্তু অধিকাংশ মানবই যে এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ কি? তবে মানব, তবে তোমার এত দ্বেশ, এত হিংসা, এত পরানিষ্ঠ চেষ্টা, এত প্রভূত্বলাভ বাসনা কেন? যে এত ভ্রান্ত, যে অকারণে পরের ন্যায্য অবস্থা বিচার না করিয়া এতদূর বিকল চিত্ত হয় আমি তাহাকে কেন ভক্তি করিব?

আমি একদা অমাবস্যা রজনীতে মানব জীবনের এইরূপ অসারতা চিন্তা করিতে করিতে ভাগিরথী উপকূলস্থ পথে বিচরণ করিতেছিলাম, তখন রজনী বেশ প্রগাঢ় হইয়াছে, মহানগরী কলিকাতা প্রায় সুষুপ্ত, কেবল মাত্র পতিত পাবনী ভাগিরথী আপন অসুপ্তাবস্থা পরিজ্ঞাত করিয়া আমার দক্ষিণদিকে কুল কুল রবে প্রবাহিতা হইতেছিল, কিন্তু তাহার প্রশান্ত কলেবর আমার নয়নপথে পতিত হইতেছিল না, সকলি অন্ধকারময়, গ্যাশালোকের সাহায্যে যতটুকু দেখিতে পাওয়া যায় ততটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম, তাহার পরে আর কিছুই নাই, কেবল অন্ধকার, প্রাণহারী অন্ধকার,

আব মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থানে তবণীর ভিতর হইতে আলোক বশ্মি বাহির হইয়া গঙ্গাবক্ষে মৃদু মৃদু নাচিয়া তৎ তৎস্থানে ভাগিবথীর স্থায়িত্বের প্রমাণ দিতে ছিল। প্রকৃতির অতুল শোভা দেখিতে না পাইয়া যেন আকাশ সহস্র চক্ষু বাহির করিয়া স্থিব দৃষ্টে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে যেন তাহাব দুই একটী পৃথিবীতে তাহাদের অন্বেষণে আসিতেছিল, কেহ বা আসিতে আসিতে পথে লুকাইতেছিল।

এমত সময়ে আমাব সম্মুখে ঘন অন্ধকাব মালা বিচ্ছেদ কবিয়া অনল-শিখা দৃষ্ট হইল, সুকৃষ্ণা রমণীব অধবে ঘোব তাম্বুলবাগেব মনোহর ছটা যেন সহসা বিকাশ পাইল। আমি স্তম্ভিত ও বিকল চিত্ত হইয়া দেখিলাম—শ্মশান।

মানব, শ্মশান কি তাহা জান কি? তোমাব ইহ জীবনেব চবমসীমাব শেষ পথ, তোমার দেশ, হিংসা, অহঙ্কাব, ঈর্ষা প্রভৃতি বিস্মৃত হইবার প্রধান উপদেষ্টা। এই শ্মশানে এই ঘোব শ্মশানে কিছুই থাকে না, সকলেবই শেষ হয়, আহা মনুষ্যকে সাম্য শিক্ষা দিতে কোন জ্ঞানী এই মহা শ্মশানের সৃষ্টি কবিযাছিল রে?

যেখানে রূপের মাহাত্ম্য নাই, কুৎসিতেব হতাদব নাই, জ্ঞানিব মর্য্যাদা নাই, অজ্ঞানীব অবহেলা নাই, ধনবানের আদব নাই, নির্ধনেব হতাদব নাই. যেখানে বৃদ্ধ, যুবা, অন্ধ, খঞ্জ সকলে সমান আদব পায়, আহা তাহা কি পুণ্যস্থান, অতএব শ্মশান তুমিই আমাব সকল পুণ্য ক্ষেত্রের প্রধান স্থল, আমি তোমাকে প্রাণ ভবিয়া, হৃদয় পুবিয়া ভালবাসিব।

মানব তুমি এই শ্মশানকে ভয় কবিও না, হতাদব করিও না, তুমি মূর্খ বা পণ্ডিত হও, তোমাব বিবেক থাকুক বা না থাকুক, তুমি একবাব এই মানব জীবনের সমাধীস্থল মহাশ্মশানে এইরূপ সময়ে আসিও দেখি। যদি তুমি মনুষ্য হইতে চাও, যদ্যপি মনুষ্য জীবনেব ক্ষণ ভঙ্গুবতা বুঝিতে চাও, যদ্যপি সুখ দুঃখেব ক্ষণিক চঞ্চল পবিবর্ত্তনকে হৃদয় মধ্যে স্থান দিতে না চাও, তবে একবার এইস্থানে আসিও। দেখিবে এই মহাশ্মশানে তোমার জ্ঞান বুদ্ধির অতীত কার্য্য সতত সাধিত হইতেছে। মানব শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র হইতে নৃসংশ কিচক পর্য্যন্ত এই স্থানে আশ্রয় পাইয়াছে, যে স্থানে জগতের

আদর্শ জীব তাহার ইহ জীবনের স্থায়িত্বের শেষ সমাপ্তি সাধনা করে, সেই স্থানেই আবার দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ আশ্রয় গ্রহণ করে। আহা নর তোমার সেই রক্ষশ্রেষ্ঠ রাবণ কোথায়? তাহার চির সমাপ্তি কোথায় সাধিত হইয়াছে? এই মহা শ্মশানে, তবে শ্মশান তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ ইহ জগতের আর কোথায় সম্ভবে?

কিন্তু মানব, তোমায় জিজ্ঞাসা করি এই শ্মশান হইতে কি আর কিছুই শিক্ষালাভ করিতে পার না? তোমার বিপুল জ্ঞানালোকের সহায়তায় কি কিছুই দেখিতে পাও না?

তুমি যদ্যপি জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে চাও, তবে তোমার সাধের হৃদয়কে শ্মশান করিয়া ফেল। সেখানে শোক দুঃখ জরা হর্ষ প্রভৃতি সমস্ত উত্তেজনাকে সমভাবে সমান আগ্রহে আহ্বান কর, জগতের সকল শ্রেণিস্থ সকল সম্প্রদায়িক লোককে সমান যত্নে তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে স্থান দান কর তাহা হইলে তুমি নরশ্রেষ্ঠ হইবে, আমি কেন, এ জগতের সকল লোকে প্রীতি ও ভক্তি সহকারে তোমার পূজার্চ্চনা করিবে। তুমিই জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মধ্যে পরিগণিত হইবে।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুচ্ছ্বাস।

এই ঊণবিংশ শতাব্দীতে খৃষ্ট, মুসলমান, ব্রাহ্ম, শীখ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম পরিপ্লাবিত ভারতে আজি হিন্দু ধর্ম্মের আলোচনা দেখিয়া মনে এক সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইতেছে,—বহুদিনের পর লুপ্তপ্রায় আর্য্য ধর্ম্মের আন্দোলনে মন আনন্দরসে পরিপ্লুত হইতেছে। দীর্ঘকাল নিদ্রিত বাঙ্গালীর মনে কি এক অপূর্ব্ব ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে;—বাঙ্গালী যেন কি এক নূতন ব্রতে ব্রতী হইতে বসিয়াছে, আর্য্য ধর্ম্মের আত্মানন্দপ্রদ ধর্ম্মকথা আহ্লাদে শ্রবণ করিতেছে;—শুকাদি ঋষির ন্যায় বাঙ্গালী ধর্ম্ম কথা

বর্ণন করিতেছে;—বঙ্গের কি সুখের দিন। বাঙ্গালী মনে বহুদিন যে ধর্ম্ম জাতিগত একতার একমাত্র বীজ, স্বাধীনতা সাধনের একমাত্র মূলমন্ত্র; জাতি সমষ্টিকে একত্র বাঁধিবার একমাত্র বন্ধন, সেই ধর্ম্মের একতা ভারতে এককালে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আজি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম উপধর্ম্ম প্রচলিত, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারত আজি শতরূপী,—বাঙ্গালা দেশের কথা বলিতে লজ্জা করে শিক্ষিত বাঙ্গালী দিগের মধ্যে কেহ খৃষ্টান, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ তান্ত্রিক, কেহ নাস্তিক, যিনি যে পথ পাইয়াছেন সেই পথেই চলিয়াছেন, তাঁহা-দিগকেও ততটা দোষ দেওয়া যায়না, যেহেতু তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা না একটা পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, অধিকাংশ বাঙ্গালীর মধ্যে এক বারে ধর্ম্মভাব নাই বলিলেও চলে, তাঁহারা হিন্দু সমাজে থাকেন অর্থাৎ বৃদ্ধ সেকেলে পিতা-মাতার গৃহে বাস করেন, অন্ন, শাক, ডাল, পায়স পিষ্টকাদি ভোজন করেন, আপিসে কাজ কর্ম্ম করিয়া বড় সময় পাকেন না, ধর্ম্ম একটা জিনিষ যে আছে, তাহার আলোচনা করিতে হয়, সেটা মনে চিন্তা করিবারও অবকাশ পান না, মাতা পিতা বিধবা ভগ্নীর প্রতিই প্রায় বরাত করিয়া রাখেন। এই সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীকেও তত টা দোষারোপ করিতে পারি না, আর এক শ্রেণীর বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা হিন্দু দেব দেবী মান্য করেন, মাতা পিতার শ্রাদ্ধ ও হিন্দুমতে সমাধা করেন, বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকাণ্ড করিতেও ত্রুটী করেন না, গৃহ হইতে গৃহান্তর যাত্রা করিতে হইলে ও যাত্রিক দিন দেখিয়া, হাঁচি টিক্‌টীকি বাধা মান্য করিয়া চলেন, শঙ্খচিল দেখিলে ভগবতীর অবতার বলিয়া প্রণাম করেন, এবং গার্ডেন পার্টীতে প্রতি শনিবারে রাশি রাশি এক্‌সার বোতল খালি করেন, ছত্রিশ জাতি এক সঙ্গে একত্র আহার করেন, পাইল পার্ব্বণে উইলসেন হোটেলে গিয়া কারি কাটলেট ভোজন করিতেও ছাড়েন না, এবং ইংরেজের মধ্যগত হইয়া জাতীয় কুসংস্কার বিহীনতা দেখাইবার জন্য মহামাংস গ্রহণেও কুণ্ঠিত হয়েন না। সামান্যত খৃষ্ট বা ব্রাহ্ম কিম্বা অপর কোন ধর্ম্মে নাম লিখাইয়া দীক্ষা গ্রহণে যিনি না ধরা পড়িয়া

ছেন, তিনি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়া হিন্দু সমাজে থাকিয়া হিন্দু জাতি এবং হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনায়াসেই পার পাইতে পারিতেছেন। আজিকালিকার ঈদৃশী দুর্দ্দশাপন্ন হিন্দু সমাজ,—হিন্দু ধর্ম্মের ঈদৃশী দুর্গতি তাহাতে মনীষী গণের "ধর্ম্মঃ সংকুচিত স্তপো বিবহিত ;" ইত্যাদি বিষন্নির্দ্দেশক বচনের পূর্ণ সার্থকথার পরিচয় কালে যে পুনরায় বঙ্গীয় যুবক আর্য্যধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত, অর্য্যধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিতে ব্যাকুল, আর্য্যধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে উৎসুক, ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। আকস্মিক এরূপ পরিবর্ত্তনে মনে নানা ভাবের উদয় হয়। এই উণবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ পরিপূর্ণ বঙ্গে, পাশ্চত্য ভাষা, পাশ্চাত্য ধর্ম্মের প্রাবল্যে ঘোরতর বিধর্ম্মের খরস্রোতে আর্য্য ধর্ম্ম ভাসিয়া যাইতে ছিল, আজ হঠাৎ কেন আবার তাহার উজান বহিছে, এ প্রশ্ন স্বতই উত্থাপিত হইতে পারে,—হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালীচিত্তের এইরূপ সহসা বিপথগামিত্ব প্রযুক্ত বিবেচনা করিতে হইবে না যে বাঙ্গালী এতদিনের পর ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাঙ্গালী আজি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় খাম-খেয়ালী ত্যাগ করিয়া ঋষিত্ব অবলম্বন করিয়াছে, তাহা নহে, ফলত হিন্দু ধর্ম্মের চরমাবস্থায়, হিন্দু ধর্ম্মের অপঘাতের নিদান কালে যে একটী তাহার অনুকূল "মাভৈ" রব শুনিতে পাইল, এই পরমভাগ্য, কিন্তু অকালে এ সৌভাগ্যোদয়ের কারণ কি? যে কথা স্বপ্নেও কেহ ভাবে না, উপেক্ষায় চিন্তাও কখন করেনা, রহস্য ভাবে মনেও আনেনা, সে শব্দ আজি কেনই বা হইল, কেই বা আনিল? কার্য্য কারণের সহিত সংসারের প্রত্যেক ঘটনার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ! কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না! প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলেই জানা যাইবে—কেন, কোথা হইতে এই শব্দ ধ্বনিত হইল, এই বিষয়ের কারণাবধারণের পূর্ব্বে দুটী কয়েক কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। যে দিন ভারত মুসলমানের পদতলস্থ হইল, যে দিন ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তচল চূড়াবলম্বন করিল, তাহার পর ক্রমে যে রাশি রাশি যবন ভারতভূমি ছাইয়া ফেলিল, সেই দিন ভারতীর পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়িল, আর্য্য ধর্ম্মের উপর দারুণ অত্যাচার হইল, দেব দুর্ল্লভ আর্য্য শাস্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল, আর্য্য দেব দেবী নিগৃহীত হইলেন; আর্য্য-

জাতি আকস্মিক দুর্ব্বিপাকে হতবীর্য্য ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল; সেই প্রপীড়িত মর্ম্মাহত জাতির উপর, সেই বিকলাঙ্গ আর্য্য ধর্ম্মের উপর, সেই মুমূর্ষু দশাগ্রস্থ আর্য্য শাস্ত্রের উপর ক্রমিক চারি পাঁচ শত বৎসর নিদারুণ নিগ্রহ চলিতে লাগিল; যন্ত্রণাগ্রস্থ পরাধীন নিপীড়িত জাতির প্রতিভা কত দিন থাকে, ক্রমে ভারতীয় আর্য্য মেরুদণ্ড ভগ্ন বিনত ফণ বিষধরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুসলমান শাসনে ভারতীয় আর্য্যের যে কি দুর্গতি, আর্য্য শাস্ত্রের কতদূর নিগ্রহ তাহা ভারতেতিহাসবেত্তা পাঠকগণের অবিদিত নাই। কিন্তু উন্নত-শীর্ষ পর প্রাণ লোলুপ অহির বিকলাঙ্গ হইলেও দীর্ঘকাল স্থির থাকিতে পারেন না।—তাই মহারাষ্ট্রে শিবজী, পঞ্জাবে শিখগুরু, বঙ্গে প্রতাপাদিত্যের আবির্ভাব, কিন্তু ভারতে যবন তখন রক্ত-বীজ রূপী, সহসা তাহার উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব; কাজেই পরাধীনতার কাদম্বিনী কোলে সুখের বিদ্যুৎ স্ফুরণ অল্পক্ষণেই লয় প্রাপ্ত হইল। বহু-দিনের অভ্যাসে ভারতবাসীরা ক্রমে স্বাধীনতার নাম এককালে ভুলিয়া গেলেন, স্বাধীনতা শব্দ তাঁহাদিগের জাতীয় ভাষার অভিধানে যে আছে একথাও তাঁহারা বিস্মৃত হইলেন। এক প্রাণতা যে কি সামগ্রী অজ্ঞানমুগ্ধ দরিদ্র ভারতবাসীকে তখন কে শিক্ষা দেয়? সুতরাং ভারতে তখন সে কথাও নাই, সে চর্চ্চাও নাই; ঘোর অমানিশার নিশীথের ন্যায় ভারত নীরব নিস্পন্দ; স্বাধীনতা জয় লক্ষ্মী তখন যবন রাজকে আশ্রয় করিয়াছে; তখন রাজনীতির আন্দোলন যবনের,—বানিজ্য বিস্তার, পররাজ্য অধিকারে রাজ্য বিস্তৃতি যবনের, রাজৈশ্বর্য্য ভোগ রাজদণ্ড বিধানাদি যা কিছু সমস্তই যবন ভিন্ন অপর কাহার নয়; ভারতবাসী তখন কৃষিজীবী, আর্য্যশাস্ত্র তখন ব্রাহ্মণ গৃহে নিস্পন্দ ভাবে নিদ্রিত। কেবল পঞ্চশতাব্দীতে চৈতন্য দেবের সময় স্বপ্নাবস্থায় একবার জাগ্রতবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। ফলতঃ যবনাধিকারের প্রারম্ভে ভারতীয় আর্য্যজাতি, আর্য্যশাস্ত্র এবং আর্য্যধর্ম্মের উপর যাদৃশ অত্যাচার হইয়াছিল, যবন রাজত্বের শেষাবস্থায় ততটা ছিল না; তখন হিন্দুসমাজ মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ আর্য্যধর্ম্মের এবং আর্য্যশাস্ত্রের সুষুপ্তি ভঙ্গ হইতেছিল। ফলতঃ পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ভারতীয় আর্য্য, ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের উপর যতদূর রাজ-নিগ্রহ হইয়াছিল

এমন কোন জাতির উপর, কোন ধর্ম্মের উপর হয় নাই, কিন্তু তথাপি এই ভুবন-পূজ্য অমৃত নিঃস্যন্দিনী দেব ভাষার, বা পরম পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম যে নির্ম্মূল হয় নাই, ইহাই ভারতীয় আর্য্যের মহৎ গৌরব! সনাতন আর্য্যধর্ম্ম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেও ছিল, আজিও আছে, কিন্তু অধুনা নিতান্ত হীনবল এবং প্রতিভাশূন্য। যে আর্য্যধর্ম্ম যবন রাজত্বেও জীবিত ছিল, যে আর্য্য-শাস্ত্র সাদরে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সমালোচিত হইত, বহু পীড়নেও যে ধর্ম্ম, যে শাস্ত্র যে জাতির একবারে উচ্ছেদ হয় নাই, সেই ধর্ম্ম, সেই জাতি, সেই শাস্ত্র ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে একবারে অস্তিত্ব বিহীন বলিয়া প্রতীত হইল, ক্রমে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম মধ্যে নানা প্রকার অনাচার প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণ মধ্যেও শাস্ত্রালোচনার বিরলতা পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠিল, সকলেই অর্থকরী রাজভাষা শিক্ষার জন্য লালায়িত হইল; ব্রাহ্মণ শাস্ত্রালোচন ও যজন ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজীস্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন, বৈদ্য আপনার চিকিৎসাশাস্ত্রানুশীলন বিমুখ হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে অব-হেলা করিলেন, সকল জাতিই আপনাপন জাতীয় শাস্ত্র, জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় উপজীবিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরেজী শিক্ষারূপ মহামন্ত্র সার করিলেন, তাহার ফল ভাল হইল কি মন্দ হইল সে বিষয়ের আন্দোলন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, ফল কথা ইংরাজী শিক্ষা সংক্রামক হইলে আর্য্যভাষা, আর্য্য-শাস্ত্র, আর্য্যধর্ম্ম অস্তগিরি গুহায় বিলীন প্রায় হইল। তখন হিন্দু-শাস্ত্রের নাম উপকথা, হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা, এবং হিন্দুজাতির আখ্যা "নিগার" হইয়া পড়িল। যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রলয়কালীন প্লাবনের ন্যায় ভারত প্লাবিত করিল, ইংরেজী সাহিত্য ইংরেজী দর্শন বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বিদ্যালয় সমূহে অধীত হইতে আরম্ভ হইল, তখন সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত দর্শন বিস্মৃতির গভীর কন্দরে লুক্কায়িত হইল। উচিত কথা না বলিলে মহাপাপ অর্শে, উপকারীর উপকার স্বীকার না করিলে ঘোর অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়; ইংরাজী শিক্ষার বলে ভারতবাসীর জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল, ভারতবাসী আপনাকে চিনিতে পারিল, আপনার জাতীয় গৌরব বুঝিতে পারিল; জাতীয় একতার ফল দেখিতে পাইল, স্বাধীনতার পবিত্র নাম শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করিল। মুসলমান রাজত্বে ভারতবাসী সময়ে

সময়ে স্বাধীনতা লাভ প্রয়াসী হইয়া অনেকবার অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু জাতিগত একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার প্রকৃত উপাসনা করিতে জানিত না। বহু সুকৃতি ফলে পূর্ব্ব-জন্ম দীক্ষিত মহামন্ত্র যাঁহার স্মৃতি পথবর্ত্তী হইত, তিনিই সেই মন্ত্র স্বয়ং যপ করিয়া সিদ্ধকাম হইবার প্রয়াস পাইতেন, অন্যকে সেই বীজমন্ত্র সাধন অভ্যাস করাইতেন না।

" মলিন মুখ চন্দ্রিমা ভারত তোমারি "

ইত্যাদি উদ্দীপনা মন্ত্রে সাধারণের মনে ভারতের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগ্রত করিতে যত্নবান হন নাই, আজি ভারতীয় যুবকের কর্ণে সেই অমৃতময় মধুর উদ্দীপনা বিঘোষিত হইতেছে,—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

এই মহামন্ত্র সকলেরই কর্ণে প্রদত্ত হইতেছে। আজি ভারত আপন কর্ম্ম, আপন ধর্ম্ম সকলই বুঝিতে পারিতেছে। আজি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ধনীর প্রাসাদে, দরিদ্র কুটীরে, বালক বৃদ্ধ বনিতা কণ্ঠে এই মহামন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে; কেহ কেহ বা এই শবশঙ্কুল শ্মশান ভূমিতে সেই মহা-মন্ত্র সাধনের উদ্যোগ করিতেছেন। বলিতে কি এ মহামন্ত্র আমরা ইংরেজের নিকট পাইয়াছি। ইংরেজের ইতিহাসে ইংরেজের পূর্ব্বাবস্থা দেখিয়াছি, বর্ত্তমান অবস্থা দেখিতেছি, ইংরেজের নিকট প্রাচীন গ্রীসের কথা, পুরাতন রোমের বিবরণ পাঠকরিয়া জাতীয় জীবন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি; কাঙ্গালের হারাণ নিধি ইংরেজের অনুগ্রহে আজি খুঁজিয়া পাইয়াছি; পূর্ব্ব-জন্মের সাধন মন্ত্র স্মৃতিপথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অনুকরণ প্রিয়তা পাত্র বিশেষে সুফল কুফল প্রসবকরে, ভারতবাসীর শিক্ষার দোষে দ্বিবিধ কার্যই চক্ষুস প্রত্যক্ষী-ভূত হইয়াছে। তাহাতে ইংরেজের দোষনাই, ইংরেজী শিক্ষার দোষ নাই—দোষ বাঙ্গালীর নিজের। ঘোর অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজকে অনুকরণ করিতে গিয়া স্বাধীনতা প্রিয়তার সুশিক্ষা পাইলাম, জাতীয় একপ্রাণতা

বহুদিন ভুলিয়াছিলাম তাহাও পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম, ইংবেজেব আবও অনেক সদ্‌গুণ অভ্যাস কবিলাম। ইংবেজ অনুকবণ একমাত্র লক্ষ্য কবিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইলাম, ইংবেজেব সদ্‌গুণেব সঙ্গে সঙ্গে মোহান্ধতা প্রযুক্ত অনেক মন্দ গুণ মন্দ অভ্যাসও অভ্যস্ত হইল ;—তাহাতে সমাজের অনেক অনিষ্ট হইল, তথাপি ছাডি নাই, ইংবেজ যাহা খাইতেছে, তাহা খাইতে শিক্ষা কবিতেছি, ইংবেজ যাহা পবিতেছে তাহা পবিতেছি, ইংবেজ হয়কে নয় বলিতেছে, হযকে নয় বলিতেছি, এমন সময একদল স্বজাতি বৎসল শিবয়োত্তলন কবিয়া সংস্কৃত পুবাণাদি শাস্ত্রের অনুবাদ আবস্ত করিয়া ভাবতীযগণেব শ্রুতিবিববে প্রাচীন পুবাণমাহাত্ম্যসুধা বর্ষণ কবিতে লাগিলেন। ওদিকে ইউবোপ ভূমিতে আপনাব চিবাভ্যস্ত অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিব চবিতার্থতাব উদ্দেশে ভাবতীয আর্য্যগণেব বহু পবিশ্রমেব, বিপুল বিদ্যাবত্তাব পবিচয স্বরূপ অমূল্য জ্ঞানবত্নভাণ্ডাব বেদাদি শাস্ত্র আপনার ভাষায় অনুবাদ কবিযা ভাবতীয় আর্য্যেব গুণ-গবিমা সহস্রমুখে প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—ইংবেজ যাহা বলে তাহা ধ্রুব, তাহাতে স্বজাতিয ভাষা স্বজাতীয় শাস্ত্রেব গৌববেব কথা বলিতেছে,—আব বক্ষা আছে, বেদ পুবাণাদি যেখানে যাহাছিল ভাবতেব গ্রাম পল্লী নগব হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল. জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত কবিয়া তখন বাঙ্গালী দেখিল, ইংরেজ যাহা বরাবব বলিযা আসিতেছে তাহা সত্য ;—কালীসিংহের মহাভবতেব দ্বিতীয তৃতীয় সংস্কবণ বাহিব হইল, বেদ বেদাঙ্গ উপনিষৎ সকল অনুবাদিত হইতে আবম্ভ হইল, মহাভাবতেব ইংবেজী অনুবাদ বাহিব হইতে চলিল, নগরে নগবে গ্রামে গ্রামে আর্য্য ধর্ম্ম সভাসংস্থাপন হইল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সময পাইযা আপন তৃণাচ্ছাদিত চতুস্পাটী কুটীব এবং কুশাসন ত্যাগ কবিয়া টাউন হলেব চেযাবে বসিলেন, এবং নৈমিষাবণ্যে সহস্র শিষ্য সমবেত শুকদেবের ন্যায় ইংবেজী মিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের সারকথা শিষ্যদিগকে শুনাইয়া নূতন যুগের আবির্ভাব করিলেন। এই মৃতকল্প ধর্ম্মভাবহীন ভাবতে হিন্দুধর্ম্মেব পুনরুচ্ছাস তাই আজি চতুর্দ্দিকে উত্থিত হইতেছে।

———

ঘনশ্যাম শর্ম্মা।

ইনি আমার প্রতিবেশী ছিলেন। আমাকে বালক কাল হইতে স্নেহ করায়, আমি খুড়া খুড়া বলিয়া ডাকিতাম। ঘনশ্যাম খুড়ার একখানি মেটে ঘর ছিল এবং গৃহ মধ্যে একটী শয্যাও ছিল, তাহা যেমন ময়লা তেম্নি দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, শয্যাটীর নিকট আমি ভিন্ন অপর কেহ তিষ্ঠাইতে পারিত না। শয্যা ব্যতীত কতক গুলি হাঁড়ি কল্‌সী, ২।১ টা ডাবা হুঁকো কতকগুলো তামাক টিকে, একখানি কচনকীর বাক্স, একটী গাজা রাখিবার খোলে এবং ২।৪ খানি তৈজস পত্রও ছিল; যাহা তিনি মৃত্যুকালে আমাকে উইল করিয়া দিয়া যাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেন। ঘনশ্যাম প্রায়ই পাক করিয়া আহার করিতেন না, গ্রামের চতুর্দ্দিকে বিশ ক্রোশের মধ্যে যেখানে ফলারের সন্ধান পাইতেন জাতি ভেদ এবং বর্ণভেদ স্বীকার না করিয়া, যাইয়া পাত পাতিয়া বসিয়া যাইতেন। এবং বলিতেন "গ্রামের মধ্যে কেহ পাঁচটী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলে ঘনশ্যামকে বাদ দিতে পারিবেন না।" ঘনশ্যামের বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর না থাকায় তাঁহার উপস্থিতি অনুপস্থিতি সহজে বুঝা যাইত, তিনি গৃহে না থাকিলে দ্বার দেশে তালা বন্ধ থাকিত। ইনি প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১০।১১টা পর্য্যন্ত দেশের বাবলা এবং কুলের ডাল রাখিতেন না, গোরু বাছুরের উপদ্রব নিবারণ জন্য স্বহস্তে কাটিয়া আনিয়া চালের চতুর্দ্দিকে বাঁধিয়া দিতেন। খুড়া আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এজন্য কোন স্থানে ফলারে যাইলে অগ্রে আমার জন্য লুচি সন্দেশ বাঁধিয়া আনিতেন। সে গুলো পাতের তোলা কি না, জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইত না, কি জানি পাছে চটিয়া যান। ঘনশ্যামের অনেক গুলি সৎকার্য্য ছিল, তন্মধ্যে শব বহন করা একটী মহৎ কাজ। ইনি অতিরিক্ত গাঁজা খাওয়ার শরাবটে এমন করিয়াছিলেন যে, আকার দৃষ্টে বয়ঃক্রম স্থির করা যাইত না। খুড়ার আমার ত্রিকুলে কেহ ছিল কিনা জানিনা, তবে ভগবতী নাম্নী তাঁহার এক বিধবা ভগ্নী গ্রামে কোন সমারোহের বিবাহে ঘটী

বাটী বিতরণ হইলে প্রায়ই আসিযা উপস্থিত হইতেন এবং পূজাব সময় আসিয়া পূজা বাড়ীতে ভোগ বাঁধিতেন। শোনাছিল ভগবতী ঘনশ্যামের বড, কিন্তু ঘনশ্যাম কখন ভগী বাঁডী ভিন্ন দিদি বলিযা ডাকিতেন না। ঘনশ্যাম খুড়াব একখানি কাস্তেব আকৃতি চকমকীব ইস্পাৎ ছিল, সেই খানি দিয়া যখন চকমকী ঠুকিতেন বোধ হইত যে সযোবে মন্দিবা বাজাইতেছেন। আমি সেই শব্দ শুনিযা ধনশ্যাম খুডাব আগমন বার্ত্তা জানিতে পাবিতাম এবং ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইতাম। একদিন যাইয়া দেখি খুডামহাশয় গাঁজার টানে তামাক টানিযা চোক মুখ দিয়া ধুম বাহিব কবিতেছেন। পবেব বাডী পাইযা পেটে এম্নি বোঝাই কবিযা আসিয়াছেন যে কোন স্থলে টোল টাল নাই, সহজে উকুন মাবা যায। ধূমপান শেষ হইলে সেই শয্যাটী বিছাইযা চিত হইযা শয়ন কবিলেন এবং আমাকে কহিলেন " ঐ উডানীতে বেঁধে তোব জন্যে লুচি এনেছি খা। আজ পথ হেটে আমাব বড কষ্ট হইয়াছে।" আমি মনে মনে বুঝিলাম পথ হাঁটাব নয়, অপবিমিত আহাবেব কষ্ট, কিন্তু বলিলে পাছে কষ্ট হন এজন্য কোন কথা না বলিযা আস্তে আস্তে উডানী খুলিতে চলিলাম এবং খুডামহাশয়েব মনঃতুষ্টিব জন্য বলিলাম " আপ্নি বাডী ছিলেন না, কতকগুলো গকতে সমস্ত দিন বড বিবক্ত কবেছিল, আমি কেবল আজ্ গক তাডাইযাছি।"

ধন। আহা! তাডালি কেন? যে কাঁটা বেঁধেছি গোকব কি সাধ্য আছে চাল খায়? তুই না তাডালে কতকগুলো নেঁদে দিযে যেত।

আমি বল্লাম "আপনাব দাওযা বড অপবিস্কাব কোব্তো যে?"

খুডা কহিলেন "আহা! বাবা, আমাব ঘবও যেমন দাওযাও তেম্নি হইত।"

খুড়া মহাশয়েব জীর্ণ, মলিন এবং আজীবন ঘৃত তৈলাভিষিক্ত দুর্গন্ধ উডানী খানি খুলিয়া দেখি লুচি সন্দেশ একাঙ্গ হইয়া বহিযাছে। ২।১ খানি লুচিতে তাবকাবি লাগিয়া বহিয়াছে?" খুডা কহিলেন—"লুচিব দোষ নাই, হয়েছে কি জান—পাছে আমবা লুচি কাপডে তুলি এই আশঙ্কায় অগ্রে তবকাবি তৎপবে লুচি দেয়, কিন্তু অভ্যাস কোথায যাবে? তুমি ছেলে মানুষ খেয়ে ফেল, ওতে দোষ নাই" বলিয়া আবার "ঠক ঠক্ হাপুত পুত" শব্দে চক্‌মকী ঠুকিতে লাগিলেন।

আমার লুচি সন্দেশ খাইয়া বড় তৃপ্তি বোধ হইল। আহারান্তে জল পান করিয়া খুড়ার নিকট বসিলাম। তিনি ধূমপান করিয়া শয়ন করিলে কহিলাম "খুড়া মহাশয়, বালককালে কি আপনি লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন।"

ঘন। বাবা, তাতে আমার কসুর নাই। বাপ মা শুভদিনে শুভক্ষণে হাতে খড়ি দিয়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালে ভর্ত্তি করিয়া দেন। পাঠশালা হইতে দশকর্ম্ম ও ইংরাজী পর্য্যন্ত শেখা হইয়াছে এবং শর্ম্মারাম কেরাণীগিরি কর্ম্মও করিয়াছেন শেষে যখন দেখিলাম জগতে কিছুতেই সুখ নাই, আমরা ঈশ্বরের নাট্যশালার সং বিশেষ, তখন সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গাঁজা-খোররূপ সং সাজিয়া অভিনয় দেখাইতেছি!

আমি কহিলাম "প্রথমে লেখাপড়া শেখা হয় কোথায়?" খুড়া কহিলেন "আমাদের বাড়ীর কাছে একজন সদ্গোপ গুরুমহাশয় ছিল। বাবা কোলে করিয়া লইয়া গিয়া সেই স্থানে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসেন। মহাশয়টী পেরমারা বাজ ছিলেন এজন্য এক বেলা লেখাপড়া হইত, অপরাহ্নে তিনি আমাদিগকে একা রাখিয়া খেলার আসরে প্রস্থান করিতেন এবং সন্ধ্যা-কালে আসিয়া প্রত্যেকের হস্তে এক একটী পয়সা দিয়া বিদায় দিয়া কহিতেন "সাবধান একথা বাড়ীতে প্রকাশ করো না, প্রকাশ করিলে বিতিয়ে লাল কর্‌বো।" আমরা প্রহারের ভয়ে এবং পয়সার প্রলোভনে বাড়ীতে কোন কথা বলিতাম না। মহাশয় প্রত্যহ প্রাতঃকালে যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতেন আমাকে কোলের কাছে বসাইয়া হাত ধরিয়া তালপত্রের উপর ক, খ, ডেকে ডেকে পড়াইয়া লেখাইতেন। আমি মুখে ক, খ উচ্চা-রণ করিতাম এবং হস্তখানি তিনি যেদিকে চালাইয়া লইয়া যান যদৃচ্ছাক্রমে চালাইতে দিতাম, কিন্তু আমার চক্ষু শূন্যে কখানা ঘুড়ি উড়িতেছে, তাহারা কি প্রকারে প্যাঁচ লাগিয়া গোপ্তা খাইতে খাইতে যাইতেছে সেই দিকেই চাহিয়া থাকিত। মহাশয় পশ্চাৎ ভাবে বসিয়া আছেন দেখিতে পাইতেন না বেস জানায় ঘুড়ির প্যাঁচ খেলা একমনে দেখিতাম এবং যেমন একখানি ঘুড়ি কাটিয়া যাইত "ভো কাটা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতাম, মহাশয় অমনি আমার দুগালে দুটী ঠাস্ ঠাস্ শব্দে চড় হাঁকিতেন।" মহাশয়ের প্রসাদে আমরা গাছে ওঠাটা ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছিলাম, কারণ তিনি বড়

বড় পুরাতন গাছে উঠিয়া আমাদিগকে কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া দিতে কহিতেন, এতদ্ভিন্ন আমরা কাঁটাবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাকা তাল কুড়াইয়া আনিয়া দিতাম, নারিকেল বাগানে ছুটিয়া গিয়া নারিকেলের পাতা কুড়াইয়া আনিতাম যাহা হইতে মহাশয়ের খাঙ্‌রা হইত। বাবা! উপযুক্ত গুরুমহাশয়ের হাতে পড়াতেই ঘনশ্যাম শর্ম্মা এমন বৃহস্পতি হইয়াছেন। যাহাহউক বাল্যকালে অনেকগুলি পাপ কার্য্য করিয়াছিলাম।” বলিয়া ঘনশ্যাম খুড়া উঠিয়া বসিলেন এবং তামাক সাজিয়া আবার “ঠক্ ঠক হাযুত ফুত” শব্দে চকুমকী ঠুকিতে লাগিলেন।

তাঁহার ধূমপান শেষ হইলে আমি কহিলাম “খুড়া মহাশয, আপনি বাল্যকালে কি পাপ কার্য্য করিয়াছিলেন?”

খুড়া কহিলেন “গুরুমহাশয় অত্যন্ত গোময় ভাল বাসিতেন, তাঁহার প্রসাদে পথে ঘাটে গোময় থাকিতে পাইত না, চক্ষে দেখিলেই স্বহস্তে লইয়া গিয়া সার গাদায় ফেলিয়া দিয়া সার প্রস্তুত করিতেন। আমার নবা নাপিত নামে একজন সহাধ্যায়ী ছিল। সে আমার পরামর্শে একদিন পাঠশালার দ্বারের নিকট মল ত্যাগ করিয়া তদুপরি একতাল গোময় চাপাদিয়া রাখে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলে মহাশয়কে কহিলাম “মহাশয় একতাল গোময় পড়িয়া রহিয়াছে।” মহাশয় তদ্দৃষ্টে সহর্ষে কুড়াইতে যাইলে হাতে নবার গোময় লাগিয়া যায়। আহা! এই কারণে মহাশয়কে শীতকালে স্নান করিতে হয়। এখন মনে মনে ভাবি নবা যাহার সহাধ্যায়ী এবং যাহার পরামর্শে নবা এমন গর্হিত কার্য্য করে সেই ঘনশ্যাম শর্ম্মার এ অপেক্ষা আর কি উন্নতির আশা করা যায়।”

আমি কহিলাম “এই একটী মাত্র পাপ করিয়াছিলেন কিন্তু বালককালের সে দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।” খুড়া কহিলেন “আমি বাবা একটী ছেড়ে সহস্র সহস্র পাপ কার্য্য করিয়াছিলাম। আহা! আমাদের গ্রামের অপর পল্লিতেএকজন গুরুমহাশয় ছিলেন তাঁহার নাম শরৎ চন্দ্র দাস। সে মহাশয়টী বেস শিষ্ট শান্ত এবং লেখা পড়াও মন্দ জানিতেন না; কিন্তু আমাদের মনে বিশ্বাস ছিল আমাদের গুরুমহাশয়ের তুল্য দিগ্‌গজ বুঝি আর এ জগতে নাই।

তখন আমার মনে বিশ্বাস ছিল জগৎ আমাদের গ্রাম এবং ইহার চতুঃস্পার্শ্বস্থ গ্রাম গুলি, ইহা ব্যতীত যে গ্রাম বা নগর আছে তখন এ ধারণা ছিল না। যাহাহউক একদিন শরৎ মহাশয়ের ছাত্রগণের সহিত আমাদিগের কথায় কথায় বিবাদ হওয়ায়, আমি নবাকে কহিলাম "নবা সন্ধ্যা ঘেঁসে ওদের গুরুমহাশয়ের রগে বোঁ করে তোর ঐ চুম্‌কী ঘটীর মত মেটে দোয়াতটে মেরে পালাতে পারিস ?" মানুষের রগে মারলে মরে যায় তখন সে ধারণা ছিল না, মনে মনে ভাবিতাম মানুষের মৃত্যু হইবার একটী নির্দ্ধারিত সময় আছে সেই সময়েই তাহারা মরে। নচেৎ জলেই চোবাও কি কেটেই ফেল মানুষের মৃত্যু হয় না। দেখ, বালক কালে আমার বুদ্ধিখানা কতদূর তীক্ষ্ণ ছিল।

আমি বল্লাম "আপ্নি বলে যান,—আচ্ছা নবা কি শরৎ মহাশয়কে মেরে ফাঁসী যায় ?"

ঘনে। না বাবা, নবার বাপ পিতামহের পুণ্যের জোর যে, তাহার দোতটা শরৎ মহাশয়ের রগে না লাগিয়া কপালে লাগে। কিন্তু তাহাতে তিনি বড় আঘাৎ পেয়েছিলেন, এমন কি আজীবন তাহার কপালে ছোট ছেলের হাতের বালার মত একটী গোলাকার দাগ ও তন্মধ্যস্থল আবের মত ফুলিয়াছিল। আমরা তখন এম্নি পাষাণহৃদয় ছিলাম যে তাহাতে দুঃখিত হওয়া দূরে থাক বরং আহ্লাদ করে রটাইতে লাগিলাম ওদের মহাশয়ের শিং বাহির হইতেছে এবং তদবধি তাঁহার নাম দিলাম "শরৎ মেড়া।"

ক্রমশঃ

———

আশার ছলনা।

ঋতু সকল ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের অমূল্য জীবন কালনদীস্রোতে বাহিত হইয়া অনন্ত সাগরাভিমুখে অবিরামগতি প্রধাবিত হইতেছে; সময় ক্রমিক যাইতেছে, জীবনও তাহাই—অদ্য যে সময়ে কোন কার্য্য করিতেছি, কল্য সে সময় আর পাইব না,—দুইদিন পরেও নয়—বৎসর পরেও নয়—শত বৎসর পরেও নয়—আর কখনই পাইব না; সে সময় কালনদীস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে—হেলিতে দুলিতে—খেলিতে খেলিতে—যাইয়া সাগরে পতিত হইতেছে—তথা হইতে বিস্মৃতির কক্ষে লীন হইল; সে সময় ভুলিয়া গেলাম; ত্রিভুবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেও আর তাহা পাইব না, যাহা সাগরে নিমগ্ন তাহা আর কি প্রকারে পাইতে পারি—তাহার আশা করা বৃথা—যে দ্রব্য পাইব না তাহার আশা করিয়া কেন অন্তঃকরণ পেষণ করি—যদি না পাইলাম তার আবার আশা কি—আশা করি কেন? আশা করিলে পদে পদে যদি আমাদিগকে নৈরাশ্য সাগরে নিমগ্ন হইতে হইল তবে আর আশা করিবা ফল কি? তবে সে মৃগতৃষ্ণিকায় প্রলোভিত হই কেন? আশা মরীচিকা—মরীচিকা পথিশ্রান্ত পথিকবৃন্দকে মনোহররূপে মুগ্ধ করিয়া, আশু তাহার পিপাসাজনিত ক্লেশের লাঘব করিব বলিয়া প্রলোভন প্রদর্শন করে এবং তাহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া মুগ্ধ পথিকও সুশীতল-সমীরণ-সঞ্চালিত সলিল প্রাপ্তি প্রয়াসে যত্নবান হইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া নিশ্চয়ই নৈরাশ্যসাগরে ভাসমান হন, তখন তাঁহার সেই পিপাসা শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন না করিয়া তাহাকে নানা বিপদে নিক্ষেপ করে; পথিক তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান পরিশূন্য

হইয়া চারিদিক শূন্যময় দর্শন করেন; তখন কি করি—কি উপায়ে এই দুস্তরবিপদসমাকুল স্থানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই—এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হয়। তথা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই দর্শন করিয়া ক্রন্দনে দিগ্‌বিদিক পরিপূর্ণ করেন—করালের বিকট গ্রাসে তাঁহাকে অধঃপাতিত দর্শন করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করেন—তখন পুত্রকলত্রাদির বিষয় তাঁহার মনমধ্যে স্থান অধিকার করে—আমার দশা যা হ'ক তাহাদের দশা কি হইবে? কি করিয়া উদরান্ন প্রাপ্ত হইয়া দিনাতিবাহিত করিবে—এই সকল চিন্তা তাঁহার মনমধ্যে সমুদিত হইয়া অধিকতর কষ্টদায়ক হইয়া উঠে—কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি মরীচিকা যেরূপ পথিকদিগকে বৃথা প্রলোভিত করে আশাও তাহাই—আশাও প্রলোভন দশাইয়া লোকের মন মুগ্ধ করিতে প্রয়াস পায়—কিন্তু সে ছলনা মাত্র; কোন কার্য্যকারক নহে—যাহা এই মৃত্তিকায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে তাহা প্রাপ্তির জন্য আশা চেষ্টিত হইলে আর কি ফল হইবে? তাহার সহিত আমার কি আর পুনর্দর্শন লাভ করাইতে পারিবে? না—কখনই নয়—তবে আশা করি কেন? কল্য যাহা দেখিয়াছি আজ তাহা নাই—তাহা গিয়াছে আর ফিরিবে না—সমস্তই এই প্রকার—যত দিন—যাইতেছে তত সকলই পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমরা যেমন ছিলাম এখনও সেই প্রকার—পরে এই রূপই থাকিব, এইরূপ অনেকে মনে করেন; মনে করেন, আমাদের কিছুই ব্যত্যয় ঘটে নাই—ঘটিবে না—বাস্তবিক কি তাই? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখ, পূর্ব্বে যেমন ছিলে—এখনও কি তাহাই আছ? কখনই নয়—পণ্ডিতগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—শুন তাঁহারা কি বলিতেছেন—বলিতেছেন, সাত বৎসর পূর্ব্বে তুমি যাহা ছিলে—এখন তাহার কিছুই নাই—আভ্যন্তরিক সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আগামী সাত বৎসরে আরও কত বৈলক্ষণ্য ঘটিবে—তখন পূর্ব্বের সহিত সম্যকরূপে তুমি একটি বিভিন্ন পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবে—সূর্য্য

পৃথিবী-সৃষ্টির আনুষঙ্গিক, কে বলিবে ইহার কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই? সূর্য্য প্রথম যখন পৃথিবীর নবজাত সদালাপী বলিষ্ঠ পুত্রগণকে আলোক প্রদান করিয়াছেন সেইরূপেই কি এখনও আলোক প্রদান করিতেছেন—বোধ হয় নয়। সূর্য্য, তোমাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার সুখকর-করস্পর্শে তিমিরান্ধকারবসনাবৃতা ধরণী প্রথম কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন? তখন নবজাত মনুষ্যেরা কিরূপ বিক্রমশালী ছিলেন? তাঁহারা তোমাকে প্রথম উদয় হইতে দেখিয়া কিরূপ বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন—কিরূপে তব মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—আবার অস্ত যাইতে দেখিলেই বা কি করিয়া তব পুনরাগমন প্রার্থনা করিয়াছিলে? তাঁহাদিগকে দেখিয়া তুমি কতই সন্তুষ্ট, কতই আহ্লাদিত হইতে? আমাদিগকে দেখিয়া কি তোমার সেরূপ হয়?—না—তা হইবে কেন—তাঁহারা ধীর—বলিষ্ঠ—কর্ম্মঠ—সরল প্রভৃতি সমুদয় সদ্গুণের আধার ছিলেন তাই তাঁহাদিগকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইতে;—আর আমরা—আমাদের কি গুণ দর্শন করিয়া আমাদিগের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি করিবেন—আমরা কি সেই—সেই যাহারা নির্ভীকান্তঃকরণে দিগ্‌বিজয় করিয়া রাজসন্নিধানে গৌরবান্বিত হইতেন? আমরা কি তাঁহাদেরই বংশাবতংশ, যাঁহারা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অসীম বল বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন? আমরা কি তাঁহাদেরই বংশধর, যাঁহাদের খরশানের প্রবল ঝঞ্জায় মহাবীর আলেকজণ্ডার সিন্ধুনদ পার হইতে সাহসী হন নাই? না—আমরা তাঁহাদের বংশধর নই—আমরা স্বতন্ত্র জাতি—তা না হইলে যাঁহারা প্রবল পরাক্রান্ত বীর সেকেন্দরকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়াছিলেন তাঁহাদেরই বংশধরগণ কেন একটি সামান্য শ্বেতকায় দর্শন করিলে ভয়ে জড়সড় হন? তাই বলি—আমরা তাঁহাদের সন্তান নই—আমরা এক স্বতন্ত্র জাতি—আমাদের ইচ্ছা স্বতন্ত্র—কার্য্য স্বতন্ত্র—আমাদের সকলই তাঁহাদের হইতে সম্যকরূপে স্বতন্ত্র। তবে আর আমরা তাঁহাদের বংশধর বলিয়া বৃথা ভাণ করি কেন?—তাঁহাদের নির্ম্মল কুল

কালী প্রদান করি কেন? তাঁহাদের ঔরসজাত একথা বলিলে তাঁহাদের স্বর্গস্থিত পবিত্র আত্মা নিশ্চয়ই ক্রোধান্বিত হন তাঁহারা আমাদিগকে দর্শন করিয়া অনুতাপ করেন—আপনাদের বলবীর্য্য সমস্ত স্মরণ করিয়া আমাদের জন্য অনুতাপ করেন—আমাদের শোচনীয় অবস্থাবলোকন করিয়া তাঁহাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়—আপনাদিগকে কলঙ্কিত মনে করেন—আমরা বীরকুলে—পতঙ্গ আর আমি?—আমি—আমি শব্দের অর্থ কি? এই সংসার মধ্যে আমি একজন—কি ধনী—কি নির্ধনী,—কি রাজা—কি প্রজা—সকলেই মনে করেন এ সংসার মধ্যে আমি একজন—আমি কোন না কোন বিষয়ে অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি নিতান্ত সামান্য হইলেও ভাবি, আমি একজন—কিন্তু আমি কে?—আমি কি—এ সংসারক্ষেত্রে আমি কতটুকু—একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, আমি কতটুকু—আমি কি তুচ্ছ—তবে আর বৃথা আস্ফালন করি কেন? বৃথাহঙ্কার—বৃথাভিমান—যদি আমি নিতান্ত অক্ষম, তবে আমি সদা 'আমি' প্রয়োগ করি কেন? আমা হইতে জগতের কি ইষ্টসাধন হইতে পারে,—কি অনিষ্টই বা হইতে পারে; আমা হইতে কিছুই হইতে পারে না—কিন্তু আমাদের হইতে?—শত শত ইষ্টানিষ্ট ঘটনা হইতে পারে—তবে আমি আর আমি,' প্রয়োগ করি কেন'?—'আমি' কথা হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ কথা আমরা একটি ব্যবহার করি না? কত আনন্দ হইবে—মন কেমন প্রফুল্লিত হইবে—তবে 'আমি' ব্যবহার ছাড়িয়া দিই—আমরা—আমরা সকলে এই ব্যবহার করিব।

কিন্তু 'আমরা' প্রয়োগ কোন স্থানে করা যায়—এদেশে যখন দেখা যায়, অপরিহার্য্য গৃহ-বিবাদ চলিতেছে—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কথা বাহির হইয়াছে—তখন আমরা প্রয়োগ কোথায় করি? এক্ষণকার সমাজ-ধুরন্ধরগণ সকলে একতা মানসে স্থানে স্থানে সভা সমিতি করিতেছেন—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা একতা লইয়া মহাগোলযোগ তুলিতেছেন তাঁহাদের গৃহের অবস্থা একবার কিরূপ

দেখুন—গৃহে হয়ত পরিবারমধ্যে ভ্রাতৃ-বিবাদ এমন কি মুখ দর্শনাদি পর্য্যন্তও চলিতেছে না,—কিন্তু বাহিরে তাঁহারাই আবার তৎক্ষণাৎ একতা একতা করিয়া দেশ প্রতিধ্বনিত করিতে থাকেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যখন স্বীয় গৃহে এরূপ মনোমালিন্য—অনৈক্য—রহিয়াছে তখন দেশশুদ্ধ লোককে সেই একতাসূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য সভার অনুষ্ঠান কেমন হাস্যকর—একতাসূত্রে বদ্ধ করিবার প্রয়াস কেমন আকাশ কুসুমবৎ অলীক—তাঁহারা অগ্রে আপনাপন গৃহবিবাদ ভঞ্জন করুন—পরে আপনারাই দেখিবেন, বিনা প্রয়াসেই দেশ শুদ্ধ লোক একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন; তবে আমরা প্রয়োগ কোথায় করি—তবু দেখা যাইতেছে আমি অপেক্ষা আমরা কত মিষ্ট—কত সুশ্রাব্য; তবে কোন ফল হউক বা না হউক ইহাই ব্যবহার করি—ফল যে পরে হইবে না—তাহারই বা প্রতিভূ কি? হইলেও হইতে পারে, তবে ইহাই ব্যবহার করি—কিন্তু কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি। আশা—আশা লোককে ছলনা করিয়া কেবল তাহার মনকে নিস্তেজ করিতে থাকে—আশার কুহক বুঝা ভার—আশার মোহিনী মন্ত্র—এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয় না এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না—এই পৃথিবীর মধ্যে কি ধনী—কি নির্ধন—কি রাজা—কি প্রজা সকলেই ইহার বশীভূত—কাহাকেও ইহার অপ্রতিহত প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন দেখা যায় না, ধনীগণ সতত এই আশা করিতেছেন—কিসে তাঁহাদের ধন আরও বৃদ্ধি হইবে—কিসে আরও জমা করিবেন; ভাল—টাকা বৃদ্ধি ও জমার দিকে যেরূপ মোহিনী আশা প্রয়োগ করেন সেই রূপ সৎকর্ম্মের প্রতি কেন হয় না—অনেকের ভাল করিব—অমুক স্থান দিন দিন মন্দ হইয়া আসিতেছে, উহার সংস্করণ করিয়া দিব—অনাহারে ঐ সকল প্রজা চীৎকার করিতেছে, আশু তাহাদের প্রতীকার করিব—এরূপ আশা তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে উদিত হয় না কেন? সকলেরই যে হয় না তা বলি না—এমন অনেক ধনী লোক আছেন, যাঁহাদের আশা স্বতন্ত্র—কিসে

সকলের ভাল হইবে এই চিন্তাই সতত করিতেছেন—তাঁহাদের এই নির্ম্মল কীর্ত্তি, বিমল কালের সুন্দর সীমন্তে মনোহর সিন্দুর বিন্দুর ন্যায় বিরাজ করিতেছে—আর তাঁহাদের এই সুকীর্ত্তি সুশীতল সমীরণে মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হইয়া পবন পথে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে যাইয়া সকলের শ্রবণে এই সুধাময় সুযশ বিবৃত করিতেছে—তাঁহাদের সুযশ সৌগন্ধ দিক দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে—এই সৌগন্ধ সমীরণ পথে খেলিতে খেলিতে গন্ধবহ সহ সকলের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রফুল্লিত করিতেছে।

এই বিভিন্ন আশাকাঙ্ক্ষী উভয় ধনীদিগের অবস্থা তুলনা কর দেখি কত প্রভেদ লক্ষিত হইবে—হয়ত প্রথমোক্ত ধনীদিগের নাম পর্য্যন্তও অনেকের শ্রবণেন্দ্রিয়ের লক্ষ্য হয় নাই—কিন্তু শেষোক্ত—তাঁহাদের জীবন কেমন সুখকর—যেখানে যাও সেই খানেই তাঁহাদের বিমলকীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে। অর্থ নাশ দ্বারা রাজা—রায় বাহাদুর খেতাব পাশ সবার প্রয়োজন কি? সেই অর্থ দ্বারা গরিব লোকদিগকে প্রতিপালন কর না কেন? "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।" তাহা হইলে কেমন প্রীতিপ্রদ হইবে—তাহা হইলে রাজা—রায় বাহাদুর হইতে লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ বিমল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইবে—রায় বাহাদুর খেতাব কতদিন থাকিবে?—জীবন পর্য্যন্ত—জীবন কতদিন থাকে—এ সংসারে ক্ষণবিধ্বংসী জীবন কতদিন থাকে—যদি জীবন পর্য্যন্তই উহার শেষ হইল তবে আর খেতাব লইয়া ফল কি? কি কাজ হইবে—তাহার পরিবর্ত্তে কল্পান্তস্থায়ী কীর্ত্তি রক্ষা কর না কেন, কত সুখ হইবে, কত আনন্দ হইবে, মন কত প্রফুল্লিত হইবে। কিন্তু কি বলিতেছি; আশার মোহিনীমন্ত্র, এ মন্ত্রে দীক্ষিত সকলকেই হইতে হয়; এ মন্ত্রের অনুসরণ সকলকেই করিতে হয়—ইহার সন্ধান অব্যর্থ—সে সন্ধানে শরব্যকে জর জর করে—কিন্তু ফলোদয়—কিছুই নয়—দেখিতেছি যাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি—যেমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে সততই অঙ্কিত, তাহা এই পথেও মিলিত হইয়াছে—

যে মূর্ত্তি সততই ধ্যান করিতাম, তাহা এই মাটিতে মিশাইয়াছে—যে মূর্ত্তি সুশীতল সমীরণে মৃদুমন্দ সঞ্চালিত নবস্ফুটিত প্রভাময় মল্লিকার ন্যায় আমার মানস পটে সতত হেলিত দুলিত—তাহা এই মৃত্তিকায় লীন হইয়াছে—যাহা মাটিতে লীন, তাহার জন্য আশা করিয়া আর কি হইবে—আর কি পুনর্দ্দর্শন হইবে?—তাই বলি যাহা পাইব না তাহার জন্য আশা করিয়া বারংবার কেন তাঁকে আর ও মানসক্ষেত্রে উত্তেজিত করি—যাহা গিয়াছে—যাহা পাইব না—তার আবার আশা কি—আশা করিলে কি হয়? তাই বলি যাহাকে পাইব না, তার আর আশা কি?—আশা করিব না—কিন্তু মন প্রবোধ মানে কই—? না মানিলে কি হইবে—যাহা পাইব না, তাহার জন্য মন প্রবোধ না মানিলে আর কি হইবে—তবে আর আশা করিব না—আর আশার আশায় প্রলোভিত হইব না—বৃথা আশায় ফল কি?

প্রণয় উচ্ছ্বাস।

(১)

কত দিন কতদুঃখে বিস্মৃতির নীরে
ভাসায়ে সে আনন, ছিল সুখে এ জীবন,
সহসা আবার কেন বল বরাননি—
দেখাইলে স্বপনেতে সে সুখের খনি?

(২)

কত দুঃখ সে অনল নিবাইয়া ছিনু,
কেন আজ পুনরায়, কাঁদিতে বল আমায়
পুন সেই সুখ স্মৃতি জাগাইয়া দিলে,
দুখীরে কাঁদায়ে বল কি ফল লভিলে?

(৩)

জানিতে যদ্যপি প্রিয়ে প্রণয়ের জ্বালা,
হতাশেতে নিরবধি প্রাণ কত জ্বলে, যদি

জানিতে, তাহলে কি এ দুঃখীর হৃদয়ে,
কাঁদাতে বাসনা তব হইত উদয় ?

(৪)

তা হ'লে হৃদয় তব হ'ত বিগলিত,
নয়নে নেহারি নীর, হ'ত তব প্রাণাধীর,
ভুলে নিষ্ঠুরতা—প্রিয়ে হ'তে দয়াবতী,
গলিত দুঃখেতে প্রাণ—কাঁদিতে এমতি।

(৫)

কিন্তু তা হবে না প্রিয়ে হইবার নয়,
কাঁদিতে জনম যার, স্বর্গে সুখ নাহি তার
কাঁদাতেই সুখ তার জানি আমি মনে,
তাই কি কাঁদাও প্রিয়ে এ অধীন জনে ?

(৬)

~~আর না,~~ প্রেয়সী আনি তিক্ষ্ণধার ছুরি,
কাট হৃদয়ের পট, দেখ প্রণয়ের ঘট,
সাত্ত্বিক প্রণয়ে দিয়ে আত্ম বলিদান !
জুড়াই অনন্ত তরে বিদগ্ধ পরাণ।

(৭)

পারিবে না ?—দেখ তবে অটুট হৃদয়ে,
একটী একটী করি দেখাইব প্রাণেশ্বরি,
শিরা প্রতিশিরা যত রক্ত বিন্দু তায় !
কেমনে তোমার প্রেম বিরাজে তথায় !

(৮)

দেখিবে প্রত্যেক বিন্দু শোণিতের মাঝে,
প্রণয়ের সিংহাসনে, বসে আছে সযতনে;
বাসনার অর্ঘ দিয়া তাপসের মত,
অচল হৃদয়ে আমি পূজি অবিরত।

(৯)

তাও দেখিবেনা ?—প্রিয়ে দেখ একবার,
প্রত্যেক নয়ন-নীরে, মরি কিবা শোভা করে,
তোমার মূরতিভাগে প্রেম উপাদানে,
কত পূজা করি তার নিত্য মনে মনে!

(১০)

তাও যদি নাহি দেখ—দেখ একবার,
মলিন বদন তার, অজস্র নয়নাসার,
শত মুখে ব্যাখানিবে আমার যাতনা,
ভুলনা পূরাতে প্রিয়ে এ দীন-বাসনা।

(১১)

দেখিবেনা তাও প্রিয়ে, ওহো বুঝিয়াছি,
ধর তবে প্রণয়িনি, সংহার মুরতি ধান,
নাচুক করেতে অসি নাচুক কৃপাণ,
প্রণয়েতে আত্মঘাতি, লও বলিদান!

(১২)

নিবাব নিবার প্রিয়ে জ্বলন্ত অনল,
দাও হাসি বলিদান, জুড়াক আমার প্রাণ
তৃপ্তির নয়নে ওই দেখি রূপরাশি,
বিষাদ পরাণ তাহে হাসিবে উল্লাসী।

———

রমণী।

(উপন্যাস)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিরহ ঘুচিল।

উক্ত ঘটনাটীর পর দিবস বামাচরণ বাবু বিল পাস করিয়া টাকা লইলেন, তাঁহার সমস্ত খরচ খরচা বা'দ চারি সহস্র টাকা লভ্য হইল। বামাচরণ বাবু যখন টাকা গণিয়া লন তখন একটী হিন্দুস্থানি সতৃষ্ণ নয়নে টাকা গুলির প্রতি চাহিয়া ছিল। বামা-চরণ বাবু অর্থের জন্য বড় লালায়িত হইয়াছিলেন, আজি অনেক গুলি টাকা তাঁহার হস্তগত হইলে, তিনি মনে করিলেন হিন্দুস্থানী-টীর হয়ত টাকার বিশেষ আবশ্যক সেই জন্য এমন করিয়া টাকা প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তিনি একবার মনে করিলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি লোকটী স্বীকার করে তাহা হইলে সাহার্য্য করিব কিন্তু সহসা জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল, এ দিকে লোকটীও সহসা চলিয়া গেল।

তিনি যত্ন পূর্ব্বক টাকাগুলি বাসায় লইয়া আসিলেন, সেখান কার যে সমস্ত কার্য্য ছিল তাহা তৎপর সম্পন্ন করিয়া তৎপর-দিবস স্বদেশ যাত্রা করিতে স্থির সংকল্প হইলেন, মনে কতই আনন্দের উদ্রেক হইতে লাগিল,—প্রিয়তমার সাক্ষাৎ পাইবে সেই প্রণয় রূপিণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণ জুড়াইবে, যে টাকার জন্য কত কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছে আজ তাহার হাতে চারি হাজার টাকা দিবেন, যাহাকে কখন এক খানি ভাল কাপড়, ভাল গহনা দিতে পারেন নাই, আজি তাহার কত কাপড়, কত

গহনা হইবে। বামাচরণ বাবু এইরূপ কতই ভাবিতে লাগিলেন। কত লোকের কত দিন কাটিয়া যায় কিন্তু আমাদের বামাচরণের সেই দিনটী যেন আর কাটিতেছে না। তাহা যেন কত দীর্ঘ তাহার মধ্যে যেন কত মাস কত বৎসর গোপন ভাবে অতীত হইতেছে। বামাচরণ বাবু প্রায়ই ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতেছেন, কখন বা ঘটিকা যন্ত্রের সময় নিরূপণে অবিশ্বাস জন্মিতেছে, মধ্যে মধ্যে ঘটিকা চলিতেছে কি না জানিবার জন্য সেটীকে শ্রুতিবিবরের কাছে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

ক্রমে দিন কাটিল রাত্রি আসিল, বামাচরণ বাবু সকাল সকাল শয়ন করিলেন। শয়ন মনুষ্যের ইচ্ছামত বটে, কিন্তু নিদ্রা নহে। সুতরাং তাহাতেও বামাচরণ বাবুকে প্রতারিত হইতে হইল। অনেক কষ্টে রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইলে তিনি নিদ্রিত হইলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলেন, গোলাপের সেই স্বর্গীয় ছবি বিদায় কালে একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। মনে করিলেন কাল রাত্রে গোলাপ আসে নাই অদ্য আসিবে এখন। ক্রমে সে আশাও নিষ্ফল হইল। আহারের সময় হইল, তথাপি গোলাপ আসিল না। বামাচরণ বাবু ভাবিলেন এখন না আসিলেও যাইবার সময় নিশ্চয়ই দেখা করিবে। তিনি আহারাদির পর গোলাপ কিরূপে দেখা করিবে, কি বলিবে, কি উত্তর দিবেন এই রূপ নানা বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাবাই সার হইল—গোলাপ আসিল না।

বামাচরণ বাবুর এত উৎসাহে, এত সুখে, যেন দুঃখ কনা প্রবেশ করিল, তিনি একটু বিষাদিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার বিদায়ের সময় নিটবর্ত্তী হইল, তিনি অগত্যা গোলাপকে না দেখিয়াই বিদায় হইলেন। বাসা হইতে বাহির হইবার কালে দেখিলেন একটী বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া গোলাপ তাঁহাকে দেখিতেছে, উভয়ের চক্ষু—পরস্পরের চক্ষে মিলিত হইবামাত্র গোলাপ তথা হইতে অপসৃত হইল। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময়ে তিনি এলাহাবাদ ষ্টেসনে উপনীত হইলেন, হুগলীর এক খানি টিকিট লইয়া বাষ্পযান আরোহণ করিলেন, এবং যথা সময়ে আপনার বাটীতে অর্থাৎ যেখানে তাঁহার হৃদয়ের রমণী রত্ন বিরাজিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলা বাহুল্য যে রমণীকে দেখিয়া বামাচরণ বাবুর অতুল আনন্দ হইল, তিনি সেই মোহিনী বদন দেখিয়া সমস্ত জগৎ সংসার ভুলিলেন, যেন অকস্মাৎ কি অসীম স্বপ্ন সুখ অনুভব করিলেন। বামাচরণ বাবুকে সহসা দেখিয়া যেন রমণীর বদন শুকাইল, বক্ষঃস্থল দুর দুর করিতে লাগিল, কেন তাহা এখনও বলিতে পারি না; পরে বামাচরণ বাবু সহসা টাকা পাওয়ায় আসিয়াছেন শুনিয়া সে ভাব তিরোহিত হইল, বক্ষে যে একটী পাষাণ চাপিয়াছিল তাহা অপসৃত হইল, বামাচরণ বাবুর বদন প্রতি চাহিতে রমণীর যে চক্ষের এক বিকৃত ভাব হইয়াছিল, তাহা অন্যভত ধারণ করিল। তিনি রমণীকে একটী গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন, এবং অর্জ্জিত অর্থ সেই চারু করতলে সমর্পণ করিলেন। রমণী পুলকপ্রাণে সে গুলিকে আপন বাক্সে তুলিয়া রাখিল।

তখন বেলা প্রায় একাদশ ঘটিকা সুতরাং রমণী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পতির আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। এতদিনে বুঝি বিরহ ঘুচিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুখের সীমা।

দেখিতে দেখিতে সুখ সন্ধ্যা সমাগত হইল। যে মোহিনী

সন্ধ্যা সমাগমে আকাশমণ্ডল অসংখ্য তারাহার পরিষা উজ্জ্বল শোভায় সুশোভিত হয়,—প্রণয়ী—নব আনন্দে উৎসাহিত হয়—পুষ্প সৌরভে দশদিক আমোদিত হয়, প্রকৃতি শান্ত ভাব ধারণ করে, আর কবি জগতের অভিনব শোভা সন্দর্শন করিয়া আপন কল্পনা রথে আরোহণ করিয়া ইতস্তত: বিচরণ করেন, সেই সুখদ সন্ধ্যা আজি বামাচরণ বাবুকে সন্তোষ পারাবারে পরিনিমগ্ন করিতে সমাগত।

বামাচরণ বাবু সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আপন বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবামাত্র বাটীতে আগমন করিলেন। দেখিলেন তখন তাঁহার মনোমোহিনী রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত, অগ্নিতাপে ঘর্ম্মাবলী সেই সুগোল সুন্দর কপোলে মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই সুন্দর মন-মোহিনী বদনমণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছে। বসন অসাবধানতার হেতু স্খলিত হওয়ায় সেই পূর্ণ সুন্দর মনোহর বক্ষ স্বীয় যৌবন গরিমার অক্ষয় কীর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছে। বামাচরণ বাবু অনেকক্ষণ অনিমেষ লোচনে দীপালোকের সাহায্যে যে রূপ-বিভা তরঙ্গায়িত হইতেছিল তাহাই দেখিতে ছিলেন, এমন সময়ে সহসা রমণীর চক্ষু ওদিকে গেল, সে প্রথমে চমকিয়া উঠিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল "কি দেখিতেছ ?"

বামাচরণ। তোমায় দেখিতেছি।

রমণী হাসিয়া কহিল "আমায় কি কখন দেখনি ?"

বামাচরণ। যত দেখি ততই নূতন শোভা দেখিতে পাই।

রমণী মৃদু হাসিয়া কহিল "এখন খাবার দেব কি ?"

বামাচরণ। দাও, কদিন রাত্রে ঘুম হয় নাই, আজ সকাল সকাল আহার করে শুমুই—বিশেষতঃ আজ বড় মাথা ধরেছে।

রমণী যেন চমকিত হইয়া বলিল "অসুখ করেনি ত ?"

বামাচরণ। না।

রমণী আহার্য্য আনিয়া দিল, বামাচরণ বাবু আহারাদি

করিয়া শয্যায় বসিয়া তামাকু খাইতে লাগিলেন। রমণী গৃহান্তরে আহার করিতে গেল। বামাচরণ বাবুর তামাকু খাওয়া শেষ হইলে হুঁকা রাখিয়া শয়ন করিলেন, কয় দিবসের সাতিশয় শ্রান্তি নিবন্ধন নিদ্রা আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রান্তি বিদূরিত করিতে কৃতযত্ন হইল।

আহারাদি ও গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইলে রমণী সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল বামাচরণ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। রমণী ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিল, গৃহ মধ্যে একটী দীপ ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় প্রায় দুই ঘন্টা অতীত হইল রমণীর চক্ষে নিদ্রা নাই, থাকিয়া থাকিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। আজি কি রমণীর আনন্দ হইয়াছে বলিয়া চক্ষে নিদ্রা নাই? না তাহা নহে, তবে কি চক্ষে নিদ্রা আসিতেছে না, না স্বামীর সহিত কথা বার্ত্তা কহিবার জন্য রমণী চঞ্চল হইতেছে? না তাহাও নহে, রমণী বরং স্বামী যাহাতে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হন তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে বাতাস করিতেছে।

রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে গৃহের দ্বারে "ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্" করিয়া কিসের শব্দ হইল, শব্দ হইবামাত্র রমণী সতর্কতার সহিত শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। বহির্দ্দেশে একটী যুবক দণ্ডায়মান ছিল, যুবতী বাহিরে যাইবামাত্র উভয়ে উভয়ের বাহুপাশে বদ্ধ হইল। ঘন ঘন চুম্বনে উভয়ে উভয়ের প্রণয়ের গভীরতা জ্ঞাপন করিল।

ক্ষণেক পরে রমণী যুবককে বলিল " এত মদ খেয়েছ কোথা?

যুবক। গঙ্গাতীরে।

রমণী। এত খেলে কেন?

যুবক। তোমার জন্য মন বড় খারাপ হতে লাগ্‌ল বলে।

রমণী। তবে আজ এস।

যুবক। এখনি।

রমণী। আবার টের পাবে।

যুবক। টের পেলেই বা, রমণী তুমি আমায় ভালবাস না,

আমি তোমার জন্য মরি, আর তুমি আমায় দেখতে পার না? আজ আমি মরব।

এই বলিয়া সজোরে ললাটে মুষ্টাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

রমণী "বালাই—চুপ কর" বলিয়া যুবককে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিল।

যুবক। না, তুমি আমায় ভালবাস না।

রমণী। তোমায় ভালবাসি কি না, তা তুমি কি জানবে, ভালবাসা যদি দেখাবার হত তা হলে দেখাতাম।

যুবক। যদি ভালবাস তবে এখনি যেতে বললে কেন?

রমণী। কি জানি যদি টের পায়।

যুবক। পেলেই বা।

রমণী। দেখ ও না জানায় আমাদের অসুখ কি, আমরা একত্রে থাকি। প্রতিদিন আমরা অতুল আনন্দ উপভোগ করি। ও কত কষ্ট করে টাকা উপার্জ্জন করে পাঠায়, আমরা উভয়ে খরচ করি। আর ও পাঁচ সাত দিন মাত্র এখানে আছে, গেলেই আমরা যা ছিলাম আবার তাই হব।

যুবক। পাঁচ সাত দিন! তুমি আমায় মেরে ফেলতে চাও? আমি কি আত্মহত্যা কব নাকি, রমণী—তোমাকে ছেড়ে পাঁচ সাত দিন থাকতে পারব? তুমি পারবে? রমণী এই তুমি আমায় ভালবাস? এই তোমার ভালবাসা? তুমি না বলতে আমি তোমায় এক দণ্ড না দেখে থাকতে পারি না, রমণী! এই তোমার কথা?

রমণী নীরবে রোদন করিতে লাগিল। যুবকও কাঁদিতে লাগিল, অনেকক্ষণ পরে যুবক বলিল, "এবার কত টাকা এনেছে।"

রমণী। চার হাজার টাকা।

যুবক। আমায় দাও।

রমণী। সে ত তোমারি, ও গেলেই তোমায় দেব।

যুবক। না আজই দাও।

রমনী। না আজ নয়, আমি তোমার গা ছুঁয়ে দিব্বি কচ্চি যে ও যে দিন যাবে সেই দিনই দেব।

যুবক ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিল "না রমনী আমি টাকা চাই না, পরিহাস করছিলাম মাত্র তুমি বড়, না টাকা বড়?'

রমনী। তবে কি চাও।

যুবক। তোমায় চাই।

রমনী। আমি ত তোমারই।

যুবক। একেবারে চাই—আমি ও কণ্টক রাখব না। রমনী তুমি যদি আমায় ভালবাস তা হলে আমার কণ্টক শেষ কর—যে টাকা আছে তাতে আমাদের এক রকম বেশ চলবে, আমরা কাশিতে গিয়ে থাক্‌ব।

রমনীর শরীর কণ্টকিত হইল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

যুবক বলিল "রমনী! কথা কহিতেছ না যে? যদি — না শুন তাহা হইলে আমি শপথ কর্‌ছি যে তোমার সম্মুখে এখনি আত্মহত্যা কর্‌ব। তুমি আমায় কত ভালবাস তাহা আজি পরীক্ষা করিব।

রমনী। তাহা কিরূপে হয়?

যুবক। কেন হয় না, এত নূতন ঘটনা নয়, আর ভালবাসায় কি না হয়, তুমি ত আমায় কতবার বলেছ যে ওই একমাত্র আমাদের সুখের কাঁটা, তবে কাঁটা সাফ্ করতে দোষ কি?

রমনী। পুলিস টের পেলে কি হবে?

যুবক। পুলিস টের পেয়ে কি কর্‌বে, তুমি সকাল উঠে চীৎকার করে কাঁদ্‌বে, লোকে কিছু আর মনে কর্‌বে না যে তুমি তোমার স্বামীকে কেটেছ।

রমনী। আমি——

যুবক। তুমি নয় ত কে?

রমনীর আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল বলিল "আমি পারব না।"

যুবক। কেন পার্‌বে না, খুব পার্‌বে। আমি আলো ধরিব, আর তুমি কাট্‌বে।

রমণী ধীরে জড়িত স্বরে কহিল,—"কি দিয়ে কাট্‌ব ?"

যুবক। বঁটী দিয়ে।

রমণী। বঁটীদিয়ে কাট্‌বে ?

যুবক। খুব কাট্‌বে, আর বঁটী কেন, সে দিন যে একটা ভোজালে কিনেছিলাম সেটা কোথায় ?

রমণী। তা জানি না।

যুবক। জান্‌ না, আমায় প্রবঞ্চনা, না না তোমার কেটে কাজ নাই, আমার সবাই ভাল, ওর কণ্টক শেষ হগ, তোমারও শেষ হগ। ও কত টাকা দেয়, আমি ত পারি না, আমি কিসে তোমার মনের মত হব বল।

যুবক এই কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইল, যুবতী বলিল "না না যেওনা, আমার মাথা খাও, আমি এখনি ভোজালে আন্‌ছি।"

এই বলিয়া রন্ধন শালা হইতে ভোজালিয়া আনিয়া দিল, যুবক তাহাতে একবার ধার করিয়া লইয়া বলিল "এই নাও চল, খুবজোরে গলায় মার্‌বে।"

যুবক ও যুবতী উভয়েই যে গৃহে বামাচরণ বাবু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। যুবক প্রদীপ ধরিল, যুবতী একবার স্বামীর বদন প্রতি চাহিল, সেই মুহূর্ত্তে সেই দণ্ডে যেন রমণী হৃদয়ে বামাচরণের সমস্ত প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি প্রতিভাত হইল, সেই প্রেম, বাল্যের সেই বঞ্চনা পরিশূন্য ভালবাসা, সেই দেখিবার আকাঙ্ক্ষা, সেই আগ্রহ, সেই সমস্তই হৃদয় মধ্যে আবির্ভূত হইল, রমণীর হৃদয় যেন প্রেমবশে বশীভূত হইল, রমণী আবার যুবকের বদন প্রতি চাহিল। যুবক ভ্রূকুটী করিল, যুবতী অনন্যোপায় হইয়াই যেন ভোজালিয়া উত্তোলন করিয়া সেই এক দিনের অতি যত্নের, অতি সাধের, অতি ভালবাসার, স্বামীর ইহ-জীবনের লীলা সাঙ্গ করিতে কৃত নিশ্চয়!

বামাচরণ। এই সময় যদি তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইত, তাহা হইলে একবার সংসার বুঝিতে, যে স্ত্রীকে তোমার ইহ-জীবনের সমস্ত সুখের আকর বলিয়া জান, যে স্ত্রীর তুল্য পতিপ্রাণা স্ত্রী আর ইহ-জগতে নাই বলিয়া ধারণা

আছে, ভাই, একবার চক্ষু উন্মুক্ত কর, সকলি প্রত্যক্ষ দেখিবে! আর সাংসারিক মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিও না, তোমার জীবন শেষ প্রায়, আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব নাই।

কিন্তু ধন্য রমণী, ধন্য তোমার পতিপ্রেম, ধন্য তোমার সরলতা! যে এক দিন এই সংসারকে অমরাবতী বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়াছিল, আজি আবার তাহার এই কাজ!

রমণী যুবকের ভ্রূকুটীতে সকল মায়া মোহ ছেদ করিল, দুই হস্তে ভোজালিয়া উত্তোলন করিল, আর বিলম্ব নাই, স্বামী ছিন্নকণ্ঠ ও রুধির ধারায় প্লাবিত হইয়া এখনি ইহলোক ত্যাগ করিবে, এমত সময় খাটের নিম্ন হইতে এক জন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানি বাহির হইয়া তাহাদের দুই জনকেই দৃঢ়রূপে ধরিয়া "বাবু বাবু বাবু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানের উন্মেষ।

বামাচরণ বাবু প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া ছিলেন, সুতরাং দুই একবার ডাকিবামাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তিন চারিবার উচ্চৈঃস্বরে "বাবু বাবু" বলিয়া ডাকিবার পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং তিনি স্তম্ভিতের ন্যায় "অ্যাঁ—অ্যাঁ বসন্ত—বসন্ত—কি—কি" বলিয়া উঠিলেন।

হিন্দুস্থানি বলিল "অগ্রে এক গাছি দড়ি দিন, পরে বলিতেছি।"

বামাচরণ বাবু এক গাছি দড়ি দিলেন, তাঁহার হৃদয় ভয়ানক রূপে প্রকম্পিত হইতেছিল। হিন্দুস্থানি উত্তম রূপে বসন্তকে বান্ধিয়া একখানি বসন দ্বারা স্ত্রীলোকটীকে বদ্ধ করিল। তাহার হস্তস্থিত ভোজালিয়া নামাইয়া রাখিল। রমণী যেন এতক্ষণ জ্ঞান শূন্যা হইয়াছিল, সে যে কিরূপ গুরুতর কার্য্য করিতে রত হইয়াছিল, তাহা সে এতক্ষণে বুঝিল।

লোক লজ্জা, স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, তাহা এতদিন কোথায় গিয়াছিল। আজি তাহা আবার নবীন বেশ ধারণ করিয়া রমণীর হৃদয়ে আগমন করিল। রমণী লজ্জায় অধোবদন হইল, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বামাচরণ। ব্যাপার কি ?

হিন্দুস্থানি। বলিতেছি—বলিয়া স্ত্রীলোক ও যুবকটীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল " ইহাদিগকে চিনেন কি ?"

বামাচরণ। চিনি—এটী আমার স্ত্রী, আর এটী আমার খুল্লতাত ভ্রাতার সম্বন্ধি—বসন্ত।

হিন্দুস্থানি। না, এটী আপনার স্ত্রী রূপিনী রাক্ষসী, আর এটী আপনার স্ত্রীর জার !

বামাচরণ বাবু চমকিয়া উঠিলেন।

হিন্দুস্থানি বলিল " চমকিবেন না, অনেক কথা আছে শুনুন ;—আপনি আমায় চিনিতে পারেন ?"

বামাচরণ। বোধ হয় যেন কোথাও দেখিয়াছি।

হিন্দুস্থানি। আপনি যে দিন এলাহাবাদ কালেক্টরী হইতে চারি হাজার টাকা গণিয়া লন, তখন আমায় দেখিয়াছিলেন কি ?

বামাচরণ। হাঁ দেখিয়াছি, বেশ স্মরণ হইতেছে।

হিন্দুস্থানি। বলিতে কি আপনার টাকাগুলির উপর আমার অত্যন্ত লোভ হইয়াছিল, আপনার নিকট হইতে টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমি বিব্রত হইয়া উঠি, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই—আপনি বাসায় গেলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, কিন্তু কোন সুযোগ পাইলাম না, আপনি বড় সতর্ক রহিলেন, পর দিবস আপনি বাটী আসিবেন, আমিও আপনার সহিত ষ্টেসনে গেলাম।

বামাচরণ। আপনি এক গাড়িতে আমার সহিত আসিয়াছিলেন না ?

হিন্দুস্থানি। হাঁ বলিতেছি শুনুন ,—দেখিলাম আপনি হুগলির টিকিট ক্রয় করিলেন, আমিও হুগলীর টিকিট কিনিলাম। মনে করিলাম গাড়িতে আপনি ঘুমাইলে আপনার টাকাগুলি লইয়া পলাইব, আপনি বাক্স মধ্যে টাকাগুলি রাখিয়াছিলেন তাহা আমি দেখিয়া ছিলাম। আপনি যে

গাড়িতে উঠিয়াছিলেন, আমিও সুতরাং সেই গাড়িতে উঠি--কিন্তু আপনি বড় সতর্ক থাকায় সেখানেও কিছু পারিলাম না। বিশেষতঃ অপরাপর গাড়িতে লোক থাকায় আরও পারি নাই, নতুবা হয় ত আপনাকে হত্যা করিয়াও টাকাগুলি লইয়া পলাইতাম। ট্রেনেব মধ্যে হত্যা করিলে কে বা আমায় ধরিত! যাহাই হউক, আমি অনন্যোপায় হইয়া আপনাব সহিত হুগলীতে নামিলাম। দেখিলাম আপনি একটী ভাড়াটিয়া গাড়ি ভাড়া করিলেন, কিন্তু আমি ত আর সে গাড়ীতে উঠিতে পারি না, সুতরাং দ্রুতপদে অগ্রগামী হইলাম, অনতি বিলম্বেই গাড়ী আমাকে অতিক্রম করিয়া গেল, আমিও গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। অবশেষে দেখিলাম, এই আপনাব বাটী, আপনি বাটীতে অবতরণ কবিলেন, আমি এই নিকটেই একটী দোকানে আহারাদি করিলাম। লোক পবম্পবা জানিলাম যে, বাটীব মধ্যে আপনার স্ত্রী ও একটী দাসী ব্যতীত অপব কেহ নাই—আপনি সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে গেলেন, দাসী দোকানে গেল, আমি সেই অবসবে বাটীব মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন আপনার স্ত্রী বন্ধন শালায় থাকায়, আমায় দেখিতে পাইলেন না, আমি ববাবব আপনাব শয়ন কক্ষে—এই ঘবে প্রবেশ করিয়া এই খাটের নিচেয় রহিলাম। ক্ষণেক পবে আপনি আসিলেন, ঘবে আলো আসিল, আমি দেখিলাম যে বাক্সটা সিন্দুকেব উপর বহিযাছে—বড়ই আনন্দ হইল, মনে করিলাম, আপনারা স্ত্রী পুরুষে নিদ্রা যাইলে, আমি বাক্সটা লইয়া পলাইব। আপনি আহারাদি করিয়া শয়ন কবিলেন, শয়ন কবিযাই নিদ্রাগত হইলেন, ক্ষণেক পবে আপনাব স্ত্রী আসিযা আপনাব পার্শ্বে শয়ন কবিল।

বসন্ত ও বমণীব যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল হিন্দুস্থানী আভাসে তাহাব অনেক বুঝিতে পারিযাছিল, ক্রমে আনুপূর্ব্বিক সে সমস্ত বিবৃত করিযা বলিল "এই সকল ব্যাপাব দেখিয়া আমাব মন অত্যন্ত উদাস হইল, পরে দেখিলাম যে প্রকৃতই—এই পাবণ্ড পুরুষ আলোক ধবিয়াছে এবং এই সয়তানি দুই হস্তে সজোরে শাণিত ভোজালিয়া উত্তোলন করিয়াছে, আমি আর থাকিতে পারিলাম না, ইহাদের উভয়কে দৃঢ়রূপে ধৃত করিয়া আপনাকে উঠাইয়াছি। এখন আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন।"

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—•••••—

সংসার না নরক?

রামাচরণ বাবু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে কি ভয়ঙ্কর শোক তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। তখন তাঁহার হৃদয়ে—সংসার, রমণীর ভালবাসা, জীবন কি? ইত্যাদি কত বিষয়ক, কত ভাব, কত চিন্তা উদিত হইতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি মনে মনে কত আশায় হৃদয়কে উন্নত ও আশান্বিত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সে সমস্ত আশা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল,—সে যাতনা, সে অসীম যাতনা, তাঁহার হৃদয়কে যে কতদূর ব্যথিত করিতেছিল, তাহা বলা যায় না। এক একবার রমণীর মুখাবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয় রাগে জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার পরক্ষণে শোকে তাপে জর্জ্জরীত হইতেছিল, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে ছিল, বোধ হয়, তদপেক্ষা ক্লেশদায়ক পদার্থ ইহ-জগতে আর নাই।

রামাচরণ সজল চক্ষে বলিলেন "রমণি! তোমার প্রতি আমার অচল ভালবাসা ছিল,—রমণী কুলের প্রতি প্রবল ভক্তিছিল, আজি তুমি তাহা তীরোহিত করিলে। আমি উন্মত্তের ন্যায় তোমায় ভালবাসিতাম, মনে মনে পূজা করিতাম, কত আশা করিতাম, কত সুখাভিলাষ করিতাম, কিন্তু সে সকল আজি স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। রমণি! তুমি পতি-হত্যা-কারক ব্যভিচারিণী,—রমণি! ইহা অপেক্ষা আর শোকের কথা কি আছে। আমায় এই শোকে আজীবন দগ্ধ হইতে হইবে, যখনই তোমায় মনে হইবে, যখনই তোমার প্রতারণাপূর্ণ ভালবাসার, তোমার কৃত্রিম প্রণয়ের কথা স্মরণ হইবে, তখনই প্রাণ পুড়িয়া যাইবে, হৃদয় ছারখার হইবে। রমণি! ইহা অপেক্ষা আমায় হত্যা করিলে না কেন? জীবনই না হয় যাইত, এত যাতনা ত ভোগ করিতে হইত না।

বামাচরণ অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। রমণীও আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। হিন্দুস্থানি রাগভরে বসন্তকে একটী চপেটাঘাত করিতে উদ্যত হইল। বামাচরণ তাহা নিষেধ করিয়া কহিলেন—"উহাকে মারিবেন না, মারিয়া ফল নাই, বসন্ত! তুমি আমার হৃদয়ে যে অনল কুণ্ড জ্বালিয়া দিয়াছ, তাহা আর বলিবার নহে, যদি হৃদয় দেখাইবার হইত তাহা হইলে দেখিতে, যে কেবল সেখানে হুহু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে—অনন্ত মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ তাহাতে বর্ত্তমান, হৃদয় পুড়িয়া খাঁক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ঈশ্বর কি নাই, দুষ্কৃতি সুকৃতির কি ফলভোগ করিতে হয় না? নিশ্চয়ই হয়, বসন্ত আমি তোমায় কিছু বলিব না, কিন্তু ঈশ্বর যেন ইহার বিচার করেন, তুমি আমায় যেমন মনোকষ্ট দিলে, ঈশ্বর যেন তোমায় তাহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন।"

রমণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "তোমায় আর কি বলিব, আমি যেমন প্রশান্ত প্রাণে তোমায় ভালবাসিয়াছিলাম, তাহার বেশ প্রতিফল দিয়াছ, কিন্তু তোমায় আমি কিছু বলিলাম না, রমণি! ঈশ্বরের নিকট হইতেও কি পরিত্রাণ পাইবে, তাঁহার চক্ষেও কি ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিবে?"

রমণী নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া স্থিরদৃষ্টে বসন্তের দিকে তাকাইয়া রহিল, একটী কথাও কহিল না। কিন্তু আমরা জানি যে, অনুশোচনা ও বিবেক তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, তাহার নিকট বামাচরণের যাতনা সমধিক নহে। ঈশ্বর বুঝি রমণীকে প্রত্যক্ষে শাস্তি দিলেন, পৃথিবীতে নরক যাতনা দেখাইলেন,—বস্তুতঃ অনুশোচনার তুল্য গুরুতর শাস্তি ইহ-জগতে কি আর আছে?

হিন্দুস্থানি বলিল "বাবু আপনি কি বলিতেছেন, পুলিস ডাকুন।"

বামাচরণ। পুলিস ডাকিয়া কি করিব, সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট যেরূপ তুলাদণ্ডে বিচার হইবে, পুলিসে কি তাহা পারিবে। আমার যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, যাহা না হইবার তাহাও হইয়াছে, আর কেন? এখন আমার যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে যাইব। সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধ্যান পরায়ণ হইয়া অনন্তধামের কার্য্য করিব। আর কেন এসংসারে মুগ্ধ হইব, ইহা কি সংসার না নরক।

হিন্দুস্থানি। তাহাও কি হয়, এরূপ নরহত্যাকারী ঘোর বিশ্বাসঘাতক পাপিদিগকে কি ছাড়িয়া দিতে আছে, আমি পুলিস ডাকি।

এই সময়ে পুলিস ইন্সপেক্টর ও দুইজন প্রহরী বাউণ্ডে বাহির হইয়াছিলেন। এইরূপ গোলমাল শুনিয়া তাঁহারা দ্বার দেশ হইতে সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, পুলিস ডাকিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া তাহারা বলিল "দরজা খোল।"

হিন্দুস্থানি বলিল "কে?"

উত্তর "পুলিস।"

হিন্দুস্থানি স্বয়ং দ্বার খুলিয়া দিল, পুলিস আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি?"

হিন্দুস্থানি আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিল।

ইন্সপেক্টর বলিলেন "আচ্ছা স্ত্রীলোকটীর বন্ধন খুলিয়া দাও, আমি উহাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব?"

একজন কনষ্টবল রমণীর বন্ধন উন্মুক্ত করিবামাত্র রমণী ভোজালিয়া খানি লইয়া সজোরে বসন্তকে আঘাত করিল, এক আঘাতেই বসন্তের ইহ-সংসারের সকল কার্য্য শেষ হইল, অপর সকলে রমণীকে ধরিতে না ধরিতে সে সজোরে আবার সেই ভোজালিয়া দ্বারা আপন ললাট দেশে আঘাত করিল। প্রবল রক্ত প্রবাহ হইতে লাগিল, পুলিস, আহত দুই জনকেই হাঁসপাতালে প্রেরণ করিল, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না, উভয়েই কিয়ৎক্ষণ পরে ভবলীলা সাঙ্গ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

পুলিসের কার্য্য শেষ হইল, সেই অনন্তধামে অপরাধীদিগের বিচার হইবে। অনেক গুরুতর পাপ করিয়া এ সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেখান হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন উপায় নাই।

মাজিষ্ট্রেট হিন্দুস্থানির এজাহার লইয়া তাহাকে অব্যাহতি দিলেন। যদিও হিন্দুস্থানির অভিসন্ধি ভাল ছিলনা, তথাপি সে বামাচরণ বাবুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া কিছু শাস্তি পাইল না।

বসন্ত রমণীর হস্তে শাস্তি পাইল, আর রমণী যে আপনা আপনি ঘোর শাস্তি পায় নাই, তাহা কে বলিবে?

বামাচরণ বাবু হিন্দুস্থানিকে অতি যত্ন করিতে লাগিলেন, এবং বন্ধুভাবে গণ্য করিলেন। তাঁহার যে কিছু টাকা কড়ি ছিল, সমস্ত তাহাকে দিয়া বলিলেন "আমি যাহা তোমায় দিতেছি তাহা অতি সামান্য, আমার যদ্যপি প্রচুর অর্থ থাকিত, তাহা হইলে সে সমস্তও তোমায় দিতাম। তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহার নিকট এ পুরস্কার কিছুই নহে।

হিন্দুস্থানি বলিল "ভাই তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে, আর আমার কিছুতেই স্পৃহা নাই, কাহার জন্য লইব ভাই? আমি তোমার এক কপর্দ্দকও লইব না,—আর সংসারের গতিক ত দেখিলে, পরের সুখের জন্য পরলোকের পথে কাঁটা দি কেন? প্রবঞ্চনা দস্যুবৃত্তি অপেক্ষা ভিক্ষা শতাংশে শ্রেয়।"

বামাচরণ অনেক জিদ করিলেন, কিন্তু হিন্দুস্থানি কিছুই লইল না। অনেক পীড়া পীড়ির পর একশত মাত্র টাকা লইল।

বামাচরণ বাবু তাঁহার বাটী ইত্যাদি তাঁহার এক আত্মীয়কে দান করিয়া আপনি পশ্চিম যাত্রা করিলেন, একবার মনে করিলেন, "আর এলাহাবাদ যাইব না, পাছে গোলাপ আমার হৃদয় রাজ্য অধিকার করে, আবার কি রমণীতে বিশ্বাস স্থপান করিব? তাহাতে অনুরক্ত হইব? সেই মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইব?" আবার কি ভাবিয়া বলিলেন "যাই, তাহাকে দেখিলেত ক্ষতি নাই।"

আশা তুমিই ধন্য!!!

সমাপ্ত।

ধ্রুবোপাখ্যান।

উন্নতি বাসনা মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম; ইহা বিরহিত লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না; যে যেরূপ অবস্থায় স্থাপিত হউক না, সে সেই অবস্থা হইতেই আপনার মঙ্গল ও উন্নতিসংসাধনার্থ প্রধাবিত; কাহারও উন্নতি কল্পে ভয়ানক বিঘ্ন বিপত্তি থাকিলেও তিনি তাহার জন্য বদ্ধ পরিকর। ইহা শূন্য প্রাণী নাই—এই মর জগতে আকাঙ্ক্ষা শূন্য জীব কেহ কখন দেখে নাই। তবে এই উন্নতি কামনার সহিত স্বীয় স্বার্থ প্রায় জড়িত থাকে, যিনিই উন্নীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রায়শই তিনি এই স্বার্থ পরতার দাস; যেন স্বার্থপরতার সহিত ইহার এমন কোন সম্বন্ধ আছে যে তাহা কেহ ছেদন করিতে পারে না,—যেন ইহার এমন কোন আকর্ষণী শক্তি আছে যে তাহা মনুষ্যকে স্বার্থপরতার এই নীচাশয়তা উপলব্ধি করিতে দেয় না; সুতরাং মানব স্বীয় উন্নতি কামনার সহিত এই দুশ্ছেদ্য স্বার্থপরতা রক্ষা করিয়া থাকে। আবার উন্নতি কামনা আছে বলিয়াই মনুষ্য কখন এক ভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না—প্রতি মুহূর্ত্তেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন; এই জন্যই মনুষ্যের প্রায় যাবতীয় কার্য্যই স্বার্থ-পরতার এই আকর্ষণী শক্তির নিকট আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া, পৃথিবী সৃষ্টির প্রাকাল হইতে এই একই নিয়ম, এই একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে, প্রায় পরিবর্ত্তন নাই—পরিবর্ত্তনের চেষ্টা থাকিলেও তদনুযায়ী কার্য্য নাই; সুতরাং মানব কুল প্রায়ই স্বার্থ-পরতার দাস।

মানব এই পিশাচীর দাস বলিয়াই যাহারা পরস্বার্থে নিজ স্বার্থবলি প্রদান করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা ইহা জগতে দেব বলিয়া পূজিত। মনুষ্য স্বীয় স্বার্থ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না বটে কিন্তু তাহার নীচতা সময়ে সময়ে সকলেই অনুভব করিয়া থাকে..তাই স্বার্থ বলিদানের কথা শুনিলেই তাহার হৃদয়ের দ্বার আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া যায়—তাই প্রাণ ভরিয়া সেই মহাপুরুষের গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে। মানব নিজে অক্ষম হইলেও অকৃতজ্ঞ নহে,—তাই এরূপ মহাপ্রাণের গুণ সঙ্কীর্ত্তনে তিনি আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করেন, আবার কেহ কেহ সেই মহাপুরুষের অনুকরণে আপনাকেও উর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন; কেহ বা তাহার রম্য ফল লাভে কৃতার্থ হন—আর কেহ বা

ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। যিনি পরস্বার্থে নিজ স্বার্থ বলি দিতে পারিয়াছেন তিনিই ধর্ম্ম—তাঁহার চরিত্র দেবতার চরিত্রকেও অধঃকৃত করে—তিনি নররূপী দেব; এই প্রকার দেবতারই পূজা প্রার্থনীয় পদার্থ। পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিরা ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুধর্ম্মে ত্রিংশৎত্রিকোটী দেবতার আবাহন। অমানুষিক ক্ষমতা বিশিষ্ট মানবে দেবতার আরোপ স্বভাব সিদ্ধ; তাঁহার প্রতি লোকের আন্তরিক ভক্তি আপনা হইতেই সমুত্থিত হয়। যে বুদ্ধদেব পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জ্ঞানাস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—যিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহার জীবদ্দশাতেই সমুদায় ভারতবাসীকে এক সূত্রে বন্ধন করিতে সমর্থ হইযাছিলেন—যিনি আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে সমান আদরে—সমান যত্নে আপনার বিমলাঙ্কে তুলিযা লইতে পারিয়াছিলেন—যাঁহার সুনীতিমার্গ অনুসরণ করিয়া আজি পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক পরিচালিত হইতেছে—তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি তিনি ইহজগতে দেবতা বলিয়া পূজা পাইযা আসিতেছেন; তিনি যে কেবল স্বীয় শিষ্যানুশিষ্যগণের উপাস্য তাহা নহে; যে ব্রাহ্মণ তাঁহার চির বিদ্বেষী যাঁহারা এক সময় তাঁহাকে জীবন ধ্বংস কবিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার তাঁহাকে আপনাদের দশ অবতারের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়া লইয়াছেন। শুধু বুদ্ধদেব কেন—মহাদেব বল—রামচন্দ্র বল—শ্রীকৃষ্ণ বল—নানক বল—চৈতন্য বল—কুশা বল—মহম্মদ বল কেনা এইরূপে দেব বলিয়া পূজিত হইতেছেন। পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিই—এই উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত সমযেই মহাপ্রাণ গারিবল্ডীর কথা ভাবিয়া দেখুন; তিনি পরস্বার্থে নিজ স্বার্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই—ইটালী উদ্ধারে আপন প্রণোৎসর্গ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন বলিয়াই আজি তিনি সমগ্র ইটালীর পূজিত দেবতা;—কেবল ইটালী কেন সমগ্র জগতের পূজার পাত্র—তাঁহার পবিত্র চরিত্র সকলেরই অনুকরণীয়। জর্জ ওয়াসিংটন সেদিন স্বদেশ উদ্ধার কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজি তাঁহার সুযশ বার্ত্তা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—মার্কিনবাসীগণ জাতীয় কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই তাঁহার

তেজঃপুঞ্জ হস্ত-জিতনূতন সাম্রাজ্যেররাজধানীতাঁহারইপবিত্রনামানুসারে আখ্যাত করিলেন—যাঁহারা তাঁহার প্রবল পরাক্রমে বিধ্বস্ত—পরাজিত—লাঞ্ছিত—অপমানিত হইয়াছিলেন—তাঁহারাও আজি তাঁহার এই নিঃস্বার্থ প্রাণোৎসর্গের জন্য সহস্র বদনে গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন—তাঁহারাও তাঁহাকে যথা বিহিত পূজার্চ্চন করিতেছেন। আহো! এই সকল মহাপ্রাণ যদি দেবতা বলিয়া গণ্য না হন—তবে আর দেবতা কে জানি না। হিন্দুর অধিকাংশ দেব দেবী এইরূপে তাঁহার ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন—হিন্দু তাহা বুঝে না; তাঁহারা বুঝেন না যে, তাঁহারা ত্রিংশৎ ত্রিকোটী দেবতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন নাই—কার্য্যবশতঃ দেব বলিয়া গণ্য হইয়াছেন,—তাঁহারাও তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্য হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করতঃ কার্য্য বলে দেবতাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারাও তাঁহাদের সমান আসন লাভ করিতে পারেন। বাঙ্গালী ইহা বুঝে না বলিয়াই আজিও তাঁহারা অধঃপতিত—জানি না কতদিনে তাঁহারা প্রকৃত দেবত্বের কারণ বুঝিতে সক্ষম হইবেন, হইয়া আপনাদিগকেও দেবোপম করিতে চেষ্টা করিবেন! গারিবলডী সে দিন ইটালীক্ষেত্রে জন্মিয়াও দেবোচিত কার্য্যে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন—তাই খ্রীষ্টান দেশেও তাঁহার প্রতিমা অর্চ্চিত হইল। তিনি যাহা করিয়া দেবত্ব পাইয়াছেন, অন্যের পক্ষে কি সে পন্থা অনভিগম্য? কখনই নহে—পথ দুরভিগম্য হইতে পারে কিন্তু অনভিগম্য কখনই নহে। তাহা সকলকার জন্যই সকল সময়ে উদ্ঘাটিত আছে—পথ কণ্টকময় নহে—সুপরিষ্কৃত। কিন্তু তাহাতে যাইবার ইচ্ছা কই—প্রবৃত্তি কই? সুতরাং তাহা রাজবর্ত্মের ন্যায় সুপ্রশস্ত হইলেও লোকের নিকট কণ্টকাকীর্ণ, যিনি এই পথের পথিক তিনিই ধন্য—তিনিই মনুষ্য হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলেও দেবতা। কিন্তু মানবকুল স্বার্থ মণ্ডিত;—সুতরাং এই বিস্তৃত পথ তাঁহারা স্বার্থের চক্রে পড়িয়া দেখিতে পান না;—তাই অপ্রশস্ত বর্ত্ম দিয়া প্রায়শঃই মানবের গতি। যে পথ স্বার্থান্ধ মনুষ্যের রুচির উপযোগী হইল—সেই পথেই তাঁহার গতিবিধি; সুতরাং রুচির বশীভূত হইয়া—আবার আপনার রুচিকে, সুরুচি বিবেচনা করিয়া মানব

সেই পথেই প্রধাবিত ; কাজেই যাহা সুপ্রসস্থ রাজবর্ত্ম যেখানে স্বার্থের দুশ্চিন্তা নাই—যথায় পথে রুচি নহে, নীতিপথ পরিদর্শক, সে পথে অধিক লোকে যাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন না—তাই মানবের দুর্গতি।

পৃথিবীতে উন্নতি প্রয়াসী নহেন এমন কোন মানব নাই ; সকলেই এই উন্নতি প্রাপনার্থ নানাদিকে প্রধাবিত। সুসভ্য জর্ম্মাণ—ইংরাজ হইতে, অসভ্য এস্কুইমো—হটেণ্টট পর্য্যন্ত সকলেরই ইহার জন্য ছুটা-ছুটী করিতেছে ; যে যত উন্নীত হইতেছে তাহার বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষা ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। কোন কামনাই তাহার উপভোগে প্রশমিত হয় না —প্রত্যুত তাহা ভূয়ো ভূয়ঃ পরিবর্দ্ধিতই হইতে থাকে ; যে ব্যক্তি কোন একটী কামনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—তাহার সেটি পূর্ণ হইলে তদপেক্ষা উন্নত কামনা তাহার হৃদয় অধিকার করে—তৎপূরণের নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুলিত হয় ; তাহা পূরিত হইলে আবার তাহা অপেক্ষাও উচ্চ-তর কামনা তাহার হৃদয় মন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হয়, সুতরাং কামনার পরি-তৃপ্তি নাই—কামনা কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। যতই ইহার ফল সম্ভোগ করিবে ততই ইহা পাইবার নিমিত্ত হৃদয় প্রোৎসাহিত হইবে। তাই উন্নতি কামনা মনুষ্য হৃদয় হইতে তিলার্দ্ধ সময়ের জন্য অন্তর্হিত হয় না, তাই মানবকুল অহর্নিশ ইহার নিমিত্ত ছুটাছুটী করিতেছে। কিন্তু মনুষ্য সকল সময়ে ইহার পন্থা নির্ব্বাচন করিতে পারে না। উন্নতি লাভেরও দুটি পথ, একটি সুপ্রশস্থ—স্বার্থ জড়িত অথচ সুরুচিপূর্ণ ; অপরটি প্রথম সঙ্কীর্ণ—পরিণাম প্রশস্থ—নিঃস্বার্থ মণ্ডিত—সুনীতি পরিপূর্ণ। প্রথম পথ অনুবর্ত্তন করিলে তাহার ফল উত্তম হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না ; তাহা নিজের অভিপ্রায় মত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা আদর্শ হয় না, এদিকে দ্বিতীয় পথ অনুসরণ করিলে তাহার ফল নিজের নিকট উত্তম বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে কিন্তু তাহা ধ্রুব—তাহা সকলরই অনুকরনীয়—তাহা সকলেরই পূজার বস্তু—তাহা উত্তমেরও পূজ্য। যে সকল মহাপ্রাণ এই নশ্বর জগতে অবিনশ্বর খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন যাঁহারা মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতারও বরণ্য হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই দ্বিতীয় পথের অনুযাত্রী। আর যাহারা

মনের সুখে খাইয়া গাইয়া হাসিয়া নাচিয়া আপনাদের রুচিমত কার্য্য সমাধা করিয়া পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশ্রিত করিয়াছেন—যাঁহাদের খ্যাতি যাঁহাদের দেহের সঙ্গেই পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই ঐ প্রথম পথের পথিক; তাঁহারা আর কোথাও নাই—জগতের সকলেরই কাছে তাঁহাদের বারতা জিজ্ঞাসা কর—কেহই আর তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন না—কেহই আর তাঁহাদের কথা বলিতে পারেন না; তাহারা যেন কখন জগতে ছিল না—এই পৃথিবী যেন তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নহে। দুঃখের বিষয় এই পথেরই যাত্রীসংখ্যা অধিক, তাই পৃথিবীর এত দুর্গতি—তাই এত অধোগতি। যদি মানব সাধারণ এই দ্বিতীয় পথের পথিক হইতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গের আকার ধারণ করিত; তাহা হইলে মানবে ও দেবে কোন ভিন্ন ভেদই থাকিত না, দেবতা হইতে, পৃথিবীর সেই অবস্থা প্রার্থনীয়—ইহার এই রমণীয় অবস্থা সকলেই আকাঙ্ক্ষনীয় হওয়া উচিত।

পৃথিবীতে মনুষ্য মধ্যে যে অবস্থাভেদ দর্শন করা যায়, তাহা এই পন্থা নির্ব্বাচনেরই ফল। একজনের দুই পুত্র, কিন্তু তাহার মধ্যে একজন মহাপ্রাণ—সকলেরই আদর্শ স্থানীয়—সকলেরই পূজ্য—দেববৎ মাননীয় এবং অপর জন হয় ত, পিশাচ হইতেও অধম—রাক্ষসীর কল্পনাও হয় ত তাহার পাপ চিত্র যথাযথচিত্রিত করিতে সক্ষম হয় না। এরূপ হইবার কারণ কি উভয়েই এক পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়া—এক মাতা পিতার যত্নে লালিত পালিত হইয়া এরূপ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয় কেন ইহার কি কোন কারণ নাই—অবশ্যই ইহার গূঢ় কারণ আছে। আমরা সেই কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই; তাহারা উন্নতি লাভের এই পথ নির্ব্বাচন জন্যই কেহই দেববৎ হইয়া উন্নতির উচ্চ তোরণে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন—আর কেহ বা পিশাচ-বৎ ব্যবহারে অধোগতির অধঃস্থানে যাইয়া পতিত হইয়াছেন। এক জনের পথ সুনীতি পরিপূর্ণ—অপরের সুরুচিময়; সুতরাং এক জন বাল্যকাল হইতেই নীতিপথে পরিচালিত হইয়া আপনার চরিত্রকে দেবতারও অনুকরণীয় করিয়াছেন—আর অপরজন আপনার রুচি

অনুযায়ী কার্য্য করিয়া দুষ্প্রবৃত্তি অনুরোধে আপনার চরিত্রকে পিশাচেরও ঘৃণ্য করিয়াছেন। তাই উন্নতি প্রারম্ভে পন্থা নির্ব্বাচন অতীব প্রয়োজনীয় এই নির্ব্বাচন জন্যই কেহ দেবতা—কেহ রাক্ষস। সুতরাং পথ নির্ব্বাচনের যথাযথ প্রয়োচনা দেওয়া পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, না দিলে তাহা মহাপাতক বলিয়া গণ্য এবং এই জন্যই জগদ্গুরু মহাপ্রাণ মহর্ষিগণ নানারূপে এই উপদেশ প্রদান করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। য হাতে পৃথিবীস্থ সকলেই দেববৎ মান্যলাভে কৃতার্থ হন; ইহা তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন, তাই যিনি যেরূপে উপদেশ সকলেরই গ্রহণীয় হয় বিবেচনা করিয়াছেন, তিনি সেই রূপেই তাহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য মহাত্মাগণ সকলেই এই একই উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের কথা ছাড়িয়া দিই; একবার আমাদের প্রচ্য মহর্ষিগণের দিকে দেখি; দেখি তাঁহারা এই নীতি লোকের মনে কি ভাবে গাঢ়াঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তদীয় জগদ্বিখ্যাত বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ এক উপখ্যানের অবতরণা করিয়াছেন ?—"স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্থানপাদ নামে দুই পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে উত্থানপাদ সংসারী, তাঁহার দুই পত্নী, সুনীতি ও সুরুচি; রাজা দ্বিতীয়া পত্নীতেই সমধিক অনুরক্ত—তাঁহার ফল বা পুত্র উত্তম, প্রথমা ভার্য্যায় তিনি তত অনুরক্ত ছিলেন না কিন্তু তাহার ফল ধ্রুব। রাজা উত্তমকেই অধিকতর স্নেহ করিতেন—অঙ্কে লইতেন, ধ্রুব ক্রোড়ে যাইতে ইচ্ছা করিলে ইচ্ছা থাকিলেও সুরুচির ভয়ে তাহা করিতে পারিতেন না; কখন বা অঙ্কে উত্তোলন করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিতেন। তাই ধ্রুব বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসী; তিনি মাতার নিকট উপদেশ বচন শ্রবণ করিয়া সংসারের কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ; তাই মাতার অজ্ঞাতসারে রজনীর গাঢ়ান্ধকার তুচ্ছ করিয়া তিনি সেই অভীপ্সিত ফল লাভ করিবার জন্য পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী; তাঁহার সেই প্রাণোৎসর্গের ফল ঈশ্বর সাক্ষাৎ; তিনি সে বাল্যকাল হইতেই প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন

বলিয়াই আজিও তাঁহার নামধ্বনিত ; তাই সাধারণ স্বর্গ তাঁহাকে স্থান দিতে পারিল না ; তাঁহার জন্য অভিনব ধ্রুবলোক সৃজিত হইল। তিনি যে আশা করিয়াছিলেন "আমি নিজগুণে এমন পদলাভ করিব যাহা আমার পিতাও কখন প্রাপ্ত হন নাই," তাহাতেই কৃতকার্য্য হইলেন। পরিশেষে তাঁহার পিতাও তাঁহার অনুগ্রহের ভিখারী হইলেন।' মহর্ষি বেদব্যাস গল্পচ্ছলে এই মহান উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা বুঝে কে? এই রূপক ভাঙ্গিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হয় কে? তিনি যে জন্য এই মহান হিতকর আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করে কে? পৃথিবীতে উত্থান পাদ বা উন্নতি-লাভেচ্ছু সকলেই, কিন্তু প্রয় সকলেই সুরুচির বশীভূত—সুনীতি প্রায় সকলেরই নিকট পদ দলিত ; তাই ধ্রুব ফল অবজ্ঞা করিয়া লোকে উত্তম লাভার্থ লালায়িত, তাই পৃথিবীর এত দুর্গতি। হায়! যদি পৃথিবীর সমুদায় মানব ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিত—করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হইত তাহা হইলে এই পৃথিবী বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত।—যদি সকলেই সুনীতি প্রবর্ত্তিত পথে চলিত হইতে শিখিত তাহা হইলে এই বিলাস ভবন—নন্দন কাননে পরিণত হইত—তাহা হইলে এই নশ্বর পৃথিবী—অবিনশ্বর স্বর্গের আকার ধারণ করিত—তাহা হইলে সমগ্র মানবজাতি একটি বিরাট দেবতা বলিয়া গণ্য হইত ; সে পথ অধিকাংশেরই নিকট কণ্টকাকীর্ণ বলিয়াই আজি পৃথিবীতে ও নরকে কোন প্রভেদ নাই —ইহা যেন একটি বিভীষণ নিরয়।

পৃথিবীর কথা ছাড়িয়া দাও, একবার ভারত ভূমি—বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—ইহার ইদানীন্তন কতই কুভাবে দৃষ্ট করিবে। যে ভারতবর্ষ কিছুদিন পূর্ব্বে সুনীতির অগ্রণী ছিল আজি তাহা কুনীতি বা সুরুচির পৃষ্ঠপোষক। যে ভারত এক সময়ে নৈতিক জগতে আপনার এতাদৃশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য সমুদায় জাতিই সেই জন্য তাহার পদানত ছিলেন ; তাহারা যাহার নিকট হইতে মূল সত্য গ্রহণ করিয়া আপনাপন দেশকে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ তোরণে অবস্থাপিত করিয়াছেন—যাঁহার শিষ্যানুশিষ্য হইবার জন্য কত দিন

দিগন্তর হইতে লোক আসিয়া ইহার অমল ধবল গৌরব শ্রীর সমধিক দীপ্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই জগদারাধ্য ভারত আজি কুনীতির আশ্রয় স্থান। হায়! ইহার সে পূর্ব্ব গৌরব আজি কোথায়? অধিক দিনের কথা নহে যে ভারতবর্ষ চরিত্র গৌরবে—নীতি সৌরভে জগতের অনুকরণীয় ছিল—আজি তাহার সেই ভাস্করদীপ্তি কোথায় লীন হইল? যে ভারতে ত্রিংশৎ ত্রিকোটী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া নৈতিক জগতে ক্ষমতা বিস্তার পূর্ব্বক দেবত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন সে ভারতে পঞ্চবিংশতি কোটী সন্ততির মধ্যে আর কেহ দেবত্ব পাইবার অধিকারী নহেন, ইহা কি সামান্য পরিতাপের কথা? যে সকল দেশ ইহার ছায়া মাত্র লইয়া উন্নতির উচ্চসীমায় আরোহণ করিয়াছেন এবং তদবধি সূর্য্যকর-দীপ্ত চন্দ্রমার ন্যায় আপনার শুভ্রকান্তিতে আপন অধিবাসীবৃন্দকে প্রফুল্লিত করিতেছে—সেই সকল অধমর্ণ দেশে এখন আর মহাপ্রাণতায় অসদ্ভাব নাই। অধমর্ণ এক্ষণে নিজের বলে বলীয়ান হইয়াছে—সুতরাং উত্তমর্ণের দিকে আর ফিরিয়া চাহেন না। উত্তমর্ণ সমুদায় দিয়া আজি পথের ভিখারিণী হইয়াছেন—সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই—তিনি এক্ষণে তাঁহাদের অবজ্ঞার পাত্রী হইয়া পড়িয়াছেন—হায়! সেই মহাকৃপাবতী এক্ষণে তাঁহাদের অধমর্ণ হইয়া তাঁহাদেরই অধমর্ণ হইয়া তাঁহাদের কৃপাকণালাভের প্রত্যাশিনী, অহো! ইহাপেক্ষা তাঁহার কলঙ্কের কথা—তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? তাঁহার কলুষিত সন্তানগণের ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক ও দুর্ভাগ্য আর কি আছে? যে ভারত এক সময়ে মহাপ্রাণতার আবাস ভূমি ছিল—এক্ষণে তথায় সেই শব্দের ও সম্পূর্ণ অভাব। বঙ্গবাসী—ভারতবাসী! আপন পন্থা নির্ব্বাচনের এমন জীবন্ত উপদেশ নয়ন সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেও আর কেন ইতস্ততঃ করিতেছ, সুরুচি নহে--সুনীতি পথে পরিচালিত হইতে সচেষ্ট হও; তাহার ধ্রুব তোমার অঙ্কবর্ত্তী হইবেই হইবে। এক্ষণে ধ্রুব ফল কামনা সকলেরই মানস মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য; তাহা হইলে ভবিষ্যক্তে কি শান্তিলতা গুপ্ত আছে দেখিতে পাইব; না হইলে ভবিষ্যৎ চিরকালই ভীষণতর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

ভালবাসা।

"Love rules over court, over camp and grove,
Over men below and Heaven above,
For love is Heaven and Heaven is love."
Sir. W. Scot.

"ভালবাসা" কথাটী বড় মিষ্ট। এ সংসারে সকলেই ভালবাসার জন্য কাতর,—কি গৃহী, কি উদাসীন, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ - সকলেই কাহাকেও না কাহাকে ভালবাসে। জগৎ ভালবাসায় পূর্ণ,—স্বয়ং সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরও তাঁহার সৃষ্ট জড় অজড় সমস্ত বস্তুকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। সংসারে ভালবাসা—প্রাণে প্রাণে ভালবাসা, মনে মনে ভালবাসা, সুখ দুঃখে ভালবাসা, সম্পদ্ বিপদে ভালবাসা, ভাল মন্দে ভালবাসা—এই স্বর্গীয় ভালবাসা না থাকিলে সংসার চলিত না। ভালবাসার চিত্ত-বিমোহনকারিণী প্রতিভাবলেই মনুষ্য সংসারে সংসক্ত হয়; আবার ভালবাসার প্রবল উচ্ছ্বাসেই মনুষ্য আপনা ভুলিয়া, সংসারের মায়া ভুলিয়া, দেবভাবে মত্ত হয়, চরমে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়, অনন্ত ধামে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে।

সকলেই "ভালবাসা" ভালবাসে, কিন্তু কয় জন ভালবাসার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়াছে?—কয় জন প্রকৃত ভালবাসিতে শিখিয়াছে? ভালবাসা সাধারণ সামগ্রী নহে, চক্ষের ভালবাসা সকলে বাসিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা, নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সংসারে নিতান্ত বিরল। সময়ভেদে অবস্থা ভেদে, পাত্র ভেদে ভালবাসার তারতম্য ঘটে সত্য, কিন্তু সে ভালবাসা অন্তরের ভালবাসা নয়, সে নব-প্রেমানুরাগী যুবকের যৌবন সুলভ 'চখের দেখার' ভালবাসা। সেই রূপ ভালবাসার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াই কবি লিখিয়াছেন—

"—Young men's love then lies
Not truly in their hearts, but in their eyes" *

সে ভালবাসা আপাত মধুর, তার পরিণাম বড় বিষময়। ভালবাসা কি মুখের কথায় হয়?—ভালবাসা কি চ'খের দেখায় হয়?—ভালবাসা কি ধনের লোভে হয়?—ভালবাসা কি রূপের ছটায় হয়?—এ সকলেই ভালবাসা হয়, কিন্তু সে ভালবাসা চিরস্থায়ী নয়—সে ভালবাসা ক্ষণিক—সে ভালবাসায় সুখ নাই। ভালবাসার বিনিময় না হইলে ঐহিক সুখ হয় না।—জগৎ কেমন স্বার্থকর, একটু স্বার্থ না থাকিলে কোন কার্য্যে মন আকৃষ্ট হয় না, কোন বিষয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তুমি আমাকে যে পরিমাণে ভালবাস, আমি তোমাকে সেই পরিমাণে ভালবাসি, তবেই ভালবাসার বন্ধনী দৃঢ় হইল, ভালবাসায় সুখ জন্মাইল. নচেৎ ভালবাসা দুই দিনে শিথিল হইয়া পড়িল, বায়ুর স্রোতে মিশাইয়া গেল। এ ভালবাসা কেবল মনুষ্য হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিচায়ক, এ ভালবাসা স্বার্থময়, এ ভালবাসার মহত্ত্ব কোথায়?

প্রাণ দিয়া সকল সময়ে প্রাণ পাওয়া যায় না। তুমি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাস, আমি তোমাকে বাসি না:- আবার হয় ত, আমি তোমাগত-প্রাণ, তোমা ছাড়া থাকিতে পারি না, তোমাকে না দেখিয়া অস্থির হই, তোমা ভিন্ন সংসারে আর কিছু সুখের সামগ্রী দেখিতে পাই না, তোমার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাস না, আমার মূর্ত্তি তোমার চক্ষুঃ-শূল, আমার নাম তোমার কাণে বিষবর্ষণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমি আর ভালবাসিব না?—যাহাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিয়াছি, তাহাকে কি আর ভুলা যায়? প্রতিদানের আশা ত্যাগ করিয়া, স্বার্থশূন্য হইয়া, যে ভালবাসে তারই যথার্থ ভালবাসা।

"—জলে প্রাণ যায় যায়,
জলুক্ তাহে ক্ষতি নাই,

* Romeo and Juliet Act II. Sce. III.

সে আমার সুখে থাকুক,
নাহি সাধ অন্য কোন।"

বলিযা যে ভালবাসিয়াছে, সেই ভালবাসার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়াছে, সেই কেবল ভালবাসিতে শিখিযাছে। এই ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা,—এ ভালবাসা জগতে নিতান্ত দুর্লভ। কিন্তু এ ভালবাসাতেও স্বার্থ আছে; আমি তোমাকে ভালবাসিয়া সুখী হই, তাই তোমাকে ভালবাসি; নচেৎ বাসিতাম না। এ জগতে আমাব সম্মুখে অনেক বস্তু বহিয়াছে, কিছুই দেখিযা আমাব তৃপ্তি হয় না কেবল তোমাব মুখখানি দেখিতেই আমি ভালবাসি, তোমা ভিন্ন এ জগতে আমাব আব ভালবাসিবাব সামগ্রী নাই। এ ভালবাসা সীমাবদ্ধ, এ ভালবাসাতেও উদাবতা অল্প।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেব সকল বস্তুই ইচ্ছাময়েব ইচ্ছা প্রসূত। সকল বস্তুই তাঁর অনন্ত ভালবাসায আকৃষ্ট। তাঁব চক্ষে ভাল মন্দ নাই, ইতব বিশেষ নাই, পাত্রাপাত্র নাই,—সকলেই তাঁব সমান ভালবাসাব পাত্র। এই ভালবাসাই নির্ম্মল, নিস্পাপ, স্বর্গীয ভালবাসা। এ ভালবাসাব সমযাসময নাই, রূপ গুণ বিচাব নাই, অবস্থাব দিকে লক্ষ্য নাই। এ ভালবাসায বসেব ছড়াছড়ি নাই, কল্পিত সৌন্দর্য্য নাই, হৃদয-দগ্ধ-কাবিণী দীপ্তি নাই। এ ভালবাসায মাধুবী অল্প, মিষ্টতা অল্প, দুঃখ অল্প, আপাতমধুব সুখও অল্প। এ ভালবাসা নীবস, নিস্পন্দ, শান্তিময। যে এই রূপ সমগ্র জগৎকে ভালবাসিতে শিখিযাছে, সে অমবত্ব লাভ কবিযাছে। ইহ জগতই তাহাব স্বর্গ, কেন না ভালবাসাতেই স্বর্গ নিহিত। তাহাব ভালবাসাব অন্ত নাই, সে জগতেব সমস্ত পদার্থকেই আপনাব জ্ঞান কবে, সকল বস্তুতেই বিমল সৌন্দর্য্য দেখিতে পায। এ ভালবাসায কালিমা পড়িতে পায না। কিন্তু এ জগতে এরূপ ভালবাসাব জীবন কযটা মিলে?—এ ভালবাসা যে বাসিয়াছে সে ঐহিক কার্য্যক্ষেত্র ত্যাগ কবিযা আধ্যাত্মিক জগতে অনন্তকালেব জন্য বিচবণ কবিতেছে,—বাধা নাই,—বিরাম নাই,—অনন্ত সুখ শান্তি তাহাব চতুর্দ্দিকে অচল, অটল, চিবস্থাযী বহিয়াছে। ইহ জগতে এ ভালবাসা খুঁজিয়া পাওযা যায না—ইহা কেবল কল্পনাব সামগ্রী মাত্র। কিন্তু এ সংসাব কল্পনা ক্ষেত্র নহে, মনুষ্যেবও কল্পনাব দাস হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এ সংসার দর্পণ-প্রতিফলিত পদার্থ বিষয়ের ছায়া নয়, ইহা প্রকৃত পদার্থ সমূহের সমবায়। এ জীবন প্রকৃত কার্য্যের জীবন, কল্পনা-অনুসরণকারী জীবন নহে। তবে সেই কল্পনার ভালবাসা ভাবিয়া এ জীবনে কি হইবে?

সকল বস্তুর ন্যায় ভালবাসার ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বলে যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল ফুল সমস্ত হয়, সেইরূপ ভালবাসারও প্রথম 'চখের দেখার' ভালবাসা, পরে বিনিময়ের ভালবাসা, স্বার্থ শূন্য ভালবাসা, অন্তিমে অনন্ত বিশ্বজনীন ভালবাসা। সংসারে যাহা অনায়াসলভ্য, সেই ভালবাসাই বাসিবে। পরে ক্রমোন্নতি গুণে ভালবাসার গুপ্ত মাধুরী প্রকাশিত হইবে, মনে উদারতা জন্মিবে, ক্রমে সমগ্র জগৎকে ভালবাসিতে শিখিবে। ইহ জগতে সেই স্বর্গীয় ভালবাসায় হৃদয় ভাসিয়া যাইবে, অনন্ত শান্তিময় স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে।

আশা।

১

নীরব অবনি, নিশা নীরবে বহিয়া যায়
সুনীল বিমান ভালে শত তারা শোভা পায়,
অদূরে জাহ্নবীজল করিতেছে টল মল
শশীর কিরণ জাল সোহাগে খেলিছে তায়,
বুকে পুরে বুকে থুয়ে তরঙ্গ ভাসিয়া যায়।

২

এ হেন সুখের নিশি কিন্তু আমি কাঁদি কেন,
বুকেতে পুশেছি হায় কেন বা বিষাদ হেন?

যেই দুখে কাঁদি আমি জানেন অন্তর জামি
আর কে জানিবে বল, কেন দহে হৃদি তল,
কেন নিরিবিলি কাঁদি, ভেসে যায় বক্ষঃস্থল।

৩

নভ ভালে হেসে হেসে কে তুমি ভাসিয়া যাও,
দূর হ'তে আভাগারে অপাঙ্গে ফিরিয়া চাও?
বল শশী বল তবে দেখেছ কি এই ভবে
কাঁদে কেহ মোর তরে নীরবে বসিয়া হেন,
বল শশী বল বল, অভাগারে দহ কেন?

৪

ভুলেগেছ জগতের কুটিল যাতনা যত,
সময়েতে পেয়ে তব কুমুদিনী মন মত,
ভাল শশী হাস হাস মিটুগ তোমার আশ
তুমি সুখনীরে ভাস, আমি সুধু কাঁদি বসে,
এ যাতনা যে যাতনা সহজে যাবেনা ভেসে।

৫

হাস শশী হাস তবে, আমি বা কাঁদিব কেন,
সাধ করে এত জ্বালা হৃদয়ে পুষিব হেন,
তারে ত পাবার নয় তবে কেন আশা হয়
দূরে যাও আশা তুমি পারি না তোমারে আর,
ছেড়েও ছাড়েনা আশা ধন্য কুহকিনী সার!

৬

হাসুক জগত-জন হাসুক প্রকৃতি সতী
হাস শশী আকাশেতে ছড়ায়ে তোমার ভাতি,
হাসুক জাহ্নবী জল, হাসুক অবনীতল,
হাসুক অমরাবতী সহ অমরের দল,
ছাড়িব না দুরাকাঙ্ক্ষা আশা দেবী তব ছল।

৭

নীরবে নিভৃতে বসে মুদিয়া নয়ন দুটী,
ভাবিব সে চাঁদমুখ নিরূপম পরিপাটী,
যায় জ্বলে যাবে প্রাণ, হই হব হতজ্ঞান,
আশার রতনে পুষি রাখিব যতন করে,
হৃদয়ের ধনে বল কে দূরে ফেলিতে পারে।

৮

ক্ষণিক মানব প্রাণ না হয় জ্বলিয়া যাবে,
হৃদয়ের কোমলতা পুড়ে পুড়ে ছার হবে,
বুকেতে পশিবে বান তাহে হারাইব প্রাণ
প্রপঞ্চ অসার দেহ পঞ্চভূতে মিশাইবে,
তবু তোর আশা সখী হৃদয়েতে বিরাজিবে!

কুসুমিকা।

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট।

কুসুমিকার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র, দেখিতে পরমা সুন্দরী,—যে সকল সৌন্দর্য্য থাকিলে রমণী অতুলনীয়া সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত হয়, কুসুমিকার তাহার কিছুরই অভাব ছিলনা; সংক্ষেপে তাহার সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। কুসুমিকার শ্বশুরালয় তারাবিহারী, বিবাহ অবধি কুসুমিকা তথায় বাস করিতেছে।

কুসুমিকার স্বামীর নাম হরিপদ—জাতিতে ব্রাহ্মণ, প্রায় পাঁচ বৎসর হইল ব্রহ্মত্তর বিষয়গুলি বিক্রয় করিয়া সুন্দরী কুসুমিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। কুসুমিকা যে কেবল সুন্দরী তাহা নহে, তাহার আরও অনেক গুণ ছিল, স্ত্রীর যে সমস্ত গুণ থাকিলে স্বামীর সুখের বৃদ্ধি হয়। স্বামী সংসারকে সুখাস্পদ বলিয়া ধারণা করে, জগতের সহিত সমধিক মায়া জালে বদ্ধ হয়, সে সমস্ত অমূল্যগুণ আমাদের কুসুমিকাতে বর্ত্তমান ছিল।

কুসুমিকার বাল্যাবস্থাতেই পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হয়, একমাত্র খুল্লতাত ছিলেন, তিনিও কুসুমিকার বিবাহের পর গত হইয়াছেন। তাঁহার স্বামী ভবনে এক মাত্র স্বামী ভিন্ন অপর কেহই নাই।

বিবাহের পর অবধিই হরিপদকে ঘোরতররূপে দরিদ্রতা ভোগ করিতে হইতেছিল, দিন বায় ক্লেশে অতিবাহিত হইত। হরিপদ ভালরূপ লেখা পড়া জানিতেন না, তাহাতে বিষয়াদি ছিলনা, কেবল ১০।১২ ঘর যজমান মাত্র উপলক্ষ, তদ্বারা একটী সংসার কোন ক্রমেই পরিচালিত হয় না। কিন্তু কুসুমিকা গুণবতী ভার্য্যা, কুসুমিকা আপনি সহস্র ক্লেশ অম্লান বদনে সহ্য করিয়া আপন স্বামীকে সাধ্য মত সুখে রাখিতে চেষ্টা করিত, আপনি অৰ্দ্ধ ভোজন করিয়া স্বামীকে আহার করাইত, এই রূপে দিন যায়। কিন্তু কুসুমিকা আহ্লাদিনী আদরিণী পতি সোহাগিনী, সে এ সকল সাংসারিক ক্লেশকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাগ্র চিত্তে পতির মনোরঞ্জন করিত, পতি সকল ভুলিয়া যাইতেন, একদৃষ্টে একমনে সেই প্রেমপরায়ণা কুসুমিকার বদন প্রতি চাহিয়া রমণী কুলকে ধন্যবাদ দিতেন। তাহাকে দেবী বলিয়া জানিতেন।

মধ্যে মধ্যে—অৰ্দ্ধভোজন, ছিন্ন বসন পরিধান, ভগ্ন গৃহে বাস এ সকল দুঃখ কুসুমিকার হৃদয়ে স্থান পাইত না। যদ্যপি প্রতিবাসিনী কেহ তাহার দুঃখে দুঃখ করিত, তাহা হইলে বলিত "ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাতে দুঃখ কি?" প্রকৃত প্রস্তাবে কথাটী কুসুমিকার অন্তরের কথা।

লোকে বলে অন্ন চিন্তায় মনুষ্যের কোন সুখ থাকেনা, কিন্তু কুসুমিকার ভাগ্যে এ কথাটীর সার্থকতা সম্পাদিত হয় নাই। ইহাতে তাহার আহ্লাদ, স্ফূর্ত্তি, প্রেম, স্নেহ, বিনয় বা ভালবাসার কিছু মাত্র বত্যয় হয় নাই।

হরিপদর সংসারে এক কুসুমিকা রত্ন ব্যতীত অপর কিছুই ছিলনা। সেই পর্ণকুটীরে দিবানিশি নন্দনের অপূর্ব্ব পারিজাত ফুটিয়া থাকিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিবর্ত্তন।

পণ্ডিতেরা বলেন দুঃখের পর সুখ, আর সুখের পর দুঃখ হইয়াই থাকে, কিন্তু আমাদের কুসুমিকার দুঃখের নিশি পোহাইয়া সুখের উষা দেখা দেয় না কেন? যে কুসুমিকার দুঃখ সময়েও হৃদয় অচল, ভালবাসা অটুট, স্বামীভক্তি অনন্ত, সুখের সময় তাহাদের কিরূপ প্রাবল্য হয় তাহা আমরা দেখিতে পাইনা কেন? হরিপদর চেষ্টার ক্রটী নাই, কিন্তু তাহার ভাগ্য-লিপির প্রসন্নতা হয় না কেন?—যাহার কুসুমিকার ন্যায় স্নেহময়ী পত্নী তাহার ভাগ্য কি মন্দ? কখনই না। কিন্তু দরিদ্রতা ঘুচেনা কেন?

প্রায় তিন বৎসর কাল হরিপদর এই রূপ সুখে দুঃখে অতিবাহিত হইতেছে, কিন্তু আর চলেনা, এই সময় বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, হরিপদর ভাগ্যে ঈশ্বর তো চির দুর্ভিক্ষ লিখিয়াছিলেন তাহার উপর আরও হইল। হরিপদ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, কি করিয়া উদরান্ন জুটিবে এই চিন্তা আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

দেশময় হাহাকার রব, গৃহে গৃহে হা অন্ন যো অন্ন ধ্বনি। আজ তিন দিবস কুসুমিকার ভাগ্যে অন্ন যুটে নাই,—দিবা অবসান প্রায়, এমত সময়ে হরিপদ মলিন বদনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া দুই মুষ্টি ভিক্ষা পাইয়াছেন, কুসুমিকা তাহাই স্বামীকে রন্ধন করিয়া দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু হরিপদ বলিলেন "না কুসুম আমি আজ্ আহার করিব না, তুমি খাও, তোমার পেটে আজ তিন দিন ভাত নাই।"

হরিপদর চক্ষু সজল হইল, কুসুমিকা অতি সতর্কতার সহিত আপন নয়নবারি দমন করিয়া বলিলেন "আমার আজ বড় অসুখ করিয়াছে আমিত ভাত খাইব না।"

হরিপদ। কুসুম আমায় ও কথা বলিওনা, তোমার মলিন শুষ্ক বদন দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। হা ঈশ্বর। তোমার মনে এই ছিল,—কুসুমিকা, প্রাণেশ্বরি। কেন তোমায় কেবল ক্লেশ দিতে বিবাহ করেছিলাম।

কুসুমিকা। কাঁদিওনা, ঈশ্বরের ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয়, তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহার ইচ্ছার ব্যতিক্রম হয় না।

হরিপদ। সকলি সত্য, কিন্তু আর যে সহ্য হয় না, তোমার মলিন বদন যে আর দেখ্‌তে পারি না।

কুসুমিকা। তুমি আমার জন্য ভাবিওনা, আমি তোমার প্রাণ কিসে রক্ষা হইবে তাহাই ভাবিতেছি।

হরিপদ স্নেহ ভরে কুসুমিকাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার সেই দুর্ভিক্ষ দগ্ধ হৃদয়ও ক্ষণ তরে তাহার মোহকর মায়ায় ভুলিয়া গেল তিনি তখন সংসার ভুলিলেন, সকল যন্ত্রনা বিস্মৃত হইলেন, সেই মনমোহিনীর অপূর্ব্ব সরলতাময়ী মুখমণ্ডল প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে হরিপদ বলিলেন "কুসুম এমন করিয়া কদিন বাঁচিবে?"

কুসুমিকা নীরব হইয়া রহিল।

হরিপদ। না কুসুম তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে।

কুসুমিকা। ভয় কি।

হরিপদ। কুসুম, আমার কথা শুন, চল আমরা অন্য দেশে যাই, এ দেশে থাকিলে নিশ্চয়ই উভয়ে প্রাণ হারাইব।

কুসুমিকা। কোথায় যাইব?

হরিপদ। কাশিমবাজারে—শুনিয়াছি, সেখানকার মহারাণী স্বর্ণময়ী বড় দান শীলা, তাঁহার শরণাগত হইব।

কুসুমিকা স্নেহ ভরে স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "যাইব, কিন্তু ঐ কটী চালের ভাত রান্ধিয়া দি, খাও।"

হরিপদ। না কুসুম আমায় ও অনুরোধ করিও না, আমার মুখে ভাত উঠিবে না, আজ তিন দিন ঐ রূপ হইতেছে, আজ তুমি কিছু না খাইলে বাঁচিবে না।

কুসুমিকা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তুমি না খাইলে আমি কাশিমবাজার যাইব না।"

এ অবস্থাতেও কুসুমিকার অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, হরিপদ বুঝিলেন যে তাহা কেবল তাঁহাকে শান্ত্বনা করিতে, যাহাই হউক, অগত্যা হরিপদকে অনেক অনুনয় বিনয়ের পরেও সেই অন্নের অর্দ্ধেক গুলি খাইতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——০:*:০——

প্রবাস।

পর দিবস অতি প্রত্যুষে, গ্রামস্থ অপর কেহ জাগরিত হইবার পূর্ব্বে হরিপদ ও কুসুমিকা প্রবাস যাত্রা করিলেন। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর এই রূপে তাঁহারা ক্রমশ চারি পাঁচ দিবস চলিলেন। ক্রমে তাঁহাদের ইপ্সিত স্থানে পৌছিলেন। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করা আমাদিগের দম্পতি দ্বয়ের বড়ই ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল, সকল দেশেই হাহাকার, মুষ্টিভিক্ষা তাহাও মিলিত না। তদুপরে ভিক্ষাকের সংখ্যা ধারেনা। কুসুমিকা আপন শরীর অযত্নে ধূলি ধুসরিত করিয়াছে, অঙ্গে এক খানি মোটা কাপড, এই অভরণে এই বেশে সেই কনকলতিকা জ্যৈষ্ঠ মাসের নিদাঘ রৌদ্রে স্বামী সহ যাইতেছে।

সাধ্বী সতী পতিব্রতা কুসুমিকা এইরূপ ঘোর ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছে, আবার হয়ত, কত দ্বিচারিণী স্বৈরিণী স্বামীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অপার সুখ সাগরে ভাসিতেছে, অবিরত হেম অঙ্গে সুগন্ধি সেচনেও

দেহের শান্তি বিধান হইতেছে না। জগৎপিতা, দয়াময়। তোমার না তুলাদণ্ডে বিচার? কিন্তু তাহার নিদর্শন কই? না না কুসুমিকা তোমার হৃদয়ের সুখ, তাহার হৃদয়গত বৃশ্চিক দংশন জনিত যাতনার তুলনায় অতুলনীয়। কিন্তু বিধাতঃ। ইহাতে সকল আশা মিটে কই, মনের সকল সুখ সাধনা হয় কই?

পথিমধ্যে বৃক্ষমূলে ইষ্টক বা মৃত্তিকা খণ্ড মাত্র উপাধান স্বরূপ অবলম্বন করিয়া উভয়ে নিদ্রা যাইত। কুসুমিকার এত ক্লেশ এত যাতনা হরিপদর হৃদয়ে সহিত না। অন্তরে অন্তরে তাঁহার যে যাতনা হইত তাহা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও হরিপদ ব্যতীত অপর কেহই জানিতেন না। কিন্তু হরিপদ সে যাতনা বাক্যে প্রকাশ করিতেন না, কেবল অন্তরের দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার সেই সমস্ত অসীম যাতনার প্রমানস্বরূপ ছিল। কিন্তু পতিপ্রাণা কুসুমিকা প্রায়ই হরিপদের এরূপ হৃদয় বিকলতা উপলব্ধি করিলে তৎক্ষণাৎ অন্য রূপ নানা কথা কহিত, তাহার প্রাণাধিক হরিপদকে অন্যমনস্ক করিত।

হরিপদ ভাবিয়াছিলেন, তিনি কাশিমবাজারে একটী ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মান করিয়া তন্মধ্যে থাকিবেন, বোধ হয় মহারাণী দরিদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে গৃহে চাউল ইত্যাদি বিতরণ করিয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ পাইবেন। বৃক্ষ তলে বাস তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ক্লেশউদ্ভাবন করিয়া দিত। পথি ভ্রমণে তাঁহার বড় ক্লেশ হইয়াছিল, বিশেষতঃ কুসুমিকার জন্য,—হয়ত চলিতে চলিতে কুসুমিকার পদতল ক্ষত হইল, শোনিত স্রাব হইল, যদিও কুসুমিকা সতর্কতার সহিত সে সমস্ত গোপন করিত, তথাপি হরিপদ প্রায়ই তাহা দেখিতে পাইতেন, অজস্র রোদন করিতেন, আর বলিতেন "হা ঈশ্বর তোমার মনে কি শেষে এই ছিল। অভাগাকে কি এত ক্লেশ দিতে স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন?"

মনুষ্য মাত্র নানা সময়ে নানা আশা করে, কিন্তু আশার সফলতা কোথায়? আমাদের দম্পতি যুগল কাশিমবাজারে যাইয়া দেখে যে একটী প্রকাণ্ড আটচালায় সহস্র সহস্র শীর্ণ দেহী স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা একত্র আহার করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে মহারাণীর জয় ঘোষনা করিতেছে। স্ত্রী পুরুষে

দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিল, ভাবিল, ইহা সাধারণ বন্দোবস্ত, অন্য বন্দোবস্তও আছে, হরিপদ লজ্জা, মান, সম্ভ্রম যে দিন বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, সেই দিনই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বিশেষতঃ এ রূপ ভয়ানক দুঃসময়ে লজ্জা করিয়া অনিষ্ট ব্যতিত ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

হরিপদ একটী ভদ্র লোক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ মহাশয় দরিদ্র গৃহস্থ দিগের কি রূপ বন্দোবস্ত।"

ভদ্র লোকটী কোন উত্তর দিলেন না, যাঁহার হাতে এত লোকের অন্নের ভার, তিনি কি সহসা কাহার সহিত কথা কহেন।

হরিপদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শ্বেত বস্ত্র বিশোভিত ভদ্র লোকটী বলিলেন "তুমি কেহে?"

হরিপদ। আমি বাঙ্গাল, অন্ন আশায় দেশ ত্যাগী হইয়া এখানে আসিয়াছি।

ভদ্রলোকটী স্বকটাক্ষে কুসুমিকার দিকে চাহিয়া বলিল "এটীকে?"

হরিপদ। আজ্ঞে—

ভদ্রলোক। আজ্ঞে কিরে?

হরিপদ। আমার স্ত্রী।

ভদ্রলোক। তোর্ স্ত্রী এত সুন্দরী। কখনই না, হয়ত আর কার কি করেছিস্।

হরিপদর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল, মনে মনে বলিলেন "হে ভগবান ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু হইল না কেন?"

কুসুমিকার ও চক্ষু দিয়া জল আসিল।

ভদ্রলোকটী কিছু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন "তোমরা খাবে কি?"

হরিপদ। আজ্ঞে আমরা ব্রাহ্মণ তা কি পারি।

ভদ্রলোক। তবে কি সিদে চাও?—

হরিপদ। আজ্ঞে হাঁ।

ভদ্রলোক। তা আজ্ আর হবে না, কাল ভোর বেলা এস।

হরিপদ সজল চক্ষে বলিলেন "মহাশয় কালহোতে আমাদের দুজনার আহার হয় নাই।"

ভদ্রলোক। কি কর্‌ব বাপু।

হরিপদ আর একটী কথাও না কহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুসুমিকা সহ অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রবাসের সুখ।

হরিপদ এই রূপ বিমর্ষভাবে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটী সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাটী দেখিতে পাইলেন, তথায় আপন অনাহারের কথা বলিয়া ভিক্ষা চাহিলেন, সেই ভিক্ষা লব্ধ অন্নগুলি রন্ধন করিয়া আহার করিবেন, বড আনন্দ কিন্তু সে আনন্দ অধিকক্ষণ রহিল না, বাস স্থানে যাইয়া দেখেন পাত্র নাই, কাষ্ঠ নাই, সুতরাং আর অন্ন রন্ধন করা হইল না। বিশেষতঃ সন্ধ্যা হইয়াছে এখন আর কোথায় হাঁড়ি অন্বেষনে যাইবেন ? একে ক্লান্ত হইয়াছিলেন তায় অপরিচিত স্থান, কোথায় যাইবেন স্থির হইল না, সুতরাং আর গেলেন না, কিন্তু মনে বড়ই ক্লেশ হইল।

কুসুমিকা নিকটবর্ত্তী সরোবর হইতে চাউলগুলি অঞ্চলে বাঁধিয়া সিক্ত করিয়া আনিল এবং যথা সাধ্য উভয়ে আহার করিয়া তরুতলে শয়ন করিল। উভয়েই অতিরিক্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন সুতরাং যেন অল্পকাল মধ্যেই নিশি প্রভাতা হইল। যে হত ভাগ্য দারিদ্র নিপিড়ীতেরা নিশিথিনীর আগমনে নিদ্রাদেবীর প্রসাদে প্রবল দুশ্চিন্তা সকল ভুলিয়াছিল, সূর্য্যের সমাগমে যেন সে সমস্ত আবার তাহাদের হৃদয় মধ্যে সহস্র প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

ধনিন। একবার তরুতলে চাহিয়া দেখ যে কি নন্দন-সৌরভাপ্লুত পারিজাত যুগল ফুটিয়া রহিয়াছে, তোমার হৈমাট্টালিকার কুসুম-শয্যায় যে পুষ্প আকাশ কুসুম, আজি তরুতলে সেই ফুল।

প্রভাতে দম্পতীদ্বয় নগরাভিমুখে চলিলেন, কতক গুলি যুবা প্রাতঃ ভ্রমণে যাইতেছিল, তাহারা কুসুমিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, বালাকের প্রাণ,

ক্ষণেক পরেই আপনাদের চপলতা প্রকাশ করিল, যদৃচ্ছ পরিহাস বিদ্রূপ আরম্ভ করিল, হরিপদর হৃদয় দহিতে লাগিল, কিন্তু উপায় কি? তিনি একক ইহারা পাঁচ ছয় জন, বিশেষতঃ বিদেশ, কি করিতে কি হইবে, হয়ত আরও বিপদপাৎ হইবে, হরিপদ এই রূপ অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া সেই যুবক দিগকে কাতর ভাবে তাহা হইতে বিরত হইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু যুবকেরা ভাবিল আমরা কি রসিক, কি সুকার্য্যই করিতেছি, তাহারা পরিহাস রঙ্গরস বৃদ্ধি করিলেন, মনে ভাবিলেন যুবতী না জানি আমাদের রসিকতায় কতই প্রীত হইতেছেন।

হরিপদ বিমর্ষভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মনে মনে ভাবিলেন "ঈশ্বরের ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয়, না জানি আমার ভবিষ্যত ভাগ্যে আরও কি আছে।"

হরিপদ কুসুমিকাকে লইয়া অন্য পথে গেলেন, বলিতে পারি না বালকেরা কি ভাবিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

হরিপদ একবার কুসুমিকার দিকে তাকাইলেন, চারিচক্ষু পরস্পরে মিলিত হইল, উভয়েরই নয়ন সলিলে পূর্ণ হইল, কিন্তু পাছে অপর কেহ তাঁহাদের ক্রন্দন দেখে এই আশঙ্কায় অনেক কষ্টে তাহা দমন করিলেন।

ভারতের বিবাহ।

আর্য্য সাস্ত্রমতে বিবাহ অষ্ট বিধ। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রজাপত্য, গন্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, ও পৈশাচ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিপ্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কালক্রমে আসুর বিবাহ নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে প্রচলিত হয়। কন্যার পিতাকে ধন দান করিয়া যে বিবাহ হয়, তাহাকেই আসুর বিবাহ বলে। কন্যার পিতাকে ধনদান করা বলা হইল কিন্তু বাস্তবিক তাহাকে দান বলা যাইতে পারা যায় না। কন্যার

পিতা আপন কন্যার বয়স ও সৌন্দর্য্য বিবেচনায় পন দাবী করিয়া থাকেন। বর অথবা বর কর্ত্তা তাহা প্রদান করিতে অসম্মত অথবা অসমর্থ হইলে বিবাহ হয় না। এ স্থলে দান শব্দের সমন্বয় কখন কি সাধিত হইতেপারে? কখনই না, ইহার নাম কন্যা বিক্রয়। প্রকৃত পক্ষে এবিবাহকে ধর্ম্মত বিবাহ বলিয়া গণনা করা নিতান্তই অসঙ্গত হইত, কেবল হিন্দুশাস্ত্রে আসুর বিবাহ বলিয়া একটী নাম আছে বলিয়া কন্যাবিক্রয়ী সমাজ আপনাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন। আমাদিগের শাস্ত্র ও অতি চমৎকার। ইহার যে বত্নাকর নাম প্রদান করাহয় তাহাও সার্থক। যে শাস্ত্র আসুর বিবাহের ব্যবস্থা আছে, সেই শাস্ত্রেই এরূপ দৃঢ় শাসন যে "যে দেশে শুক্র বিক্রীতহয় সে দেশ পতিত।"

আশ্চর্য্যসমন্বয়—পূর্ব্বে পূর্ব্বে সমাজের মান্য গণ্য প্রধান প্রধান লোকেরা কন্যাবিক্রয়কারীগণের সহিত করণ কারণ দূরে থাকুক, আহার ব্যবহার পর্য্যন্তও করিতেন না, দিন দিন শাস্ত্র বন্ধনের শিথিলতা নিবন্ধন সে রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যদিও পুত্র কন্যার আদান প্রদান নাই বটে, কিন্তু, একত্র পান ভোজনের বাধা থাকিতেছে না। যাহারা কন্যাবিক্রয় করে ইতর সম্বোধনে তাহাদিগকে ভদ্রলোকে "পেঁটেল "অথবা পাঁটি বেচা" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, আমরা এ ঘৃণার এবং ঘৃণাকারী দলের অনুমোদনকারী। কিন্তু দিনের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, সময়ের কি আশ্চর্য্য গতি, আধুনিক সমাজের কি চমৎকার বৈচিত্র। যাহারা কন্যা বিক্রয়কারীগণকে "পাঁঠী বেচা" বিশেষণে বিশেষিত করেন তাঁহারাই স্বয়ং এক্ষণে পুত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের বিবাহের এইরূপ বিচিত্রতা দর্শন করিয়া এক এক সমাজ, মুখে আক্ষেপ প্রকাশ করেন, সংশোধনের নিমিত্ত এক এক স্থলে বক্তৃতাও হইয়া থাকে, কিন্তু সে আক্ষেপ ও সে বক্তৃতার বিপরীত ফল দাঁড়ায়।

পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম, এখনও মধ্যে মধ্যে শুনি রাজপুত অঞ্চলে কন্যার বিবাহ বহু ব্যয়সাধ্য; তজ্জন্য অভাগিনী তনয়াগণের সূতিকাগারেই মৃত্যু হয়। স্বাভাবিক মৃত্যুনহে, জনকেরা বিবাহের ভয়ে বালিকাগণকে অতি শৈশবেই হত্যা করিয়া থাকেন। এপর্য্যন্ত এই বালিকাবধ নিবারণের

কোন উপায়ই হইয়া উঠে নাই, ইতিহাস ইহার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল মুন্সি প্যারিলাল নামক একজন স্বদেশ হিতৈষী সুশিক্ষিত সমাজিক ভদ্রলোক কন্যা-বিবাহের বহুব্যয় নিবারণের অভিপ্রায়ে একটি সভা স্থাপন এবং একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। সম সমকালে তদ্বিষয়ে কতকগুলি লোকের জ্বলন্ত আগ্রহ ও বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্যারিলালের প্রণীত কয়েক খণ্ড পুস্তক বঙ্গ দেশের বিখ্যাত সামাজিক লোকদিগের ভবনে, এবং সমাজের পত্র সম্পাদকদিগের নিকটে প্রেরিত হয়। সচরাচর যেরূপ হইয়াথাকে, তৎকালে এখানেও সেইরূপে সেইবিষয়ের বহুল আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার পর সমস্তই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। সেখানেও নির্ব্বাণ এখানেও নির্ব্বাণ।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, সভাও বক্তৃতার ররং বিপরীত ফল দাঁড়ায়। মুন্সি প্যারিলালের শুভউদ্যমে বাস্তবিক বিপরীত ফল দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগের এই হতভাগ্য বঙ্গদেশের উচ্চজাতি মধ্যে যে প্রথা কখনও ছিলনা, আজ কাল তাহার ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব। তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক ও শৌণ্ডিকজাতির মধ্যে বহুদিবস পূর্ব্বাবধি এই কুপ্রথা প্রচলিত আছে। অধুনা ব্রাহ্মণ, কায়স্থেরা পরম সমাদরে এই ঘৃণিত প্রথার অনুকরণ করিয়াছেন, শুদ্ধ অনুকরণ মাত্র নহে, মূলকল্পে ররং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থের গৃহে এখন একটি একটী কন্যা পাত্রস্থ করিতে, ন্যূনকল্পে দুইতিন সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। ইহার উপর যে কন্যার পিতা অপেক্ষাকৃত অধিক ধনি, তাঁহার স্কন্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক ভার নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ধনবানগণের পক্ষে ররং তাদৃশ কষ্টকর না হইতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং দরিদ্রগণের কন্যাদায় সংসারের সমস্ত দায় অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। ছোট কথায় সর্ব্বস্বনাশের হেতুভূত। একবার আমরা একখানি চিত্রপট দর্শন করিয়াছিলাম হালিসহরের একজন ভদ্রসন্তান তাহার প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, সে চিত্রপট চক্ষে না দেখিলে বর্ণাবলীদ্বারা চিত্রকরিয়া কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন। উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী কায়স্থ সামলা মাথায় দিয়া বক্ষে ঘড়িচেন ঝুলাইয়া, সহাস্যবদনে, দণ্ডায়মান, সম্মুখে বৃহৎ তুলামান যন্ত্র। সেই যন্ত্রের একদিকে একটি হৃষ্টপুষ্ট বালক গম্ভীর বদনে উপবিষ্ট ও

অপরদিকে স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণইষ্টক, সুবর্ণ লাঙ্গুল এবং হীরামুক্তা প্রভৃতি রাশি-কৃত, তথাপি বালকের দিকভারি, একপার্শ্বে একখানি ছিন্নবস্ত্র পরিহিত নিরীহ ভদ্রলোক একখানি কাগজ হস্তে করিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে দাঁড়াইয়া আছেন; চিত্রকরের সুকৌশলে তাহার দুটি চক্ষে অবিরল জলধারা।

যাঁহার মস্তকে সামলা তিনিবরকর্ত্তা, যে বালক তুলামানে উপবিষ্ট সেটি বর, আর যাঁহার পরিধান ছিন্নবস্ত্র, হস্তে এক খানি কাগজ, তিনি কন্যাকর্ত্তা।

পাঠক মহাশয় এস্থলে সত্যভামার ব্রতের কথা স্মরণ করুন। এখানে যেমন তুলামান সেই ব্রত ক্ষেত্রের সেই রূপ এক তুলামান, একদিকে শ্রীকৃষ্ণ অন্যদিকে মনিমানিক্য রজত কাঞ্চন ও স্তূপাকার পট্টবস্ত্রাদি, অবশ্যই শ্রীকৃ-ষ্ণের দিকভারি। দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণের পরিমিত রত্ন কাঞ্চন প্রাপ্ত হইলেন না, সুতরাং দক্ষিণার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই লইয়া চলিলেন। উপস্থিত রমণিকুল সকলেই শোকাকুল। অবশেষে রুক্মিণী দেবী সেইক্ষেত্রে উপনীত হইয়া একটী তুলসী পত্রে কৃষ্ণ নাম লিখিয়া তুলামানের যে দিকে রত্নরাজি, সেই দিকে অর্পণ করিলেন, কৃষ্ণের দিক লঘু হইয়া পড়িল।

এই ক্ষেত্রেও কি সেইরূপ হইবে। কন্যাকর্ত্তার হস্তে যে কাগজখানি দেখিয়াছেন সে খানি তাঁহার বাটির পাট্টা, স্বর্ণরত্নাদির দিকে সেই পাট্টাখানি প্রদান করিলে তুলসি পত্রে কৃষ্ণ নামের ন্যায় যদি বরেরসঙ্গে সমান হয়, তাহা হইলেও কন্যা কর্ত্তার সৌভাগ্য।।। কন্যাকর্ত্তা নিজে ফকির হইয়া নিরাশ্রয়ে পরিবারবর্গের সহিত অনাহারে প্রাণত্যাগ করুন তাহাতে বর কর্ত্তার কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই!।।

আজ কাল বঙ্গদেশের উচ্চজাতির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে এরূপ বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ফল যে কিরূপ বিষময়, সমাজের বিজ্ঞ লোকেরা তাহা অনুভব করিয়াও—কেবল অনুভব করিয়াও নয়—অহরহ প্রত্যক্ষ করি-য়াও তাহার নিবারণের যত্নবান হইতেছেন না। কিছুদিন হইল, অত্র মহা-নগরীর শোভা বাজার পল্লিতে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নাট্যমন্দিরে "কায়স্থ কুল সংরক্ষণী সভা" নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। সভার পাঁচ সাতটী অধিবেশনে অনেক ভদ্র বংশীয় কায়স্থ শুভাগমন করিয়া তদ্-

বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে সভার উদ্দেশ্য কন্যার বিবাহের ব্যয় লাঘব। সভাস্থলে সভ্য মহোদয়গণের অনেকেই সেই শুভ-উদ্দেশ্যে মৌখিক অনুমোদন করেন; কিন্তু কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে সকলেই একে একে সরিয়া দাঁড়ান। যাঁহার পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হয়, তিনিই কন্যা কর্ত্তার প্রায় সর্ব্বস্বই দাবী করেন, নির্জ্জীবসভা ইহার প্রতিবাদ করিয়া হেতু জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে এইমাত্র উত্তর প্রাপ্ত হয় যে, "আমি কি করিব গৃহিনীর মত হয় না।"

আমাদিগের হতভাগ্য সমাজের গৃহিণীগণের দোহাই দিয়া অনেক প্রবীন ভদ্র সন্তান অনেক গর্হিত কার্য্য করিতে তৎপর, এমন কি সেরূপ লোককে তাদৃশ কার্য্য করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। বস্তুতঃ কায়স্থ ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহে যেরূপ ভয়ানক পণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অনেক পরিবারকে এক কালে নিঃস্ব হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

স্থূল কথা কন্যা বিক্রয় যেমন পাপ, পুত্র বিক্রয়ও তদ্রূপ একটী সামাজিক পাপ। কন্যা বিক্রয়ে যদি দেশ পর্য্যন্ত পতিত হয়, তবে পুত্র বিক্রয়ে তাহা না হইবে কেন? কোন শাস্ত্রে ইহার বিরোধী বচন আছে, আমরা বিনয় সহকারে আমাদিগের অধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয়গণকে এবং সমাজস্থ সুশিক্ষিত সভ্য মহোদয়গণকে এতৎ বিষয়ের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডী।

"ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী"।

মনুষ্যের কিছুরদৃষ্ট, তাহারা সকল সময় রত্ন চিনিতে পারে না। এই দুরদৃষ্টবশতঃ তাহারা ঈশাকে ক্রুশদণ্ডে নিহত করিয়াছে, হোমরকে পথের ভিখারী দেখিয়াও দয়া করেনাই, মিলটনকেও প্রাণভয়ে অজ্ঞাতবাসে বাধ্য করিয়াছিল, রামমোহনকেও কচিৎ হত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, মুকুন্দরামকেও অত্যাচারে দেশত্যাগি করাইয়াছে এবং তদীয় গ্রন্থের

প্রতি অনাদর করিয়া আপনাদের অপদার্থত্বের পরিচয় দিয়াছে। এই অন্ধত্বনিবন্ধন মানুষ অনেক সময়ে পিত্তলে সুবর্ণের আদর এবং কাচে হীরকের মান্য আরোপ করিয়াছে। ইহারই কুহকে তাহারা এক সময়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উপর স্কটবায়রণের এবং মুকুন্দরামের উপর ভারতচন্দ্রের স্থান নির্দেশ করিয়াছিল। কিন্তু

কতকাল জলের তিলক থাকে ভালে,
কতকাল থাকে শীলা শূন্যেতে ফেলিলে ?

আজ লোক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের গুণগরিমা বুঝিয়াছে, ভারতচন্দ্রের মালিনত্ব মানুষের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অযোধ্যার সিংহাসনে আবার ত্রিলোক তারণ রামচন্দ্র বসিয়াছেন।

সকল বিষয়েরই বাড়াবাড়ি মন্দ। ভারতীয় আর্য্যগণ পারত্রিক জগতের অত্যাদরে ঐহিক সকল বিষয় নষ্ট করিয়া বসিয়াছেন, দেবচরিত্র চিত্রনের বশে মানবচরিত্র ন্যাসের অনাদর হইয়াছে। জীবনচরিতের স্থানে পুরাণ বসিয়াছে। তাই ব্যাসবাল্মিকি হইতে ক্ষেমানন্দ কেতকানন্দের জীবনীর এত অভাব। মুকুন্দরাম ও এনিয়মের বহির্ভূত নহেন, তবে অপরাপর কবি অপেক্ষা তাঁহার পরিজ্ঞাত জীবনী একটু বিস্তৃত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদপরগণার অন্তর্বর্ত্তী দামুন্যাগ্রামে মুকুন্দরাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই গ্রামে মুকুন্দরামের সাতপুরুষের বাস। সেলিমাবাদের গোপীনাথ নিয়োগী এই গ্রামের তালুকদার এই সময়ে বাদসাহ আকবরের সুবিখ্যাত সেনাপতি "বিষ্ণুপদে ভৃঙ্গ" মান সিংহ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা। কিন্তু সেলিমাবাদ প্রভৃতি প্রদেশের শাসনভার মামুদ সরিফ নামক জনৈক দুর্বৃত্ত ডিহিদারের হস্তে। ইহার দুর্ব্যবহারে প্রদেশীয় প্রজাবৃন্দের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা ছিল না। পাঠক দেখুন তাৎকালিক দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল:—

"বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল অরি।
কোণে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠার কুড়া,
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥

সরকার হইল কাল, খিল ভুমি লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াইআনা কম,
পাই লভ্য নয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার অবোধ খোজ, কড়িদিলে নাহি রোজ,
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
* * * * *
প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ।

প্রজা সাধারণের ত গেল এই অবস্থা, এদিকে—
"প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।" ঐ

ক্রমে অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল, কবির দেশে থাকা ভার হইল। তিনি, "চণ্ডীবাটী যার গাঁ। "সেই শ্রীমন্ত খাঁর পরামর্শে, প্রিয়ভ্রাতার সহিত সপরিবারে সাত পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার কষ্টের আর ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং পথের কষ্টের তালিকা তাঁহারই মুখে শ্রবণ করুন,—

"দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দভাই,
* * * * *
ভেটনায় উপনীত, রূপ রায় নিযবিত,
যদুকুণ্ডু তিনি কৈলা রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর,
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা॥
বাহিল গোড়াই নদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি,
তেউঠায় হইনু উপনিত।

দ্বারকেশ্বর তরি, পাইনু মাতুল পুরী,
গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত ॥
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর,
উপনীত গোখড়া নগরে।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে ॥
আশ্রয়ি পুকুর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেইধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥

* * * * *

গোখড়া ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই,
আঁড়ারায় গিয়া উপনীত ॥
আঁড়ারা ব্রাহ্মণ ভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিণু নৃপমণি,
রাজা দিলা দশ আড়া ধান ॥

রাজার নাম বাঁকুড়দেব। ইহাঁর আশ্রয়ে কবির দুঃখের অবসান হইল, রাজা তাঁহাকে স্বীয় পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। রঘুনাথ দেবের আশ্রয়ে তিনি কবিকঙ্কণ উপাধি গ্রহণ করিয়া "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যের রচনা আরম্ভ করেন। কখন যে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন তাহা বহু অনুসন্ধানেও জানা যায় নাই, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ অদ্যাপি দামুন্যার নিকট চৈনানগ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজা রঘুনাথদেবের বংশধরগণের অবস্থার অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাঁহাদের এখন সামান্যমাত্র জমীদারী আছে। ইহাঁদের বাসস্থান নিকটস্থ সেনাপতে গ্রামে নীত হইয়াছে। শুনাযায় এইখানে আজও কবির স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থখানি আছে (১)

(১) পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

মুকুন্দরামের রচিত কাব্যের নাম "চণ্ডীমঙ্গল"। কথিত আছে দেবীর আজ্ঞায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন ;

"ক্ষুধার পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥

* * * * *

দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণছায়া,
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত ॥"

তিনি আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন কিনা বলা যায় না, কারণ তদ্রচিত অন্য কোন গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায় না।

"চণ্ডীমঙ্গলকে" তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আদিতে দেব দেবী গণের বন্দনা এবং দেবীর ইতিবৃত্ত। শেষোক্ত বিষয় উপলক্ষে তিনি দাক্ষায়নীর তনুত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞভঙ্গ, পুনশ্চ হিমবন্নিকেতনে জন্ম, শিবপূজা, মদন ভস্ম, শিবের বিবাহ প্রভৃতি পুরাণ বিবৃত ঘটনা নিচয় প্রকৃত কবির তুলিকা সংযোগে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার স্থল বিশেষ এত মনোহর যে তাহা পাঠ করিতে করিতে প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণকে মনে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেবকবি কালিদাসের রতি বিলাপের একটি শ্লোক এবং মুকুন্দরামের রতি বিলাপের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিব ;

"অথ সা পুনরেব বিহ্বলা।
বসুধা লিঙ্গন ধূসর স্তনী।
বিললাপ বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা
সমদুঃখমিব কুর্ব্বতী স্থলীং ॥"

কুমার সম্ভবং—৪র্থ অধ্যায়।

"কামকান্তা কান্দে রতি, কোলেকরি মৃত পতি,
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায় কুন্তলভার, ত্যজে নানা অলঙ্কার,
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর ॥"

রতির খেদ।—চণ্ডীমঙ্গল।

দ্বিতীয় অংশে কালকেতু ও ফুল্লরার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। মহেন্দ্রতনয় নীলাম্বর বড়ই শিবানুরক্ত; কিন্তু দেবীর বাসনা হইল তাঁহাকে মানবরূপ গ্রহণ করিয়া সংসারে দেবী মহিমা ঘোষণা করিতে হইবে। একদিন দেবী পিপিলিকার রূপ ধরিয়া নীলাম্বরের শিবপূজার ফুলে প্রবেশ করিলেন এবং মহাদেবকে দংশন করিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, নীলাম্বর পাপবশে ব্যাধতনয় রূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার পত্নীও ফুল্লরা রূপে জন্মাইলেন। কালে ফুল্লরার সহিত কালকেতুর বিবাহ হইল। ব্যাধতনয় মৃগয়া করিয়া মাংস আহরণ করে ফুল্লরা মাংসের পসরা মাথায় করিয়া সহরের বাজারে এবং গৃহস্থের ঘরে তাহা বিক্রয় করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করে। কোনরূপে কষ্টে স্বষ্টে দিন চলিয়া যায়। এইরূপে কতদিন গেল, ক্রমে দেবীর অনুগ্রহের দিন সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিল।

একদিন দেবী, যুবতী ব্রাহ্মণকন্যার বেশে ব্যাধদম্পতির কুটীর দ্বারে উপবেশন করিলেন। তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে ব্যাধ বনিতার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে ভয়ে ভয়ে তাঁহার পরিচয় এবং বনাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবী সেইস্থানে বাসের মানস জ্ঞাপন করিলেন। ফুল্লরার হৃদয় ভয় এবং হিংসায় পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু তাহা দমিত করিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে লাগিল। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"। ফুল্লরা দেখিল উদ্দেশ্য বিফল হইল; তখন 'বারমাসের দুঃখ বর্ণনা আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছুতেই দেবীর মন নরম হইল না। এই বার ফুল্লরা কাঁদিতে কাঁদিতে "গোনাহাটে বীরপাশে দিল দরশন"। কালকেতু আসিয়া দেখিল কুটীরে "তিমির ফেটেছে যেন তপন তরাসে।" নিকটে আসিয়া তাঁহার প্রতি মধুর ভৎর্সনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলিল, কিন্তু উত্তর পাইল না; তখন "ভানুসাক্ষী করি বীর যুড়িলেন শর।" কিন্তু,—

"শর ছাড়িতে নাহি পারে মহাবীর,
পুলকে পূরিত তনু চক্ষে বহে নীর।"

দেবী বীরের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া বর দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। ব্যাধ দেবীর মহিষ মর্দ্দিনী রূপ দেখিয়া পুলকিত হইল। প্রভূত অর্থ লইয়া

কালকেতু নূতন নগর স্থাপন করিল, কিন্তু দুর্বৃত্ত ভাঁড়ুর কোপে পড়িয়া বলি রাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, পরে দেবীর অনুগ্রহে স্বীয় সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, কিছুকাল রাজ্য করণান্তর স্বর্গে স্বকীয় দেহ পুনঃপ্রাপ্ত হইল।

তৃতীয় ভাগে শ্রীমন্ত সওদাগর এবং তাঁহার পিতার ইতিবৃত্ত বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমন্তের বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন; আমরা তাহার জন্ম পর্য্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করিব, কারণ উহা অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত। ধনপতি নামে গন্ধবণিক এক দিবস রাজাকে আপনার পারাবত দেখাইতে ছিলেন; দৈবে একটী খুল্লনার নিকট পড়িল; তাহাকে আনিতে গিয়া সওদাগরের সহিত বালিকার আলাপ হইল। কালে উভয়ের প্রণয় জন্মিল। বিবাহের প্রস্তাব হইলে ধনপতিপত্নী লহনা বিষয়ে আপত্তি করিল; কিন্তু সওদাগর তাহাকে প্রভূত অলঙ্কারের লোভে শান্ত করিয়া, খুল্লনাকে বিবাহ করিলেন। অচিরে রাজার শুকের জন্য সুবর্ণপিঞ্জরের প্রয়োজন হইলে, ধনপতিকে তদানয়নার্থ গৌড়দেশে যাইতে হইল। প্রথমে দুই সপত্নীর বেশ মনের মিল ছিল; কিন্তু দুর্ব্বলা নামক দাসির পরামর্শে লহনা খুল্লনাকে কষ্টদিতে আরম্ভ করিল। একখানি পত্র জাল করিয়া বলিল "এই সওদাগর পত্র দিয়াছেন যে খুল্লনাকে ছাগ চরাইতে নিয়োগ করিবে।" অগত্যা খুল্লনাকে সেই কার্য্য করিতে হইল। এই কার্য্যে বালিকার যে কিরূপ যন্ত্রনা তাহা পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রেরই চক্ষে জল আসে। দেশে প্রত্যাগত হইয়া সওদাগর তাহা জানিতে পারিয়া লহনার বিশেষ লাঞ্ছনা করিয়া ছিলেন। খুল্লনা আবার সকল দুঃখ ভুলিল; কিছুদিন সুখেগেল। আবার সওদাগরকে সিংহলে বাণিজ্য উদ্দেশে যাইতে হইল; তখন খুল্লনা সসত্বা। দৈববশে সিংহলে বণিক কারারুদ্ধ হইল, এদিকে শ্রীমন্তের জন্ম হইল। তদনন্তর কি হইয়াছিল তাহা বঙ্গবাসী মাত্রই অবগত আছেন। বর্ণনার অতিবিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর আমরা মুকুন্দরামের কবিত্ব সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলিয়া, তাঁহার কাব্য পাঠের উপকারিতা এবং বঙ্গসাহিত্যের তাঁহার আধিপত্য সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিব। আধুনিক পাঠকমাত্রেই ইহার অসম্পূর্ণ ছন্দোবন্ধ এবং যতিপতন লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু এটি একমাত্র মুকুন্দরামের দোষ নহে;

তাঁহার সময়ের ছন্দের অবস্থাই এইরূপ। মিসনারি সাহেবগণ কর্তৃক প্রচারিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত তৎপূর্ব্বের কোন হস্তলিখিত রামায়ণের তুলনা করিয়া দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন প্রকাশকগণ কৃত্তিবাসের ছন্দোবন্ধের কত সংশোধন করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে চণ্ডিমঙ্গল পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত গ্রন্থছিল বলিয়া বটতলার প্রকাশক মহাত্মারা উহার পাঠের "সংশোধনের" চেষ্টা করিয়া দেব গড়িতে বানর গড়িয়া বসেন নাই। মুকুন্দরামের প্রধান দোষ তাঁহার প্রদর্শিত দেবী আরাধনার পদ্ধতি ও আবশ্যকতা। কেহ কেহ বলেন সেগুলি তাঁহার প্রদর্শিত নহে, তবে সেগুলি তাৎকালিক সমাজে প্রচলিত (১)। আমরা, এ মতের বিশেষ বিরোধী নহি। ইহার উৎপত্তি যেরূপেই হউক না, এতদ্দ্বারা কি অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে এবং ইহার কি দোষ তাহাই আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। এসংসারে অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি মহৎ কার্য্য পর্য্যন্ত মনুষ্যের পরিশ্রম, যত্ন এবং চেষ্টার দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। দেবতার অনুগ্রহ প্রয়োজন বটে, কেন না দৈব-প্রতিকূল হইলে কিছুই সংসাধিত হয় না। অতএব দেবতার অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস রাখা অত্যাবশ্যক একথা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু কেবলমাত্র দেবতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া রুদ্ধ হস্তে চিত্রপুতুলের ন্যায় বসিয়া থাকিলে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকার্য্য সাধিত হয় এরূপ আধুনিক জগতের বিশ্বাস নহে। যে কবি এইরূপ চিত্রকে মানবসমাজের অনুকরণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সে কবির মানব মহত্ত্বের জ্ঞান যে অতি অকিঞ্চিৎকর তাহা আধুনিক জগৎ একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এবং যে কাব্যে ইহাই সৌন্দর্য্যের উচ্চ আদর্শ (Ideal beauty) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা যে রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্য সকলের নিকট হীনপ্রভ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? আমাদের মতে চণ্ডীমঙ্গলে এই দোষ বাহুল্যরূপে সংমিশ্রিত হইয়াছে। তাঁহার গঠিত চরিত্র নিচয়ে আত্মনির্ভররূপ মহাধর্ম্ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কালকেতুর ধনার্জ্জন দেবীর দয়ায় হউক তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই,

(১) Vide Literature of Bengal. By R. C Dutt. Ch. XII.

কিন্তু এক ঘড়া ধন বাঁকে আনার সুবিধা হয়না বলিয়া তাহা দেবীকে "কাঁকে" করিয়া কুঠীরে পৌছিয়া দিতে হইল, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। তৎপরে বনকাটান হইল দেবীর অনুগ্রহে, কিন্তু নগর স্থাপনের বেলায় ব্যাধ হতবুদ্ধি হইল, এত ধন সত্ত্বেও সে আপনি একার্য্য সাধন করিতে পারিল না; মাথায় হাত দিয়া, মা, মা, করিয়া বালকের মত কাঁদিতে বসিল, শেষে দেবীর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা, হনুমান সহ "বেরুনীয়ার" বেশে আসিয়া সেই কার্য্য সাধন করিল, কালকেতু আপনি কোন "বেরুনীয়া"কে" ডাকিতে পারিল না। এইরূপ সকল সামান্য কাজেই এই আত্মনির্ভরতার বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হয়। মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বঙ্গীয় কবির গ্রন্থেই পরমুখপ্রেক্ষিতার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী সকল কবির গ্রন্থেই এই দোষ অল্প বা অধিক পরিমাণে সংমিশ্রিত হইয়াছে। এই গুরুতর দোষ সত্ত্বেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যাহা আছে, তাহা অপর কোন কাব্যেই নাই। কবিকঙ্কণের প্রধান গুণ তাঁহার মৌলিকতা, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, প্রধান দোষের মধ্যেও মৌলিকতা আছে। এক্ষণে আমরা তাঁহার অপর দিকে মৌলিকতা আছে দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ তাঁহার আখ্যায়িকা কল্পনা। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় যে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকখানি গানময়, অপর কয়েকখানি জীবন চরিতময়, এবং অপর একখানি আখ্যায়িকাময়, কিন্তু সে আখ্যায়িকা কবির সকপোল কল্পিত নহে, বাল্মিকির কল্পনার অনুচিত্রন মাত্র। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল সেরূপ গ্রন্থ নহে, তাঁহার গ্রন্থের আখ্যায়িকা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পুরাণ অথবা কাব্যে দেখা যায় না। বস্তুতঃ সেগুলি তাঁহার স্বরচিত; অন্ততঃ কালকেতুর উপাখ্যান তাঁহার কল্পনা সম্ভূত, শ্রীমন্তের উপাখ্যান জনশ্রুত হইলেও হইতে পারে।

ক্রমশঃ

———

ষড় দোষ।

ষড় দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধমালস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

পৃথিবীতে উন্নতি প্রয়াসী লোক যত্ন পূর্ব্বক নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয়টী দোষ পরিহার করিবেন, মহাভারতকার এই মহান্ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই ছয়টী দোষের প্রত্যেকটিই মনুষ্যের শত্রু; ইহাদের অন্যতমের বশীভূত হইলেই লোকের সর্ব্বনাশ, সকলগুলির সমবায় হইলে ত কথাই নাই। অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, এই সময়ে ইংরেজ, মার্কিন, জর্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি মাননীয় জাতিগণের জাতীয় চরিত্রে এই ছয়টী দোষ নাই, তাই অদ্য ইংরেজের এত প্রতাপ, —তাই মার্কিন এক্ষণে পৃথিবীর সমুদায় জাতি অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। তাই সে দিন মার্কিন জননী ইংলণ্ড কন্যার প্রতাপের নিকট তিষ্ঠিতে না পারিয়া, নিতান্ত নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়াও তাহাকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। যে দিন মার্কিনগণ দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করিয়াছেন—যে দিন আলস্য তাঁহাদের নিকট অলীক প্রলাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে—যে দিন ভয়, নিদ্রা, তন্দ্রা তাঁহাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছে—সেই দিনই ইংলণ্ড তথাকার সাম্রাজ্য হারাইয়াছেন। ষ্ট্যাম্প আইন প্রচারের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, মার্কিনগণের যুদ্ধ পিপাসা—প্রতিহিংসা আশা ততই উদ্রিক্ত হইতে লাগিল—ততই দৈনন্দিন এখানে সেখানে সর্ব্বত্রই সভা-সমিতি হইয়া সেই আইনের প্রতিবাদ হইতে লাগিল—ততই জাতীয় চরিত্র—জাতীয় জীবন উন্মেষিত ও প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল—ততই মার্কিনগণ ভয়, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতার পরিবর্ত্তে নির্ভিকতা, পরিশ্রম সহিষ্ণুতা ও কার্য্য তৎপরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যখন জাতীয় জীবন এইরূপ গুণাক্রান্ত, সেই সময়ে—সেই উদীয়মান জাতীয় জীবনের উপযুক্ত পরিচালক জর্জ্জ ওয়াসিংটন অটল হিমাদ্রিবৎ মার্কিন দেশে দণ্ডায়মান।

যৎকালে ইংরাজ ভ্রূকুটি প্রদর্শনে মার্কিনগণকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল—যখন পার্লিয়ামেণ্ট মহা সভায় মার্কিনগণের বাচালতা দমন করিবার জন্য সৈন্য যাইতে আদিষ্ট হইল—যখন সমুদায় জগৎ ধাধাঁইয়া দিয়া বীর ইংরাজ সৈন্য জলনিধির উপর দিয়া পত পত শব্দে পক্ষ উড্ডীন করিয়া মার্কিনগণকে মস্তস্ত কবিতে চলিল—তখন একমাত্র বীর ওয়াসিংটনই কেবল তাহা অবজ্ঞা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় চরিত্রের এই সকল উদীযমান সজীব ভাব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সন্দর্শন করিয়া ইংরাজ প্রতাপের নিকটও সদর্পে স্থির থাকিতে পারিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনের এই নবীন ভাব সন্দর্শন করিয়াই বীর ওয়াসিংটন সম্মুখ সমরে পরাজিত এবং লগ্নপদে—লগ্ন দেহে তুষার মণ্ডিত অদ্রিমালার শিখরে শিখরে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াও তিলার্দ্ধ সময়ের জন্যও হতাশ্বাস হন নাই।

ইটালী-ভূমিও এই কয়টি দোষ পরিহার করিয়াই এক্ষণে তাহার সুধাময় ফল উপভোগ করিতেছেন। ম্যাটসিনি উপযুক্ত সময়েই বুঝিয়াছিলেন যে ইটালীয়গণ আর বিলাসের নিতান্ত দাস নহেন; অষ্ট্রিয় রাজের দুই একটী অকার্য্যের দোষারোপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন; ভয়, আলস্য প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাই তাহাদিগকে কর্ম্মঠ করিবার জন্য তাঁহার আয়াস। ইটালীয়গণ তৎ পূর্ব্বেই অষ্ট্রিয় রাজের কঠিন শাসনে নিপীড়িত হইয়া অন্তরে অন্তরে প্রধূমিত হইলেও তাহা কেহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই—কেহই পুরুষ পরম্পরাগত আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা ও ভয় পরিত্যাগ করিতে পারিতে ছিল না; তাই ম্যাটসিনীকে ইটালী উজ্জীবিত করিবার জন্য তত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল—তাই তাহাকে সময়ে সময়ে দেশ হইতে পলায়ন, কখন বা ঘোরান্ধকার কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সেই কারা যন্ত্রণার ফল ইটালীর অভ্যুত্থান ও অষ্ট্রীয় রাজের অধঃপতন।

ইটালী পুরাকালে এই আলস্য জন্যই অধঃপাতে গিয়াছিলেন; অতি প্রাচীনকালে যেখানে রোমের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হয় নাই, এমন কোন জানিত জনপদ ছিল না। তদানীন্তন পরিজ্ঞাত পৃথ্বী তাঁহার করতলন্যস্ত ছিল, রোমীয় প্রতাপের নিকট অন্য কেহই তিষ্টিতে পারে নাই; কিন্তু সাধারণতন্ত্রীগণের পরিশ্রম কাতরতার সময় হইতেই এই বিপুল

রোম সম্রাজ্যের পতন বীজ রোপিত হইল; পূর্ব্বে রোমের কন্সল ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ অতিশয় পরিশ্রম সহিষ্ণুছিলেন; কোন প্রকার পরিশ্রমই তাহাদের অমল গৌরবের হানিকর বলিয়া বিবেচিত হইত না; একজন কন্সল (Consul) আপন পদ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দিত চিত্তে পুনরায় আপনার গ্রাম্য কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সহস্তে হল চালনা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা অপমানিত হইতেন না: কিন্তু তাঁহারাই আবার যখন দাস ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, যখন সকল প্রকার পরিশ্রমেই ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখনই ইহার পতন আরম্ভ হইল; যে মুহূর্ত্ত হইতে রোমে দাস প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই বিপুল সম্রাজ্যের অধঃপতনের বীজ রোপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য অধঃপতনের ইহাই প্রধান কারণ। প্রাথমিক মুসলমান নরপতিগণ অমিত পরাক্রমশালী অতিশয় পরিশ্রম সহিষ্ণু ছিলেন, তাই সমুদায় ভারতবর্ষ তাঁহারা করায়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন; যে দিন তাঁহারা পরিশ্রমকে অপমানকর বোধ করিলেন, যে দিন তাঁহারা রাজ প্রাসাদের ভিত্তির ভিতর বিদূষক পরিবৃত হইয়া পাশব সুখের নিমিত্ত সমুদ্যত হইলেন, যে দিন বিলাস বিষ তাঁহাদের অন্তরে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইল, সেই দিনই মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনারম্ভ। সম্রাট কুলতিলক আকবর সাহ প্রায় প্রতিদিনই ২০ বিংশতি ক্রোশ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেন, আবশ্যক হইলে পঞ্চাশৎ ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিতেন, তাই তাঁহার সময়ে রাজ্যের এত উন্নতি। তাঁহার পর হইতেই অল্পে অল্পে আলস্য দীর্ঘসূত্রতা ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা, তন্দ্রা, স্থান পাইতে লাগিল, তাই মুসলমান সাম্রাজ্যের অধঃপতন অনিবার্য্য হইল।

বঙ্গবাসী এই উনবিংশ শতাব্দীর অন্তভাগে উন্নতি প্রয়াসী; তাহার মুখের নিকট অপর কেহই তিষ্টিতে পারেন না; বঙ্গবাসী এই সামান্য দিনের মধ্যেই উন্নতির উচ্চতোরণে উত্থিত হইয়াছেন বলিয়া আপনা দিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন; কিন্তু প্রকৃত উন্নতির নিষেধক নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, ভয়, আলস্য, ও দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করিতে কখন পারিবেন কি? দুঃখের বিষয় যে ছয়টি দোষ সকল অনর্থেরই মূল, বঙ্গবাসী

তাহার একটিতে নহে, সকল গুলিতেই নিমর্জ্জিত। নিদ্রা, তন্দ্রা, কিছুতেই তাহার তুলনা নাই, যাহাদের জাতীর চরিত্রে এই সমুদায় দোষ গুলিই বর্ত্তমান, তাহাদের আর উন্নতির আশা কোথায়? এক জন ইংরাজের সহিত একজন বাঙ্গালীর তুলনা করিতে গেলে কি দেখা যায়; দেখা যায় ইহার সহিত উহার কিছুতেই তুলনা হয় না; যেন দুইটি স্বতন্ত্র জীব—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত; বাঙ্গালীর ধনী হইতে দরিদ্র, পণ্ডিত হইতে মূর্খ সকলেই প্রায় সমান উপাদানেই সৃষ্ট, তবে আর উন্নতির আশা কি? বঙ্গবাসী যে দিন উপরোক্ত দোষগুলি পরিহার করিতে সমর্থ হইবেন, সেই দিনই তাঁহাদের জাতীয় জীবন সংগঠিত হইবে, সেই দিনই তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইবে—না হইলে সুধু গলাবাজীতে কখন কিছু হয় নাই, কখন কিছু হইবে না।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ।

ঘনশ্যাম শর্ম্মা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমি। শরৎ মহাশয় লেখা পড়া জানিতেন কেমন?

ঘন। আমরা ভাবিতাম তাঁহার তুল্য বিদ্বান্ নাই; কিন্তু লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম বালককালে তাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধি অত্যন্ত স্থূলকায় ছিল। কারণ তিনি বালককালে অত্যন্ত পক্ষীশাবক ভাল বাসিতেন এবং ঐ অনুসন্ধানেই তিনি সমস্ত দিন বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেন। আমাদিগের গ্রামের সন্নিকটস্থ ভাগীরথীর পাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে বিস্তর শালিখ পাখী জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে কুলায় নির্ম্মান করিত। শরত মহাশয় একদিন তথাকার একটী গুহায় ২। ৩ টী বাচ্চা হইয়াছে এবং সেগুলির কাঁটা পালখ উঠিয়াছে দেখিয়া আসিয়া বেজা হাম্বার নিকট গল্প করেন এবং তাঁহাকে ভাগ দিবেন অঙ্গীকার করিয়া পাখীগুলি উড়ো খুড়ো হইলে উভয়ে মৈ ঘাড়ে ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হন।

আমি। কি বেজা হাম্বা ?

ঘন। হাঁ বাবা, তাঁহার গলার স্বর ষাঁড়ের ন্যায় কর্কশ থাকায় ঐ নাম হয়। তখন লোকে, লোকের গুণাগুণ ও আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া এক একটা খারাপ নাম দিত। যথা,—টেঁযে গোপাল, গুপী চটে, ইত্যাদি।

আমি। তারপর আপ্নি শরত মহাশয়ের কথা বলুন ?

ঘন। শুনেযাও,—ওদিকে একটী বৃহদাকার গোখুরা সাপ পক্ষি শাবকগুলিকে গ্রাস করিয়া তাহাদের কুলায়ে কুণ্ডলি পাকাইয়া শয়ন করিয়া ভোজন সুখ অনুভব করিতেছিল। বেজাহাম্বা মৈ ধরিল, শরত মহাশয় পক্ষী পাড়িতে উঠিলেন, এবং গহ্বরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখা শোনা নাই, হস্ত প্রবেশ করাইয়া সর্প মুখটী সজোরে ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিলেন "বেজা শালার পাখীরও জোর কম নয় রে।" বেজা কহিল "ঠেসে টান্ মার্ মোর ভাই।" শরৎ তৎশ্রবণে খানিক টানিয়া বাহির করিয়া কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কহিল "বেজা। বেজা। সর্ব্বনাশ। একটা প্রকাণ্ড সাপ ধরেছি রে।" বেজা তৎশ্রবণে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল এবং কহিল "খপদ্দার ছেড়োনারে ভাই, তুমি যেরূপ ওর মুখ চেপে ধরেছ সাপের বাপের সাধ্য নাই যে তোমাকে ছোপলাবে। কিন্তু ছেড়ে দিলেই মুস্কিল। যদি ছাড়ত বল আমি মৈ ফেলে পলাই।" শরৎ কহিল "তুমি কর্‌তে বল কি ?" বেজা কহিল "তুমি ওটাকে টেনে বাহির করে বাম হস্তে মৈ ধরিয়া আস্তে আস্তে নেবে এসে জলে চুবিয়ে ধর।" শরতমেড়া তৎশ্রবণে সযোরে টানিতে লাগিল এবং বেজা নিচে হইতে "টান টান" শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল। এই প্রকারে সলাঙ্গুল সর্পটীকে টানিয়া বাহির করিলে সাপ আপন অঙ্গটীর দ্বারা শরৎমেড়ার হস্ত জড়াইতে লাগিল। শরৎ তদ্দৃষ্টে কহিল "বেজা, শালার সাপের মজা দেখ !" বেজা কহিল "তোমাকে বাঙ্গাল মাগীদিগের চুড়ি পরার ন্যায় মন্দ দেখাচ্চে না, কিন্তু ভয় পেওনা মোর দাদা।" শরত আস্তে আস্তে নামিয়া আসিলে বেজা তাকাইয়া তাকাইয়া কহিল "শরতা, বেটার সাপ পিট পিট করে তাকাচ্চে দেখ ! ওরে শরত, গোখ্‌রো রে ! তুই ওটাকে জলে চুবিয়ে ধর, আমি দৌড়ে গিয়ে ছুরি আনি। কারণ ওটা মলে পরে কেটে কেটে তোর হাত থেকে খুল্‌তে হবে।" শরৎ তৎশ্রবণে সহস্তে সর্পটীকে

জলে ডুবাইল এবং বেজা গিয়া ছুরি আনিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেও শরতের সর্পের মস্তক হাত হইতে ছাড়িতে সাহস হইল না, সে কহিল "বেজা সমস্ত রাত্রি আমি এটাকে জলে ডুবিয়ে বসে থাকি।"

বেজা। তোর ক্ষিদে পাই নি?

শরৎ। ওরে এতে কি আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে, এখন যাই তখন যাই ভাবচি। "ভয় নেই খুলে ফেল। ওটা মরে ফেপে উঠেছে এবং আকার শ্বেত-বর্ণ হয়েছে দেখচিস্ নে।" বলিয়া বেজা শরতের হস্ত হইতে সর্প বন্ধন মুক্ত করিয়া দিতে লাগিল। এখন দেখ বাবা, আমাদের সময়ের মহাশয়দিগের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় কতদুর ছিল? এখন ভাবি—হায়রে। ক্যাম্বেলি পাঠশালা তখন তোর সৃষ্টি হইলে লেখা পড়াটা যত শিখি বা না শিখি বাবুগিরিটে ভাল করিয়া শিখিয়া লইতাম। আহা! এই ছেলেদের মা আবার রোগ হলে কপালে পয়সা ঠেকিয়ে বাবাঠাকুরের নামে তুলে রাখ্‌তেন। যেখানে রক্ষাকালী পূজা হইলে কোলে করিয়া লাইয়া গিয়া কোল থেকে নামাইয়া গলদেশ অঞ্চল দ্বারায় পবিবেষ্টন করিয়া টিপ টিপিয়ে প্রণাম করে বলতেন "মাগো। আমার ঘনশ্যামকে মূর্খ সুর্খ করে বাঁচিয়ে রাখ।" মার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে, বেঁচে থাকলে দেখ্‌তে পেতেন—তাঁহার আকাট মূর্খ ঘনশ্যাম আজ ঘরে বসিয়া ঘন ঘন গাঁজা খাচ্চেন" কি আশ্চর্য্য। ঠাকুর দেবতার নিকট ভালটী প্রার্থনা কর, ঘটিবে না, কিন্তু মন্দটীর ফল যেন হাতে হাতে ফলে যায়। আরো আশ্চর্য্য দেখ গ্রামের শ্রীস্বরূপ রাম বাবু, উমা/ নারায়ণ বাবু, মোহন বাবু সামান্য সামান্য জ্বরে ফুক ফুকিয়ে মরে গেল, আর এ আথদ্দে যমের অরুচি ঘনশ্যাম শর্ম্মা সুস্থ শরীরে বসিয়া ঘন ঘন গাঁজা ফুক্‌ছেন। বাবা! এই জগতের বিচিত্র গতি বোঝা ভার!!

খুড়া মহাশয় আবার তামাক সাজিয়া "ঠক্ ঠক্ ঠক্ ফুস্ফুত ফুত শব্দে চকমকী ঠুকিতে লাগিলেন। তাহার ধূম পান শেষ হইলে আমি কহিলাম "খুড়ামহাশয়ের বুঝি পাঠশালার বিদ্যা পর্য্যন্তই শেষ?

শ্রীভূঃ—

ক্রমশঃ

সংসার।

—:•:—

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ ॥

সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ইহাই সংসার চক্রের মূল-মন্ত্র। কোথাও কোন প্রকারে এ নিয়মের ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয় না, প্রতিনিয়ত অবিরাম সুখস্রোতে গা ঢালিয়া আছে, এমন দেববৎ লোক কি এজগতে সুলভ? না চিরকাল একই প্রকার দুঃখের আবর্ত্তে বিঘুর্ণিত হইতেছে এমন হতভাগ্য জীব প্রাপ্ত হওয়া যায়? সংসার চক্রের গতির কখনই বিরাম নাই; সুতরাং কোন লোকেই একইভাবে সুখে কিম্বা দুঃখে, বাল্যকাল হইতে অন্তিম শয্যায় শয়নের সময় পর্য্যন্ত থাকিতে পাবে না; সকলকেই ইহার এই বিশাল আবর্ত্তনে পড়িয়া ঘুরিতেই হইবে; ঘুরিতে ঘুরিতে যাহার যেরূপ অবস্থা হয় তাহাতেই কেহ সুখী ও কেহ দুঃখী। তাই বলি সংসারের দুইটি দিক; একটি সুখ ও অপরটি দুঃখ—একটি হর্ষ ও অন্যটি বিষাদ,—একটি সূর্য্যকরদীপ্ত সুদিন, অন্যটি মেঘাবৃত অন্ধকারময়ী দুর্দ্দিন, একটি পৌর্ণমাসীর মনস্তুষ্টিকর রজতবিভা, অপরটি অমাবস্যার গাঢ় কালিমাময়ী তামসিনিশা। যে কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করনা সকলেরই এই একই নিয়ম; সর্ব্বশক্তি মান জগদীশ্বরের অতুলনীয় সৃষ্টি প্রকৃতিদেবীও ইহার হস্ত হইতে পরিত্রান পান নাই; কিম্বা জগৎস্রষ্টা ইহাকে এমন ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন; ফলতঃ এই জগতের মধ্যে কোন কিছুই নিরবচ্ছিন্ন সুখময় বা চিরদুঃখপুর্ণ নাই—সকলই এই দুঃখে, সুখে পূর্ণ। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, কখন ইহার প্রসন্নভাব অবলোকন করিয়া পুলকিত হইবে, আবার কখন না বিষাদ-ময়ী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে। অদ্য প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ সকলকে ত্রাহি ত্রাহি ডাকাইতেছে—সকলে শীতল সমীরণ সেবনার্থ দুরন্ত তপনের অস্তগমন প্রার্থনা করিতেছে,—কল্য সেই তপনই সকলের প্রার্থণীয় পদার্থ—সূর্য্য আর সে ভাবে কিরণ বিস্তার করিতেছে না বলিয়া লোকে কতই কথা

বলিতেছে—শীতল সমীরণ পরিহার করিবার নিমিত্ত সকলেই ব্যতিব্যস্ত, অদ্য মৃদুল মলয় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া সকলকে সুস্নিগ্ধ করিতেছে, বৃক্ষ-বনস্পতি সকল নব নব পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইতেছে, কল্য পবনের প্রবল ঝঞ্ঝাশব্দ সকলের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে—বৃক্ষরাজি পত্রচ্যুত হইয়া বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে। পৃথিবীতে যাহাই দেখি, তাহাই এইরূপ বিভিন্ন ভাবদ্যোতক, এক সময়ে যাহা সুখের—যাহা মনস্তৃপ্তির কারণ, পরক্ষণেই তাহা দুঃখের—তাহা বিষাদের কারণীভূত; সুতরাং এই বিপুল সংসার কেন এই সার্ব্বজনীন নিয়মের বহির্ভূত হইবে? তাই সংসারেরও দুইটি চিত্র—একটী ভাল—অপরটি মন্দ, পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্রাদি লইয়া সংসারের এক মূর্ত্তি—আবার এই সকলের অন্তর হইলে তাহার আর প্রকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যাহা এক সময়ে সুখের—তাহাই পরক্ষণে ভয়ঙ্কর বিষাদের নিলয়। এক সময়ে যে গৃহ দেখিবার নিমিত্ত—যাহা প্রবেশের নিমিত্ত, হৃদয় উদ্বেলিত হইত, এক্ষণে তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই হৃদয়ের কতকটা পরিতৃপ্তি, এক সময়ে যেখানে পিতার সম্বোধন—মাতার স্নেহমাখা আবাহন—ভ্রাতার আলাপন—পুত্র কন্যার পিযূষ পূরিত আধ আধ উচ্চারণ—বনিতার ধীর—গভীর প্রেম সম্ভাষণ স্থান পাইয়াছে—সে স্থানে এখন কেবল বিকট শব্দ শ্রবণ জন্য আর কে ইচ্ছায় বাস করিতে চায়? যাহা বাল্যকালের সুখের ভবন—কৌমারের প্রিয় নিকেতন—তাহা যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই কেন গহন বলিয়া জ্ঞান হয়, শৈশবকাল হইতে যে গৃহে চিরবাস করিবার জন্য হৃদয় সতত প্রার্থনা করিত—যাহা অপেক্ষা সুখের সামগ্রী পৃথিবীর মধ্যে আর কিছুই ছিল না, সেই গৃহ এক্ষণে কেন অন্ধকূপবৎ যাতনাপূর্ণ কারাগার স্বরূপ, সেই স্থান—সেই মন; সেই গৃহ—সেই দেহ, তবে এমন কেন? তাই বলি সংসারের দুইটী চিত্র, একটী হর্ষ ও একটী বিষাদ।

নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথায় আছে? ধনীর কারুকার্য্য খচিত—গগন স্পর্শী সুদৃশ্য অট্টালিকায় বা দরিদ্রের পত্রাচ্ছাদিত পর্ণ কুটীরে? পণ্ডিতের নানাদিক প্রসারী আয়ত মস্তিষ্কে, না মূর্খাদপি মূর্খের অতি সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে? দুঃখ কোথা নাই, যেখানে সুখের গতিবিধি—সেই সকল স্থান দুঃখেরও অভিগম্য। তবে

কিছু ইতর বিশেষ আছে; কাহারও ভাগ্যে সুখের ভাগ অধিক, কাহারও বা দুঃখের মাত্রা বেশী, আবার কাহারও বা সুখ দুঃখের অংশ সমান। পৃথিবীতে যাহাদের সুখের ভাগ অধিক, তাহারাই দেববৎ—আর যাহাদের ভাগ্যে দুঃখেরই আতিশয্য তাহারা নরাধম, এবং যাহাদের পরিমানের তারতম্য নাই তাহারাই সাধারণ নর। তবে সকলের ভাগ্যে সুখের আতিশয্য ঘটিয়া উঠে না; হয় দুঃখের সহিত সমান—না হয় তাহা হইতে অল্প, এইরূপই ঘটিয়া থাকে; যাহাদের ভাগ্যে সুখের পরিমান অত্যল্প তাহারাই আমার মত হতভাগ্য জীব, সুখ শরীরে নহে,—মনে; বসন—ভূষণ বা দাস-দাসী, সুরম্য হর্ম্ম্য বা স্তূপীকৃত অর্থ এ সকল সুখের উপাদান নহে—তবে সময় বিশেষে এ সকলও সুখের সামগ্রী হইতে পারে বটে। সুখ বিষয় বৈভবে নহে—সুখ হৃদয়ের পরিতৃপ্তিতে; যেখানে আত্মার পরিতৃপ্তি—তাহা গহন কানন হইলেও—পূণ্য কেতন; তাহা অরণ্যানি বেষ্টিত—হিংস্র শ্বাপদ সমাকুল পর্ব্বত কন্দর হইলেও সুখাগার, তাহা বালুকাপূর্ণ বিশাল মরুভূমি হইলেও—সুখ-পূর্ণ স্বর্ণভূমি। তাহা ধনীর সুরম্য হর্ম্ম্য চায় না—দুরন্ত প্রান্তরের মধ্যস্থিত বৃক্ষতলা হইলেও হয়, তাহা দাস-দাসী, চর-অনুচর, ধন-গৌরব চায় না—তাহা পিতা-মাতা, ভ্রাতা-দারা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, লইতেই ইচ্ছা করে। যাহার এ সকল নাই, তাহার হৃদয়ের পরিতৃপ্তি কোথায়? সুতরাং তাহার সুখ আকাশ কুসুম—তাহার সুখের আশা, শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মান। তবে যে সকলের পক্ষেই আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতেই হৃদয়ের পরিতৃপ্তি, এমন কথা বলিতে পারি না, আত্মার পরিতৃপ্তি নানা প্রকারে হইতে পারে।

সুখও দ্বিবিধ, অধিক স্থায়ী ও ক্ষণ স্থায়ী; আত্মার ক্ষণিক পরিতৃপ্তি—ক্ষণিক কার্য্যে হইতে পারে, কিন্তু তাহা সুখ হইলেও—সুখের যথার্থ স্বরূপ নহে; যাহা অনেক দিন স্থায়ী তাহাই প্রকৃত সুখ। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-বন্ধু লইয়া সচ্ছল ভাবে বাস করার ন্যায় সুখ, আমার বিবেচনায় অতি অল্পই আছে, হৃদয় পরিতৃপ্তির যদি কোন বিশেষ উপাদান নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই এইরূপ সুখপূর্ণ গৃহের উল্লেখ করিব; ইহাতে যে সুখ, তাহা আর কোথাও নাই, তবে পূর্ণ গৃহ যে একরূপ পদার্থ,

তাহা সহজ চক্ষে দেখা যায় না—শিশুকাল হইতে সেই সুখ ভোগে অভ্যস্ত হইয়া তাহার আর সে মধুরিমা সহজে অনুভূত হয় না—তাই অনেকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। অবস্থা শৈশব হইতে বরাবর সমান চলিলে তাহার আর বিচার করা যায় না—তাহার আর তারতম্য লক্ষ্য হয় না; তাই ইহার পর সময়ের সহিত তুলনা করা চাই; যখন সংসারের চারিদিক চাহিয়া চিন্তিয়া আর আপনার কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না—তখনকার সহিত আর সেই বাল্যকালের তুলনা করিলে বুঝা যায়; যখন পিতা, মাতার স্নেহে—ভ্রাতার যত্নে—ভগ্নীর আদরে পরিবর্দ্ধিত হওয়া যায় সেই একদিন—আর যখন গৃহমধ্যে পড়িয়া যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে সেই মধুমাখা শব্দগুলি পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিলেও কেহ উত্তর দেয় না, সেই একদিন, যখন সামান্য মাত্র বেদনা হইলে সকলে কাছে বসিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন সেই একদিন, আর যখন গভীর যাতনার তাড়নে মর্ম্মন্তুদ বেদনায় অস্থির হইলেও আহা বলিবার কেহ থাকে না সেই একদিন; যখন বহুদিন প্রবাসে থাকিয়া সুখের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নানা প্রকার সম্ভাষণে হৃদয় সুশীতল হয় সেই একদিন—আর যখন সেই গৃহ, শব্দ বিহীন বিজন অরণ্য বলিয়া বোধ হয় সেই একদিন। সংসারের এরূপ মূর্ত্তি কেন? এত পরিবর্ত্তন কেন? সকল দ্রব্যেরই পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন কি আর কোথাও হয়? তাই বলি সংসারের দুইটি দিক, একটী ভাল—একটী মন্দ; একটী হর্ষ—একটী বিষাদ; একটী প্রফুল্লতার প্রতিমূর্ত্তি—অপরটি চির বিষাদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, মহৎ-ক্ষুদ্র কেহই এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন বটে, কিন্তু সকলেরই কি সমান? সকলেরই ভাগ্য কি এই হতভাগ্যের ন্যায় বিষাদময়ী; জানি না এই হতভাগ্যের আর দ্বিতীয় আছে কি না? যদি থাকে তাহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। যে জন্ম সময় হইতে পিতার স্নেহ—মাতার যত্ন—ভ্রাতার আদরে পরিবর্দ্ধিত—যে দিনেকের তরেও কোন বিষয়ে কোন কষ্ট পায় নাই—যে জন্মাবধি সুখের অঙ্কে প্রতিপোষিত—যে সকলেরই স্নেহ—যত্ন—আদরের পাত্র, তাহার আজি এ সংসারে কেহ নাই; অহো বিধাত! কোন ভীষণ পাপের এ ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত!! তাই বাল্যকালের—কৌমারের সেই সুখ-

ময় সময়ের সহিত, আর যৌবনের এই বিভীষিকাময় সময়েব তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তুলনা কোথায়? স্বর্গে ও নরকে কি কখন তুলনা সম্ভবে? না এতদুভয়ের তুলনার কথা পর্য্যন্ত মনে আনিতে পারা যায়? শারদীয় শুক্ল যামিনীর সহিত—প্রাবৃটের ঘোরান্ধকারময়ী তামসী নিশার যে প্রভেদ, লোক পরিপূর্ণ কোলাহলময় হাটের সহিত—জন শূন্য, শব্দ শূন্য মরুস্থলের যে প্রভেদ, সরোবর মধ্যস্থিত পরিশীলিত নলিনীর সহিত—বৃন্তচ্যুত, শুষ্ক, পরিম্লান পুষ্পের যে প্রভেদ, ইহা সে প্রভেদ নহে; ইহার পার্থক্য ইহা হইতেও অধিক। স্বর্গে ও নরকে তুলনা হয় না বটে; কিন্তু এস্থলে তাহাই কথঞ্চিৎ প্রযুজ্য। গৃহের প্রথম মূর্ত্তি স্বর্গ—ইহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি নরক বা তাহা হইতেও অধম।

ঋষিগণ, স্বর্গের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে প্রথমোক্ত গৃহই স্বর্গ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তাঁহারা বলিয়াছেন;—

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্ত মনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বপদাস্পদং॥

যাহাতে দুঃখের সম্পর্ক নাই—উত্তর কালেও যাহাতে দুঃখ সংস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা নাই—যাহা বাঞ্ছা তাহাই পূর্ণ হয়—সেই সুখময় স্থানের নামই স্বর্গ। ইহাই যদি স্বর্গ হয় তবে সেই স্থান এই গৃহ বই আর কি? শৈশবকালে—কি কৌমারে—যখন উত্তর কালের কোন চিন্তাই ছিল না—যখন দুঃখ শব্দটি নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া মনে হইত—যখন দিনেকের তরেও মনে কোন প্রকার অসুখ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই—যখন যাহা চাহিতাম, তদ্দণ্ডেই তাহা পাইতাম—তখন সেই গৃহই যে স্বর্গ তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই দেব বাঞ্ছিত স্থান—সেই ভূস্বর্গ—এক্ষণে পিশাচেরও ঘৃণ্য মহাশ্মশান, বা তাহা হইতেও ঘৃণিত—ভয়ঙ্কর—কৃমিপুরিত নরককুণ্ড; যদি গৃহের সেই রমণীয়—শোভনীয় মূর্ত্তি, এমন শোচনীয়—ঘৃণনীয় মূর্ত্তিতে পরিণত হয় তবে পৃথিবীতে কে এমন হতভাগ্য জীব আছে যে সেচ্ছায় ইহাতে জন্মগ্রহণ করিতে চায়? কে ইচ্ছা করিয়া এমন জ্বলন্ত অঙ্গার—এমন সর্ব্বনাশক হলাহল গলাধঃকরণ করিতে চাহে? যদি ইহার পরিণামে এত বিড়ম্বনা—এত মর্ম্মন্তুদ যাতনা—এত লাঞ্ছনা, তবে স্বেচ্ছায় কে

তাহাতে ঝাঁপ দিতে চায়? কালকূট ভক্ষণে সাধ কাহার? অহো! সংসারের পরিণাম যদি এই, তবে আর তাহার প্রয়োজন কি? তবে আর মনুষ্য জীবনের সার্থকতা—আবশ্যকতা কি? জগদীশ্বর! মনুষ্য কি তোমার ক্রীড়নক? না তোমার সৃষ্টির পরিপোষক? মানব তোমার কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? জানি না; যদি মানব চাও, তবে তাহার সঙ্গে স্মৃতি—স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন দিয়াছ কেন? ইহাত নাও দিতে পারিতে। দিয়া তোমার কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে? দেব! যদি পরলোকগামীর সঙ্গে সঙ্গে—তাঁহার দর্শন অভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত মানসক্ষেত্র হইতে উন্মূলিত হইত—তবে আর কষ্ট কি? কিন্তু স্মৃতির এ তুষাগ্নি দাহন কেন? ইহাতে তোমার পরম করুণাময় নামের কোন অংশ অভিনীত হইতেছে? স্মৃতির অসহ্য-বৃশ্চিক দংশন আর সহ্য হয় না, অনেক সহিয়াছি আর সহিতে পারি না—ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে—দেব! তোমার কার্য্য বুঝা ভার, মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে একরূপ স্মৃতি বীজ রোপন করিয়া তাহার কি মঙ্গল সংসাধন করিয়াছ, তাহা দেব তুমিই জান, তোমার লীলা বুঝা ভার।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

বসন্তাগমে।

ধীরে ধীরে ধীরে, মলয় পবন,
ঝুর ঝুর ঝুর বহিয়া যায়,
শিহরি শিহরি, উঠে ক্ষণ ক্ষণ,
কে যেন কি সুখ দিতেছে গায়।
লতায় লতায়, পাতায় পাতায়,
সকলি নবীন নবীন হেরি,
কুসুমে কুসুমে, থরে থর থর,
আহাকি প্রকৃতি সেজেছে মরি।

ঘুরে ঘুরে ঘুরে, ফিরে ফিরে ফেরে,
কুসুমে কুসুমে অলির বাসা,
ছাড়ে ছাড়ে ছাড়ে, ঘুরে ঘুরে ধরে,
মধু পানে আর মিটেনা আশা।
আধ ফোটা ফুটো, গোলাপ কলিকা,
আনত বদনে হইয়া হেঁট,
নবীন পবনে, নবীন জীবনে,
সুরভি যতনে দিতেছে ভেট।
মৃনালে মৃনালে, কমলে কমলে,
ধরা ধরি করে দিতেছে সাব,
শ্যামল বরণা, রমণী হৃদয়ে,
কে সাজালে হেন কনক হার?
গুণ গুণ ক'রে, প্রেমগান করে,
রসিক অলিতে সাধিছে তান,
কখন ভিতরে, কখন উপরে,
কভু গায় পড়ে করিয়া মান।
থরে থরে থর, বড় মনোহর,
কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উড়িছে পাখা,
চটুল চরণে, ধায় আত্মজনে,
পরপ্রেম তার মনেতে মাখা।
কচি কচি শাখা, কচি কচি পাতা,
কচি কচি ফুল ফুটেছে কত,
নবীন বসনে, নবীন বরণা,—
প্রাণ মনোহরা যবতী মত।
চাঁদের চাঁদিমা, খেলিছে তাহায়,
কভুবা উগরি দিতেছে ফেলি,
কভু নেচে নেচে, দেখায় যতন,
রবিকি প্রকৃতি তোমার কেলি।

পাতার ভিতরে, ধীরে ধীরে ধীরে,
হাসিতেছে ওকি মরি মরি মরি,
ধীকি ধীকি জ্বলে, নিভে পাতা কোলে,
বল কে লো তুমি চরণে ধরি ?
ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়,
না না না ওটা যে জোনাকি আলো,
পাতার ভিতরে, লুকায়ে লুকায়ে,
পিরীতি আজিকে করিলে ভাল।
ভাললো প্রকৃতি, সাজিয়াছ ধনি,
আজিকে তোমার সকলি ভাল,
শত শশী ছটা, কবি কত ঘটা,
ও বর বরণে দিতেছে আলো।
মোহিল নয়ন, মোহিল জীবন,
মোহিনী লো তুমি জগতে আজি,
কি শোভা দেখালে, মানস মজালে,
মজিলে আপনি এ সাজে সাজি।
ওই দেখ ধীরে, কত আশা করে,
সাজিছে রমণী মোহন বেশে,
বুকে প'রে ফুল, হয়েছে আকুল,
সাজায় আবেশে মোহিনী কেশে।
চিকুর চাঁচর, ঘন কাদম্বিনী,
দূর হতে যেন দিতেছে লাজ,
শোভিছে তাহাতে, ফুল অগনন,
নভভালে যেন তারা বিরাজ।
চুল হতে ফুল, ধীরে ধীরে ধীরে,
ঝ'রে ঝ'রে মরি পড়িছে ভূমে,
খসিয়া খসিয়া, পড়িছে আঁচল,
বুকে পশে অলি কমল ভ্রমে!

হেসে ঢল ঢল, আকাশের চাঁদ,
ছড়ায় কুসুম সুরভি রাশি,
নয়নে নয়নে, অধরে অধরে,
জোছ্না তরঙ্গ যেতেছে ভাসি।
ফুল বাস হরি, ধীরি ধীরি ধীরি,
উরসে পবন করিছে কেলি,
শিহরে বসন, শিহরে জীবন,
শিহরিছে অঙ্গ জগত ভুলি।
যাবে ত বসন্ত, যাবে ত যৌবন
বসন্ত যৌবন কদিন তরে,
তবে কেন সতী, মেতেছ এতই,
যৌবন যৌবন যৌবন করে?
শুকাইবে ফুল, শুকাইবে লতা
ফুরাইবে সব কিছু না রবে,
কেনলো মাতিবে, জগত ভুলিবে,
ক্ষণেক উল্লাসে মাতিয়া তবে?

কুসুমিকা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশার সঞ্চার।

হরিপদ—প্রাণ প্রতিমা কুসুমিকা সহ যেদিকে নয়ন ধাবিত হইতেছে সেই দিকেই যাইতেছেন। লোকালয় দেখিলেই প্রাণ শুষ্ক হয়, মস্তক যেন কাটা যায়, এইরূপ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীতে আপনাদের অদৃষ্টের অপকৃষ্টতার

কথা কহিতে কহিতে ধীরে ধীরে যাইতেছেন, এমত সময়ে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে সেইদিক দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহাদের বাক্যের অভাস মাত্র শ্রবণে বলিলেন "তোমরা কে গা ?"

হরিপদ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—একটী শুভ্রকেশি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ,—তাঁহার সুন্দর দেহায়তন ও মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধের প্রতি বিশেষ ভক্তি জন্মিল। তিনি বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

বৃদ্ধ তাঁহাদের শোকোচ্ছাসিত কাহিনী শ্রবণে শাতিশয় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সযত্নে তাঁহাদিগকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন এবং যত্ন সহকারে আহারাদি করাইলেন।

বৃদ্ধের—বৃদ্ধা, একটী বিধবা কন্যা এবং একটী পঞ্চদশ বার্ষিয় পুত্র ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিলনা। কন্যাটী রুগ্ন—গৃহিণী বৃদ্ধা সুতরাং পাকাদি কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হইতেছিল। বৃদ্ধ হরিপদের পরিচয়ে জানিলেন যে তিনি উত্তম ব্রাহ্মণ এবং দেখিলেন তাঁহাদের বড় কষ্ট সুতরাং সুযোগ পাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া কুসুমিকাকে পাচিকার কার্য্য করিবার পরামর্শ দিলেন। কুসুমিকা সে কথার কোন উত্তর দিলেন না, বলিলেন "তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে পারি না

সময় মতে কুসুমিকা আপন স্বামীকে সেই কথা বলিলেন। হরিপদ তাহাতে অগত্যা সাহ্লাদে স্বীকৃত হইলেন। কারণ কুসুমিকার দুঃখ আর তাঁহার সহ্য হইতে ছিল না,—হরিপদ ভাবিলেন দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী নহে, আপাততঃ কুসুমিকা এই স্থানে থাকুক, আমি অন্য কোথাও অন্ন চেষ্টা করি, পরে সময় একটু ভাল হইলে কুসুমিকাকে লইয়া দেশে যাইব।

হরিপদ বৃদ্ধের নিকট স্বয়ং সেই বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন, বৃদ্ধ মহা আহ্লাদ সহকারে তাহাতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন "আমরা তোমার স্ত্রীকে আপন কন্যার ন্যায় প্রতি পালন করিব, তুমি পুরুষ মানুষ আপন ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিবার চেষ্টা কর, পুরুষের ভাগ্যের কথা কে বলিতে

পারে? আর যখন ইচ্ছা হইবে, তোমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে,—যখন ইচ্ছা করিবে, তখনই লইয়া যাইতে পারিবে।"

হরিপদ বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া কুসুমিকার নিকট বিদায় লইলেন। কুসুমিকা স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল, যে কখন এক দণ্ড স্বামীর বিচ্ছেদ জানে না, তাহার স্বামী আজি অদৃষ্টের বাত্যাবিতাড়নে উদরান্নের জন্য কোথায় যাইতেছে,—ইহা কি সহ্য হয়? ইহা কি কুসুমিকা তুল্য দেবী দুর্ল্লভ রমণী রত্নের হৃদয়ে সহ্য হয়?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টের ফল।

হরিপদ বিদায় লইয়া আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে চলিলেন। এদিকে কুসুমিকা কন্যা নির্ব্বিশেষে বৃদ্ধের আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন। কুসুমিকার দারুণ অন্নকষ্ট ঘুচিল বটে, কিন্তু মনকষ্ট ঘুচিল না, বরং তাহা বৃদ্ধি পাইল। কুসুমিকা রন্ধনাদি করিতে বাধ্য, কিন্তু আপনার উপর তাহার সকল ক্ষমতাই ছিল, কুসুমিকা ভাল করিয়া আহারাদি করে না, দিবানিশি বিমর্ষ, রাত্রে অনিদ্রা, সমস্ত রজনীই প্রায় ক্রন্দনে অতিবাহিত হয়। যখন প্রাণ অত্যন্ত বিকল হয়, তখন মনে মনে বলে "হা ঈশ্বর, আমি কি এত গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যাহাতে আমার প্রাণাধিক স্বামী রত্নের দর্শন সুখলাভ হইতে বঞ্চিত হইলাম?" আমাদের পতিপ্রাণা কুসুমিকার অন্তরে নিরন্তর ভয়ঙ্কর অগ্নিপ্রদাহ হইতেছিল, কুসুমিকা অনেক যত্নে অনেক চেষ্টাতেও তাহা সান্ত্বনা করিতে পারিতে ছিল না।

এইরূপে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ ক্রমে মাসের পর মাসও অতিবাহিত হইল। কুসুমিকার পক্ষে তাহা একটি বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

আষাঢ় মাস, বর্ষাকাল, গত রাত্রে বেশ জল হইয়া গিয়াছে, অদ্য অতি প্রত্যূষে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং তাঁহাদের কন্যা ভাগিরথীতে প্রাতঃ স্নান করিতে গিয়াছেন। বাটীতে একমাত্র কুসুমিকা ব্যতীত অপর কেহই নাই। কুসুমিকাকে বৃদ্ধ প্রকৃতই আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন, এবং তাহার উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

কুসুমিকা বিকল হৃদয়ে গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে—এমত সময়ে তথায় বৃদ্ধের পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রটীর যৌবন কাল তাহাতে সহরের ছেলে, পিতা মাতার বিশেষ দৃষ্টি সত্বেও সঙ্গদোষে চরিত্র মন্দ হইয়াছে, অনেকের অর্থও সুযোগের অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না, কিন্তু পরীক্ষার উপায় থাকিলে সহস্র যুবার মধ্যে একটীও সবল হৃদয় সম্পন্ন যুবক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

যুবকটী কুসুমিকার নিকটে আসিয়া বলিল "দিদি কি কর্‌ছ?"।

যুবক কুসুমিকাকে "দিদি" বলিত এবং কুসুমিকা তাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিত।

কুসুমিকা। ঘরের কাজ্‌ কর্ম্ম কর্‌ছি।

যুবক। তুমি রাত্রে একা শোও।

কুসুমিকার হৃদয় দুর্‌ দুর্‌ করিয়া উঠিল, কুসুমিকা তাহার কোন উত্তর দিল না। যুবক ভাবিল "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" বলিল "একলা কি শোয়া যায়, আমি না হয় রাত্রে তোমার কাছে আস্‌ব, কি বল?"

কুসুমিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

যুবক। কাঁদ কেন?

কুসুমিকা মনে মনে বলিল "বসুন্ধরে। তুমি বিদীর্ণা হও আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি, আর এ সকল সহ্য হয় না।" তাহার মনে যে কত যাতনা হইতে লাগিল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য, যুবককে ভর্ৎসনা করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু মুখ ফুটিল না, নীরবে কেবল কাঁদিতেই লাগিল। যুবক আর তথায় দাঁড়াইল না, বেগতিক দেখিয়া লজ্জিত ভাবে প্রস্থান করিল। এবং তাহার যে বন্ধু তাহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল

"বিরহিনী যুবতীকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেই সফল কাম হওয়া যায়" তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিবে বলিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ হইল।

কুসুমিকা অঝোরে কাঁদিতেছে এমত সময়ে বৃদ্ধা কন্যা সহ স্নান করিয়া আসিলেন, কুসুমিকাকে রোদন পর দেখিয়া ব্যগ্রভাবে তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কুসুমিকা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিল, শুনিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "ও ছেলে মানুষ ওর কথাও ধরে, ওকি এ্যাত স্যাত জানে, যাই হক্ মা চুপ কর, দেখ যেন কর্ত্তা এ সব কথা শুনেন না।"

কুসুমিকা আরও হতাশ হইল। সে দিবস নাম মাত্র আহার করিয়া রহিল, স্বামীর জন্য মন কাঁদিয়া উঠিল, তাঁহার সহিত যাহাতে সাক্ষাৎ হয় তন্নিমিত্ত সহস্রবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল কিন্তু ঈশ্বর সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। অভাগিনীর স্বামী সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

পর দিবস অতি প্রত্যুষে, তখন বেশ ঘোর ঘোর রহিয়াছে, আকাশ পটে তখনও নক্ষত্র মালা শোভা পাইতেছে, কুসুমাবলী যেন প্রভাতী বায়ু স্পর্শে শিহরিতা হইতেছে, এমত সময়ে আমাদের অভাগিনী কুসুমিকা বিকল হৃদয়ে সাশ্রুলোচনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাটী পরিত্যাগ করিল, আপন অদৃষ্ট রঙ্গাঙ্গনে আবার নূতন অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

———০ঃ০———

নূতন স্থান।

কুসুমিকা নিশা শেষে একাকিনী চলিল, অনেক দূর যাইয়া প্রভাত হইল, সূর্য্যদেবের উদয় দেখিয়া তাহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল—মনে হইল পাছে আর কেহ তাহাকে পরিহাস করে, তাহার কাছে প্রেম ভিক্ষা করে। কুসুমিকা মনে করিল—ঈশ্বর যদ্যপি আমায় কুরূপা করিয়া সৃজন করিতেন তাহা হইলে হয়ত আমাকে এ সকল বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। মনে করিল সূর্য্য তুমি ত শ্রীবৎ-পত্নী চিন্তা সতীর প্রার্থনা মতে তাহার

রূপ হরণ করিয়াছিলে, দেব, তবে আমার প্রতি সে অনুগ্রহ করনা কেন ?—কুসুমিকা প্রকৃতই জানু পাতিয়া শাশ্রুলোচনে সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া প্রার্থনা করিল, কুসুমিকা আবার চলিল পথে লোক দেখিলেই প্রাণ শুকাইয়া যায়, মনে হয় হয়ত আবার কোন নৃশংস আমার প্রতি কটু হৃদয় বিদারী বাক্য প্রয়োগ করিবে। কখন মনে মনে বলে "জগদীশ্বর পথে আমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দাও, এ অধিনী আর কখন কোন প্রার্থনা করিবে না," কিন্তু অভাগিনীর সে আশা পুরিল না।

দিবা দুই প্রহর অতীত,—সূর্য্যদেব তাঁহার প্রচণ্ড কিরণে জগত সংসারকে দগ্ধ করিতেছেন, এমত সময়ে কুসুমিকা অনশনে সেই দারুণ তাপ সহ্য করিয়া কোথায় যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই, কোথায় যাইলে হৃবিপদর সাক্ষাৎ পাইবে তাহা ঈশ্বর ব্যতীত কে বলিতে পারে, কিন্তু তথাপি কুসুমিকা সাহসে ভর করিয়া ঐ উদ্দেশে চলিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের সে প্রখর জ্যোতিও কমিল, সন্ধ্যা হইবার উপক্রম হইল। এখনও কুসুমিকার আহার হয় নাই—এই সময়ে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাদি করিয়া গঙ্গাতীর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন, তিনি কুসুমিকাকে দেখিয়া বলিলেন "মা তুমি কে, আর এ সময় কোথায় যাইতেছ ?"

এ পর্য্যন্ত এ কথা কেহই কুসুমিকাকে জিজ্ঞাসা করে নাই।

কুসুমিকা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া গদগদ চিত্তে সমস্ত কাহিনী অকপট ভাবে বিবৃত করিল। কুসুমিকার সরল ভাব ও অকৃত্রিম পতিপ্রেম দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহার উপর নিরতিশয় প্রীত হইলেন, এবং বলিলেন "তোমার স্বামী কোথায় গিয়াছেন তাহা তোমায় বলিয়া যান নাই ?"

কুসুমিকা। আজ্ঞা না।

ব্রাহ্মণ। তিনি কি চাকরীর প্রত্যাশায় কোথাও গিয়াছেন ?

কুসুমিকা। হ্যাঁ।

ব্রাহ্মণ। তোমার নাম কি মা ?

কুসুমিকা অধোবদনে বলিল "কুসুমিকা"।

ব্রাহ্মণ। দেখ কুসুমিকা তুমি আজ হইতে আমার মা হইলে, আমার

ত্রিসংসারে আর কেহই নাই—চল তুমি আমার বাটীতে থাকিবে, আমি স্বয়ং তোমার স্বামীর সন্ধান করিয়া দিব।

কুসুমিকার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল, কথা কহিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, কথা সরিল না।

ব্রাহ্মণ। তোমার আজ আহারাদি হয় নাই।

কুসুমিকা আবার অধোবদনে বলিল "না।"

ব্রাহ্মণ। এস, আমার বাটীতে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন, কুসুমিকা কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০:০—

নূতন স্নেহ।

কুসুমিকা নূতন স্থানে প্রকৃতই অতিশয় স্নেহ ও ভালবাসা পাইল। বলা বাহুল্য যে কুসুমিকাও ব্রাহ্মণকে আপন পিতার ন্যায় ভালবাসিল, অন্তরের সহিত ভক্তি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ [illegible] কুসুমিকাকে "মা" "মা" বলিতেন, কুসুমিকা যেন প্রকৃতই তাঁহার মাতা।

ব্রাহ্মণ হরিপদর অনুসন্ধানের ত্রুটী করিলেন না। গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কেহই তাঁহার তত্ত্ব আনিতে পারিল না। কুসুমিকা দিনে দিনে হতাশ হইতে লাগিল। বৃদ্ধ অনেক সময় অনেক উপায়ে কুসুমিকাকে কত বুঝাইতেন কিন্তু কুসুমিকার মন কিছুতেই স্থির হইত না। সাগর প্রয়াসিনী নদীর ন্যায় তাহা একাগ্র চিত্তে সেই চিত্তরঞ্জনের ধ্যান করিত,—সেই ধ্যানে অবিরত মগ্ন থাকিত।

ব্রাহ্মণটীর বাটী বালুচর, ব্রাহ্মণের বিলক্ষণ সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন, বাটীতে একটী দাসী, একটী পাচিকা ও একটী মাত্র দাস ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম ষাইট বৎসরের ন্যূন নহে।

কুসুমিকা প্রায় ছয় মাস বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাটীতে বাস করিলেন, ছয় মাসের পর বৃদ্ধের অত্যন্ত পীড়া হইল। ক্রমশঃ পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কুসুমিকার নামে উইল করিলেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণ কুসুমিকাকে ডাকিয়া বলিলেন "মা আমার সময় নিকট, তুমি আমার শিয়রে বস।"

কুসুমিকা ব্রাহ্মণের শিয়র দেশে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ। দেখ কুসুম তুমি আমার মা, আমার আর সময় নাই, জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায়—বড় দুঃখ রহিল যে হরিপদকে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু তুমি যেরূপ পতি-পরায়ণা সাধ্বী তাহাতে তোমার স্বামীর কোন অনিষ্টপাত হয় নাই। আজি হউক, কালি হউক বা দুই বৎসর পরে হউক হরিপদর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবেই হইবে।

কুসুমিকা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধ কুসুমিকার মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন "আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবিনী হও, তুমি পতি পুত্র লইয়া সুখিনী হইয়া আমার এই অতুল বিষয় বিভব ভোগ কর।"

কুসুমিকা তখনও কোন কথা না কহিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ। দেখ মা, আমার জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা,—ঐ লোহার সিন্দুকে পাঁচ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে, আর "সরিয়া আইস" এই বলিয়া কুসুমিকার কর্ণ আপন মুখের কাছে আনিয়া বলিলেন "এই ঘরের উত্তর দিকে মেজেয় যাহা পোঁতা আছে তাহা তুমি গোপনে তুলিয়া লইও, আর হীরা, জহরত, স্বর্ণ অলঙ্কার আদি আমার শিয়র দেশে যে সিন্দুক রহিয়াছে ইহাতেই রহিল। কিন্তু মা তোমায় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে তুমি আমার এই ভিটায় বাস করিবে।

কুসুমিকা। করিব।

বৃদ্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কুসুমিকা বৃদ্ধের মুখে গঙ্গাজল দিলেন, ... বলিলেন "আমার শ্রাদ্ধে তাদৃশ বহু ব্যয় করিও না—আর আমার গঙ্গা যাত্রা কর, তুমি আমার মুখাগ্নি ও অন্তর্জ্জলি করিও।"

কুসুমিকা কাঁদিতে লাগিল, বৃদ্ধ বলিলেন "মা ইহার পরে কাঁদিও এখন আমার কাছে বসিয়া কাঁদিলে আমার অন্তিম কালের কার্য্য হইবে না।"

কুসুমিকা বৃদ্ধের গঙ্গা যাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন, প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কুসুমিকাই তাঁহার মুখাগ্নি করিল। যথা সময়ে কুসুমিকা মহা সমারোহে বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তাঁহার অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইল।

বাঙ্গালির অবস্থা।

বাঙ্গালির অবস্থা বলিলেই প্রথমতঃ নীরিহ কৃষককে মনে পড়ে আর প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, বৎসরের পর বৎসর যাহারা বিশুষ্ক বদনে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া উৎপীড়ক জমিদার, দারা পুত্র মহাজন ও সর্ব্ব গ্রাসী ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টকে দেহি দেহি শব্দের মুহুর্মূহু শান্তি বিধান করিতেছে, সেই কৃষকের বিষণ্ণ ছবি অবিরত আমাদের নয়ন দর্পণে প্রতিভাত হইতেছে। একেত বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ জমিদারি পত্তনি বিলি, যান্মাসিক অষ্টমে হস্তান্তর হইতেছে, নূতন জমিদার হইতেছে, নতন করিয়া প্রজাকে উৎপীড়ন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। এদিকে বিকট মথ ব্যাদান ইংরাজি অত্যাচার পাবলিক ও রোডশেষ প্রজাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে। প্রজা যায় কোথা?

এ নশ্বর জগতে প্রজার পক্ষ কয়জন? কয়জন দরিদ্র প্রজার চক্ষের জল মুছাইতে বদ্ধ পরিকর? কেহই না, জমিদার রাজা লইয়া সকলে ব্যস্ত, প্রজার দুঃখ কেহ দেখে না, কেহ বুঝে না। যে প্রজার মর্ম্মের শোনিত পান করিয়া রাজা বাহাদুরের এত তেজ, এত দম্ভ, এত অহঙ্কার, সেই প্রজার দুঃখে তাঁহার চক্ষে জল আইসে না, ইহা কি কম দুঃখ।

দুঃখের উপর দুঃখ যে এদুঃখ জানাইবার স্থান নাই,—প্রজার কাঁদিবার স্থান রাজা, কিন্তু রাজা কি প্রজার দুঃখে কাঁদেন? ইংরাজ রাজ কি প্রজার সুখ বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করেন? জমিদার ও প্রজাকে এক দণ্ড বিধির

অন্তর্ভুক্ত করিয়া ন্যায় বিচার দেখাইয়াছেন, ইহাতে উপকার কি দর্শিয়াছে? কতক গুলি নির্ব্বোধ মূর্খ প্রজা জমিদারের বিপক্ষতাচরণ করিয়া জমিদার ও প্রজার মনান্তর বাধাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল দেশে নালিস কাহাকে বলে জানিত না, এখন তথায় রাশি রাশি নালিশ হইতেছে, প্রজারা ছেঁড়া চেটায় বসিয়া কমিটী করিতেছে, কিন্তু কিসের কমিটী,—না অমুক দুরান্ত জমিদার তাহাকে সহজে খাজনা দেওয়া হইবেনা ইত্যাদি—ইহার ফল জমিদার ও প্রজায় ঘোরতর বিরোধ স্থাপনা করা, খাজনা না দিয়া বাঁচিবার উপায় আছে কি? এই রূপ বিরোধ ঘটাইতে গ্রামে গ্রামে এক দল করিয়া লোক আছে, মোকদ্দমাই তাহাদের ব্যবসা, মোকর্দ্দমা বাধাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহারা স্বীয় উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। কিন্তু কি পরিতাপ, যে প্রাজা বুঝে না, যে এ মোকর্দ্দমায় কাহার সর্ব্বনাশ, ইহাতে, দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, প্রজা দিনে দিনে নিঃস্ব হইতেছে। দেশের উন্নতি সাধনে বদ্ধ পরিকর হইতে এখনও প্রজারা শিক্ষা করিল না। সম্ভবতঃ করিবেও না, কিন্তু ইংরাজি আইনের বাহবা দিয়া মোকর্দ্দমায় মাতিতে শিখিয়াছে। যদিও জমিদারের কোন অন্যায় কার্য্য হয় তাহা হইলে প্রজা-দের তাহা মিটাইয়া ফেলায় যে সুখ সে সুখ মোকর্দ্দমায় নাই,—এই মোকর্দ্দমার ব্যয় চাঁদা করিয়া হউক, যেমন করিয়া হউক প্রজাকে দিতে হয়, কিন্তু ইংরাজ ভাবেন যে প্রজার অর্থ হইয়াছে নতুবা তাহারা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা চালায় কোথা হইতে, সুতরাং আর একটা নূতন ট্যাক্স করিলে প্রজা মারা যাইবে না। যে প্রজা কুপরামর্শে বা অন্তর্ভেদী অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া মোকদ্দমায় রত হইয়া ন্যায় বিচার প্রার্থনা করিল, তাহার ফল হইল বিপরীত, নূতন কর স্থাপনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসিল।

প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে অনিচ্ছুক অতি অল্প লোক। খাজনা পীড়ন প্রজার প্রধান অত্যাচার, দরিদ্র প্রজাকে সময় দিয়া কৌশলে গায়ে হাত বুলাইয়া খাজনা আদায় করাই বিচক্ষণ জমিদারের নীতি, নতুবা প্রজা মারা যায়, অত্যাচার হয়, জমিদারের প্রতি তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। কিন্তু সে টুকু সকল জমিদারে বুঝে কি? এক দিনে সকাল

টাকা আদায় হয় ইহা কাহার না ইচ্ছা, কিন্তু প্রজা কি তাহা দিয়া উঠিতে পারে? পারে না, সুতরাং জমিদার প্রজায় বিরোধ হয়। এ বিরোধ কি কখন যাইবে? আমরা বলি না যাউক কিন্তু ইংরাজ রাজ যিনি ভারতের সর্ব্বে সর্ব্বা, যাঁহার প্রবল কটাক্ষে দুর্ব্বল প্রজা কোথায় থাকে, মহারথী সকল কাঁপিয়া উঠে, বঙ্গের—ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারাও কি প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে অকুণ্ঠিত। জমিদারের অত্যাচার যতই হউক ইংরাজ রাজের খাস তশিলের শতাংশের একাংশও হইবে না। যদি ইংরাজ, তোমার জোর তশিলে প্রজার অনিষ্ট না হয় তবে জমিদারের জোর তশিলকে অত্যাচার বল কেন? না তোমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বলিয়া তুমি যাহাই কর তাহাই দুর্ব্বল সহায় সম্পদ শূন্য প্রজা নত শিরে সহ্য করিবে। ছি। ছি! তুমি হইলে রাজা, তুমি হইলে প্রজার পিতা, তুমি যদ্যপি এত অত্যাচার করিবে, যদি তোমার তাড়নায় প্রজার চক্ষের জল শুকাইবে না, রাত্রে নিদ্রা হইবে না—তবে ইংরাজ, তবে তোমার রাজ্যের সুখ তাহারা বুঝিবে কেন? তবে মা ভারতেশ্বরী, তবে তোমায় ভক্তি ভরে দরিদ্র প্রজারা ডাকিবে কেন? তোমার মধুময় নাম দরিদ্র প্রজা হৃদয়ে অক্ষয় রূপে জাগরূহ রহিবে কেন? কিন্তু কারে বলি কে শুনে। মেদিনীপুরের প্রজাদিগের দুরবস্থার কথা কি আর নূতন করিয়া কাহাকেও বলিতে হইবে?—সে দুঃখ কি ইংরাজ বুঝিয়াছেন?

এই যে প্রজা শোণিত শোশিত করিয়া বঙ্গেশ্বর তুমি বৎসর বৎসর রাশি রাশি অর্থ লইতেছ, কিন্তু তুমি তাহার বিনিময়ে কি করিতেছ? গ্রীষ্মকালে শৈল বিহার, বর্ষায় বোটাস্, শীতে বেলভিডিয়ার আর মধ্যে মধ্যে লিভি, কিন্তু ইহাতে দরিদ্র প্রজার দুঃখ ঘুচিতেছে কি, তুমি যাহার অর্থে বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ আসনে সমাসীন হইয়া বঙ্গের অদ্বিতীয় প্রভু হইয়াছ, বঙ্গাধিপ্ তুমি কি ভ্রমেও তাহাদের দুরবস্থার কথা ভাব? তাহাও কি হয়, বঙ্গের ভাগ্য কি প্রসন্ন হয়।

বঙ্গেশ্বর! তুমি ত সে দিন মেদিনীপুর গিয়াছিলে, কই প্রজার কি করিয়া আসিলে, সখের প্রাণের সখ হইল, কিন্তু প্রজার চক্ষের জল শুকাইল কি? টমশন তুমি কি নিজের চক্ষে দেখিতে জান না? অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাজিষ্ট্রেটের

রিপোর্টই কি তোমার মূল মন্ত্র? তবে তুমি অর্থ শ্রাদ্ধ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও কেন? মাজিষ্ট্রেটের টুরই ত যথেষ্ট, এবার হইতে আরও ভাল হইল পাঁচ টাকায় সাড়ে সাত টাকা হইয়াছে, প্রজার অবস্থা ভাল করিয়াই দেখা হইবে। না না বঙ্গের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে না,—দুঃখের অমানিশা বুঝি আর পোহাইবে না।

এই ত গেল শেষ সম্প্রদায়, এখন মধ্যবিত্ত লোকদিগের অবস্থা দেখ, ইহাদের আরও বিপদ, চাকুরির বাজার আগুন, অথচ ইহাদের লক্ষ্য চাকুরি। চাকুরি ব্যতীত যেন ইহাদের আর অন্য কোন উপায় নাই, লেখা পড়া শিক্ষা প্রভৃতি যাহা কিছু করে তাহার চরম সীমায় যেন এক চাকুরি নিহত রহিয়াছে। কিন্তু এত চাকুরি কোথায়? সুতরাং সেই সমস্ত গৃহে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়া উঠিয়াছে, ব্যবসায় করিতে অর্থ চাই, সে অর্থ হয়ত নাই, থাকিলেও যে টেক্স তাহার জ্বালায় ভদ্রলোকের অল্প টাকায় কোন প্রকার ব্যবসা করিয়া উন্নতি করিবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। এক স্বর্ণ প্রসূভারতের চাস,—তাহা সকলে বুঝে কি? তাহা বুঝিতে অনেক ক্লেশ চাই অনেক অধ্যবসায় চাই, সে অধ্যবসায় বাঙ্গালির আছে কি?

বিনা যথেষ্ট কর্ষণে যে সকল প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি জন্মিয়া থাকে সে সকল কৃষিপ্রধান দেশে আজিও কৃষির আদর হইল না ইহা কি কম দুঃখের কথা। কোথায় স্কট্ল্যাণ্ড তাহার প্রস্তরময়ী প্রদেশ ঘোরতর কর্ষণে শস্য শালিনী করিয়া তুলিতেছে, আর স্বর্ণপ্রসূ ভারতে কৃষিকার্য্যের আদর নাই। এমেরিকার প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখিবে যে তাহারা কৃষি সম্বন্ধে কত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এক কৃষিকার্য্যের সাহায্যে তাহারা ধনী। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে তাহা হয় না। ভারত দিন দিন পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন উৎপন্ন করিতেছে। ভারতের মৃত্তিকা পূর্ব্বাপেক্ষা অনুর্ব্বরা হইয়া পড়িতেছে। কৃষির উন্নতি কল্পে রাজার দৃষ্টি না থাকিলে কি প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের রাজা দুর্ভাগ্য বশতঃ এ সকল সৎকর্ম্মে বড়ই উদাসীন।

তাহার পর ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা যৎপরোনাস্তি শোচনীয়। ইংরাজ ও বাঙ্গালিতে ঘোর মনান্তর চলিয়াছে এই বিদ্বেষ ভাব ও মনান্তরের

পরিণাম যে কি হইবে তাহা বলা যায় না। আজি প্রায় ১৩০ বৎসর হইল আমরা ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ অধীনস্থ হইযাছি, কিন্তু এই যে কত যুগান্তর হইল ইহার মধ্যে ইংরাজ ও বাঙ্গালীতে কি সখ্য ভাব হইয়াছে? কতকগুলি উদারনৈতিক উন্নতমনা রাজ পুরুষের সহিত আমাদের সখ্য ভাব থাকিতে পারে সত্য কিন্তু সাধারণ ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের কিরূপ সম্বন্ধ? যত দিন পর্য্যন্ত এই বিদ্বেষ ভাব পরস্পরের হৃদয় হইতে অপনীত না হইতেছে ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির আশা বড় কম।

ইংরাজ বলিতেছে যে বাঙ্গালির সহিত আমাদের বিদ্বেষ ভাব নাই, আইনের সবল চক্ষে ইংরাজ বাঙ্গালি এক। ইংরাজ ও বাঙ্গালি উভযেই উপযোগিতা অনুসারে ভারতের রাজকীয় উচ্চ আসনে সমাসীন হইতে সম্পূর্ণ অধিকারী—কিন্তু তাহা নাম মাত্র। যত দিন না পরস্পরের হৃদয়ের মিল হইতেছে, ততদিন সে আশা দুরাশা মাত্র।

প্রতি দিন এই ভারতে ইংরাজ কর্ত্তৃক কত হতভাগ্য ভারতবাসী হত হইতেছে কিন্তু বিচার তাহাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছে। রাজ বিচারে যাহা হয় তাহাতে কথা কহিবার উপায় কি আছে? রীপণ! তুমি যখন ভারতে আসিলে, যখন তোমার ন্যায় সাধু পুরুষের কোমল হস্তে এই পঞ্চবিংশতি কোটি হতভাগ্য ভারতবাসীর রাজদণ্ড অর্পিত হইল, তখন বড় আশা করিয়াছিলাম যে এত দিনে বুঝি ভারতের অন্ধকার গগনে শশধর সমুদিত হইল। মনে হইল বুঝি এত দিনে আমরা ন্যায্য বিচার পাইব। কিন্তু সকলই আকাশ কুসুম হইল,—সে দোষ তোমার নয়—ভারতবাসীর পোড়া কপালের দোষ।

এক ইলবার্ট বিল লইয়া কত তুমুল কাণ্ড হইল, এক আশা করিলাম কিন্তু ভাগ্য ক্রমে আর হইল। ছিল ভাল, হইল মন্দ। বিচারকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জুরির বিচারে আসামী খালাস পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাও গেল। রীপণ যদি জান যে ইলবার্টবিলের পরিণাম এত শোচনীয় হইবে তবে কেন ইলবার্টবিল পাশ করিলে? ইংরাজ বিল পাশের পক্ষে খড়্গহস্ত হইল, আর দয়ানিধান রীপণ তুমি সিমলার শৈত্যে স্বজাতি প্রেম পরবশ হইয়া না হউক—দ্বেষভীত হইয়া ইলবার্ট বিল পরিবর্ত্তিত আকারে বিধিবদ্ধ

করিলে, বাঙ্গালির শূন্য মস্তকে সিমলা শৈল হইতে তোমার অনিচ্ছা সত্বেও একটী বজ্রপাত হইল।

ইলবার্ট বিলে যে এইটুকু হইল তাহা নহে, আজি শতাধিক বৎসর ধরিয়া অসীম অধ্যবসায় প্রভাবে যে বাঙ্গালি ইংরাজ পুরুষের প্রেম, ভালবাসা, দয়া, স্নেহ, অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে ছিল তাহা দূরগত হইল। ইংরাজ বাঙ্গালিতে ঘোর শত্রুতা হইল। কাহার সহিত আমরা শত্রুতা করিব, ইংরাজের সহিত,—ইহা আমাদের সাধ্যাতীত, তোমরা যে রাজনীতি বলে আজি আমাদিগকে একটী মাত্র আইন দিয়াছ, কালি আবার সেই রাজনীতি বলে ইংরাজ বাঙ্গালির স্বতন্ত্র আইন হইতে পারে, মুসলমান রাজার সময়ে, সেরাজুদ্দৌলার সময়ে আমরা যে ভাবে ছিলাম আবার আমরা তোমাদের হইতেই সেই ভাবে অবস্থাপিত হইতে পারি, ইহাতে বাঙ্গালি কি কথা কহিতে পারিবে, কখনই না, সকল বজ্র বুক পাতিয়া লইবে, যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ কথাটী কহিবে না।

ইরাজ! তোমার আইনের পার্থক্য নাই তাহাই বা কি রূপে বলিব, নন্দকুমারের ফাঁসি এখনও হৃদয়ে জাগিতেছে, আবার সেই আইনের জোরে ঢাকার ছাত্র দিগের কিনা হইল, সুরেন্দ্র কারাগারে গিয়াছে, মাননীয় আমীর আলিকে উত্তম মধ্যম দিয়া দশটাকা অর্থদণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছে, আবার সেই আইনের বলে ও জোরে ওয়েবের একশত টাকা মাত্র জরিবানা হইল। হা হতবিধি ইহাও কি দেখিতে হইল। সহায় শূন্যা সতীকে বলপূর্ব্বক পামর ইংরাজ আপন কক্ষে লইয়া গেল, আপন পাশব প্রবৃত্তি তাহার স্বামীর বক্ষের উপর সাধিত করিল। যে ভারত মহিলারা সতীত্বের আদর্শ স্বরূপ, যাহারা সহমৃতা হইত, আজি আবার বিধিবিড়ম্বনায় তাহাদেরই এই অবস্থা, মাতঃ বসুন্ধরে, তুমি কেন বিদীর্ণ হও না। পারাবার তুমি কেন উছলিয়া ভারতকে উদরস্থ কর না, এ কলঙ্ক কি সহ্য হয়! এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে?

ক্রমশঃ।

কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মানব চরিত্র চিত্রনেও তাঁহার যথেষ্ট মৌলিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আখ্যায়িকা গ্রন্থ রামায়ণেও অনেকগুলি মানব চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা মূল গ্রন্থের অনুকরণ এবং আলোক সামান্য। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতির মত চরিত্র এ সংসারে কখন কি দেখিয়াছ? তাঁহারা এক প্রকার অনন্য সাধারণ জীব, মানব সমাজের উন্নতির জন্য কবির কল্পনায় সৃষ্ট হইয়াছিলেন, বিধাতার সৃষ্টিতে তাঁহাদের অস্তিত্ব ছিল এরূপ আমাদের বিশ্বাস নাই। কিন্তু মুকুন্দরামের চরিত্র সকল অন্যবিধ। আমাদের দৈনিক অভিজ্ঞতা আমাদিগকে যে সকল চরিত্রের সহিত পরিচিত করে, তাঁহার কাব্যস্থ চরিত্র নিচয় তাহাই। তাঁহার কাব্যে রাবণ, আয়েগো শকুনি অথবা চন্দ্ররাওয়ের মত নর শোণিত লোলুপ রাক্ষসও নাই, সীতা, সূর্য্যমুখীর ন্যায় নারীরূপী দেবতাও নাই, যাহা আছে তাহা বঙ্গদেশের প্রতি পথে এবং ঘাটে আছে। তবে এই সকল চরিত্রের অবিকল তপন চিত্র আপনার গ্রন্থে দিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহাতেই তাঁহার যথার্থ কবিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ কালকেতু কুটীরে যুবতীবেশিনী পার্ব্বতীর সহিত ফুল্লরার বাদানুবাদ। ইহাতে সপত্নীসম্ভাবনাভীতা বঙ্গীয় মহিলার হৃদয় সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যখন অঙ্গুরীয় হস্তে কালকেতু পোদ্দারের ঘরে উপস্থিত হইল তখন কবি কিরূপ চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন পাঠক তাহা একবার দেখুন,—

"বেণে বড় দুঃশীল, নাম মুরারি শীল,
লেখা জোখা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভীতর বাড়া
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি।

খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিকরাজ, আছয়ে বিশেষ কাজ
আমি আইলাম তার হেতু॥
বীরের বচন শুনি, আসি বলে বেণেনী
ঘরে নাহিক পোদ্দার।
সকালে তোমার খুড়া, গেল খাতকের পাড়া
কালি দিব মাংসের ধার॥

আজি কালকেতু যাও ঘর।
কাষ্ঠ আনিহ এক ভার, একত্রে শুধিব ধার
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর॥
শুন গো শুন গো খুড়ি, কিছু কার্য্য আছে তড়ি
অঙ্গুরী ভাঙ্গিয়া নিব কড়ি।
আমার যে ধার খুড়ি, কালি দিহ বাকি কড়ি
যাই অন্য বণিকের বাড়ী॥

ক্ষালু দণ্ড করহ বিলম্বন।
সাহস করিয়া টানি, আসি কহে বেণেনী
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥
ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ
ধায় বেণে খড়কার পথে॥
মনে বড় কুতূহলী, কান্ধেতে কড়ির ঝুলি
হড়নী নিখ্তি লয়ে হাতে॥

করে বীর বেণেকে জোহার।
বেণে বলে ভাই পো, এবে না দেখি যে তো
তোমার কেমন ব্যবহার॥

উঠিয়া প্রভাত কালে, কাননে এড়িয়া জালে
হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি।
ফুল্লরা না আইসে ঘরে, হাটেতে পসার করে
এই হেতু নাহি আসি আমি॥

খুড়া ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুরী।
হয়া মোরে অনুকূল, উচিত করিবে মুল
তবে সে বিপদে আমি তরি॥
বীর দেয় অঙ্গুরী, বেণিয়া প্রণাম করি
জোখে বেগে চড়ায়া পৈড়ান।
কঁুচ দিয়া কৈল মাণ, ষোল রতি দুই ধান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥"

আমাদের তৃতীয় দৃষ্টান্ত স্থল ভাঁড়ু দত্ত। পাঠকগণ দেখুন মহাত্মা ভাঁড় কি অপূর্ব্ব বেশে রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইতেছেন। দেবীর প্রভাবে যে ঝড় বৃষ্টি সৃষ্টি হয় তাহাতে কলিঙ্গদেশ মনুষ্যাবাসের অনুপযুক্ত হওয়ায়, অদী-নাত্মা ভাঁড়ু গুজরাটরাজ কালকেতুর নিকট যাইতেছেন।

"ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ু দত্তের প্রয়াণ।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ, ছিঁড়া জোড়া কোঁচালম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ॥
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড় নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়া খুড়া খুড়া।
ছিঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥
আইলাম বড়ই আশে, বসিতে তোমার দেশে
আগে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ
কুল শীল বিচার মহত্ত্বে॥

কহি যে আপন তত্ত্ব, আমল হাড়াব দত্ত
তিন কুলে আমাব মিলন।
ঘোষ বসুব কন্যা, দুই জায়া মোব ধন্যা
মিত্রে কৈনু কন্যা সমর্পণ॥
গঙ্গাব দুকূল কাছে, যতেক কায়স্থ আছে
মোর ঘরে কবয়ে ভোজন।''
ইত্যাদি

এ সম্বন্ধে আব বাক্যব্যয় আবশ্যক দেখি না। ভাঁড়ু দত্ত কি উপায়ে কালকেতুব বাজ্যে কর্ত্তৃত্ব ভাব পাইয়া প্রজা পীড়ন আবম্ভ করিয়াছিল, কিরূপেই বা তাড়িত হইয়া কলিঙ্গবাজেব আশ্রয়ে কালকেতুব সর্ব্বনাশ সাধন কবিয়াছিল, কি প্রকাবে তাড়িত হইয়া আবাব কালকেতুব তোষা-মোদ করিতে আবম্ভ কবিয়া অপদস্থ হইল ইত্যাদি ঘটনা পাঠকগণ মূল গ্রন্থে পাঠ করিয়া দেখিবেন। সামান্য প্রবন্ধে তাহা প্রতিপাদন অসম্ভব। তবে এস্থলে এই মাত্র বলিযা বাখি যে এই সকল চবিত্র এতদূব স্বভাবানু-সাবী হইয়াছে যে সময়ে সময়ে আমাদেব মানব চবিত্রজ্ঞ কবিগুরু সেক্ষ-পীয়বকে মনে পড়ে। এই সকল বর্ণনায় করুণ এবং হাস্য বসের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইযাছে যে তাহা বঙ্গভাষায় অপব কোন কবির গ্রন্থেই পবিলক্ষিত হয় না।

অন্তর্জগৎ ছাড়িযা আমবা এক্ষণে তাঁহাব বাহ্য জগৎ বর্ণনার পারিপাট্য প্রদর্শন করিব। পাঠক একবাব তাঁহাব কলিঙ্গেব ঝড় বৃষ্টি বর্ণনা এবং মাগুবাব সেই ঘটনাব বর্ণনা পাঠ কবিয়া দেখুন তাহা হইলে বুঝিবেন মুকু-ন্দরামেব কবিত্ব কি প্রকার উপাদানে গঠিত।

"ঘন বাজ ধ্বনি, বাবি মেঘের গর্জ্জন।
কাবো কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
পবিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস বজনী।
সোঙবে সকল লোক জনক জননী॥''

ইত্যাদি বর্ণনা পাঠ কবিতে করিতে আমরা সকল পদার্থে বিভিন্ন অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই। জগৎ সৃষ্টির প্রাগ্‌ভব অন্ধকার আমাদিগকে ছাইয়া ফেলে,

আমরাও সেই ভীষণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হই, আমাদেরও পৃথক অস্তিত্ব লোপ পায়। বাহ্য জগৎ বর্ণনে এমন তন্ময় কবি আমাদের দেশে আর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে চাও ত পাঠক একবার কালীদহের বর্ণনা পাঠ করিয়া দেখ। ইহাতে বুঝা যাইবে কবির কল্পনা কিরূপ সুদূরব্যাপিনী এবং সৃজনকুশলা। মুকুন্দরামের কবিত্ব কিরূপ অপূর্ব্ব পদার্থ তাহা যিনি না পাঠ করিয়াছেন তাঁহাকে বুঝাইতে প্রয়াশ পাইয়া কেহ যে সম্পূর্ণ সফল মনোরথ হইবেন এমন আমাদের বিশ্বাস নাই।

অতঃপর আমরা চণ্ডীমঙ্গল পাঠের আবশ্যকতা বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐহিক বিষয়ের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করাতে জাতীয় ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। ধারাবাহিক জাতীয় ইতিহাসের অভাবে জাতীয় সাহিত্যই মানব সমাজের আশ্রয় হইয়া থাকে, এ কথা সর্ব্ববাদি সম্মত, কিন্তু আমাদের মতে জাতীয় সাহিত্যের ধারাবাহিক পাঠ, ইতিহাসের ধারাবাহিক পাঠ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। জাতীয় সাহিত্যই যথার্থ জাতীয় ইতিহাস। কারণ জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় জীবন যেরূপ সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়, ফরাশি 'বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ইতিহাস গ্রন্থেই সেরূপ অভিব্যক্ত হয় নাই। সেই জন্যই পণ্ডিত প্রবর গ্রিণ সাহেব তদ্রচিত ইংরাজ জাতির ইতিবৃত্তে জাতীয় সাহিত্যের প্রতি এতদূর আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। (৩)। উদাহরণ স্বরূপ পাঠকগণ মানব সমাজের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদের কথা একবার স্মরণ করুন। এই গ্রন্থে মানব সমাজের প্রাথমিক অবস্থা যেরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে; কোন ইতিহাস গ্রন্থে সেরূপ হইত এমন আমাদের বিশ্বাস নাই। সেই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই বলিয়া আর্য্যগণকে অনাস্থা প্রদর্শন করা যাহাদের ব্যবসায় আমাদের তাহাদের সহিত সহানুভূতি অত্যল্প। এই সকল ভ্রান্ত ব্যক্তি মুসলমান কালে ভারতের ইতিহাস আছে বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হন; কিন্তু জাতীয় সাহিত্য পাঠ ব্যতিরিক্ত ইতিহাস পাঠ কিরূপ

(৩) Vide Green's History of the English people.

ভ্রান্তিপ্রদ তাহা তাঁহারা চণ্ডীমঙ্গল পাঠেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। সকলেই জানেন মহামতি আকবার সাহের শাসনকাল ভারতের রামরাজ্যের সময়, কিন্তু সেই সময়েই অত্যাচারে মানুষকে বাস্তভিঠা ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে হইয়াছিল, একথা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। (৪)

এই সূত্র অনুসারে জাতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক গ্রন্থেরই একটা মূল্য আছে, প্রত্যেকেই জাতীয় ইতিহাসের এক একখানা পৃষ্ঠা কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থকে আর একটু অধিক স্বত্ব আমরা দিতে প্রস্তুত। আমরা ইহাতে জাতীয় ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা না বলিয়া একটি পরিচ্ছেদ আখ্যাদিতে প্রস্তুত। বস্তুত ইহাকে ১৬শ শতাব্দির প্রারম্ভীয় এবং ১৭শ শতাব্দির আদ্যভাগীয় সমাজের ইতিহাস বলিলেও অতিবাদ দোষে দুষ্ট হইতে হয় না। মুকুন্দরাম সাম্রাজ্য সম্পৎ-পরি-বেষ্টিত সমাজানভিজ্ঞ আমির ওমরা ও ছিলেন না, কিম্বা সংসার বিরাগী বিজনবাসী যতিও ছিলেন না। তিনি সমাজের সুখদুঃখ ভোগী যথার্থজ্ঞ একজন সমাজিক মানব ছিলেন। তাৎকালিক ঘটনাচক্রের নিষ্পেষনে তাঁহাকে সপরিবারে বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছিল, কাজেই তাঁহার কবিতা তদীয় হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। তিনি নিজে দুঃখের চরম সীমায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; অতএব দুঃখের অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে তিনি আপনার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন। কাজেই তাঁহার বর্ণনা স্বভাবানুসারিণী এবং সারল্যময়ী হইত। এদিকে আবার তিনি নিজে অত্যাচার পীড়িত বঙ্গীয় প্রজার মধ্যে দশজনের একজন, কাজেই তাঁহার লেখনী তাৎকালিক প্রজাসাধারণের অবস্থাই বর্ণনা করিয়া বসিত। এই জন্যই আমরা তাঁহার গ্রন্থকে তাঁহার সময়ের ইতিহাস আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হই নাই।

ক্রমশঃ

---

(৪) পাঠক "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ টি"—আর একবার পাঠ করিবেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

নরনারী তত্ত্ব। শ্রীধীরেন্দ্র নাথ পাল প্রণীত। ১৩নং জোড়া বাগান ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বেদান্ত প্রেশ, কলিকাতা।

এই ১২ বার পেজি ডিমাই পুস্তকের ১৬১ পৃষ্ঠায় ৫২টী বিষয় লিখিত হইয়াছে। সুতরাং গড়ে কোনটীই ৩ পৃষ্ঠার অধিক নহে। সাধারণতঃ পুস্তকখানি ইংরাজি (Social Science) নামক পুস্তকের অনুবাদ, সুতরাং বাঙ্গালা সমাজের সহিত তাহার কোন বিশেষ সংশ্রব নাই—ইংরাজ সমাজের ন্যায় আমাদের দেশীয় সমাজ অধঃপাতে যায় নাই—বোধ হয় যাইবেও না। ইংরাজকে বাঙ্গালি সাজাইলে যেমন মানায় না, এই ইংরাজিসমাজ বাঙ্গালি সমাজে ঢুকাইতে গিয়া সেইরূপ খিচুড়ি হইয়াছে।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে "আমরা সকলেই আমাদিগের পরিচিত ও জ্ঞাত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনকে এই পীড়ায় (উপদংশ) একেবারে অধঃপাতে যাইতে দেখিয়াছি" কিন্তু একথা কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? পল্লীগ্রামে বেশ্যা সংখ্যা অতি কম, নাই বলিলেও হয়। যাহা আছে তাহা কেবল সহরে,—নাগরীক বারবনিতা প্রতিপালকদিগের মধ্যে কাহার কাহার উক্ত ব্যাধি আছে বলিয়া কি বলিব, যে শতকরা ৭৫ জন উক্ত পীড়া ভোগ করিতেছেন? পল্লীগ্রামে হাজার করা এক জনও উক্ত পীড়াক্রান্ত আছেন কি না সন্দেহ। জানি না গ্রন্থকারের পরিচিত ও জ্ঞাত ব্যক্তিরা কিরূপ লোক।

গ্রন্থকার কলিকাতার বেশ্যাদিগের একটী প্রকাণ্ড বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা লজ্জার মুণ্ড চর্ব্বণ করিয়া তাহার আর কি সমালোচনা করিব, তবে একটী স্থলে দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "দোকানদারদিগের রক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে "বাড়ীওয়ালী" আছে—ইহারা নীজ দেশস্থ আত্মীয়গণের নিকট হইতে কন্যা চাহিয়া

লইয়া আইসে, বলে যে,তোমরা খাওয়াইতে পারিতেছ না,আমার সন্তানাদি কিছুই নাই, ইহাকে আমায় দাও, আমার নিকট যত্নে রাখিব। মাতার হয়ত এইরূপ ৫টী কন্যা—তাহাতে আবার তাহারা অতিশয় দরিদ্র, সুতরাং আনন্দিতচিত্তেই এরূপ উপকারিণীর হস্তে কন্যাকে ছাড়িয়া দেয়। হায়! তাহারা যদি যুনাক্ষরেও জানিতে পারে যে তাহারা কি উদ্দেশ্যে চলিল, তাহা হইলে কি তাহারা কখন কন্যা পাঠাইয়া দেয়।" গ্রন্থকারের মতে তাহারা বালিকাদিগকে "বাল বারবনিতা বৃত্তি" (Clandestine Prostitution) শিক্ষা দিয়া অর্থোপার্জ্জন করে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে গ্রন্থকারের এ অলিক স্বপ্ন কেন? কোন মাতা তাঁহার এরূপ সর্ব্বনাশকারী আত্মীয়কে আপন কন্যা প্রতিপালন করিতে দেয়? একে ত এদেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত। ৯ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে বিবাহ হয়। সাধারণতঃ পল্লিগ্রামে ৭। ৮ বৎসর বয়সকালে বিবাহ হয়—যাহাদের সঙ্গতী নাই, তাহারা নবমী বর্ষিণা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রতিপালনের জন্য না পাঠাইয়া কেন যে কলিকাতায় প্রতিপালনের জন্য পাঠাইবে তাহা বুঝিলাম না। আর যদি নিতান্ত পক্ষে পাঠায়, তাহা হইলে অতি নিকট আত্মীয় ব্যতীত অপর কাহার নিকট নয়—যথা মাসী, পিসি ইত্যাদি, ইহাও নিতান্ত বিরল,—আর মাসী, পিসি হইয়া এমন সর্ব্বনাশ করিবে। সোনার ভারতে—হীরার বঙ্গে কি এ দুর্দ্দশা হইয়াছে?

আমাদের বোধ হয় গ্রন্থকারের বঙ্গদেশকে বিলাত বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, সেই জন্য এ কথা লিখিয়াছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে ধীরেন্দ্র বাবু না বুঝিয়া সুঝিয়া এমন কথা লিখিবেন না। ইহাতে আমাদের দেশের কলঙ্ক আছে। বেশ্যার কন্যাগণ বাল বারবনিতা হইতে পারে,—আদরের ধন সোনার-বঙ্গ-ললনা অন্নাভাবে বাল বারবনিতা হইবে, আত্মীয়ের নিকট প্রতিপালিত হইতে যাইয়া বেশ্যাবৃত্তি শিক্ষা করিবে, এমন দিন বঙ্গে আসে নাই, ঈশ্বর করুন কখন না আসুক।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (ফ্রান্সে) অনেক ভদ্র মহিলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুকুর বা বিড়াল দ্বারা * * * করিয়া থাকেন।" যাহা শুনিলে পাপ হয়,

সে সকল কথা জানি না ধীরেন্দ্র বাবু কি শুভ সাধনের জন্য লিখিয়া আপন লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন। যে সকল মহিলারা পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়া তাহাদের পবিত্র চক্ষে এ সকল কলঙ্ক পূর্ণ চিত্র দেখাইবার আবশ্যক নাই, এবং যিনি দেখাইতে ইচ্ছুক, তিনি সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ।

পরিশেষে বক্তব্য যে "অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের উপায়" শীর্ষক যে প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন। গ্রন্থকার নূতন ধরনের এমন কতকগুলি বেশ্যার সৃষ্টি করিতে চান, যাহারা সমাজে থাকিতে পাইবে। সমাজ কি বাড়ি ঘর না কি, যে বেশ্যা তাহাতে থাকিবে? তিনি এই বেশ্যাগণের জন্য গুটিকত নিয়ম করিয়াছেন, বস্তুত তাহা পাঠ করিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। কেবল মাত্র অবিবাহিত পুরুষগণই সেই সকল বেশ্যার নিকট গতায়াত করিবেন। গ্রন্থকার শুধু পুস্তক লিখিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, আবার আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া যাহাতে গভর্ণমেণ্টের তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা হইতেছে। ধন্য উদ্যম। আমরা কবে "ধীরেনীবিলের" আন্দোলন দেখিব জানি না।

ধীরেন বাবুর নাটক নভেলের পরিবর্ত্তে সমাজতত্ত্ব লিখিবার ইচ্ছাকে আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু তিনি শিব গড়িতে বানর গড়েন ইহাই দুঃখ।

আর একটী কথা,—পুস্তকখানির নাম "নব নারীতত্ত্ব" এখানি সাধারণ "নব নারীতত্ত্ব" বা কলিকাতার—নব নারীতত্ত্ব? গ্রন্থকারের মতে কলিকাতাটাই যেন সমগ্র ভারতবর্ষ, কলিকাতার উন্নতি হইলেই যেন ভারতের উন্নতি হইল। (Social Science) লেখক যেমন এক লণ্ডন লইয়া লিখিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে ফ্রান্সের কথা আছে, এখানিতেও তেমনি কলিকাতা এবং রাশি রাশি লণ্ডন ও ফ্রান্সের কথা। লণ্ডনে (Social Science) এর মত একখানি পুস্তক লেখার আবশ্যক থাকিতে পারে এবং হয়ত সেই জন্যই তাহা লিখিত হইয়াছিল কিন্তু এরূপ "নব নারীতত্ত্ব" কেন? রোগ থাকিলে ত তাহার প্রতিবিধান, বিনা রোগে ঔষধ প্রয়োগ করা কোন জীবকের অভিপ্রেত তাহা জানি না। আত্মবিহার (Self Pollusion) ইত্যাদির কথা আমাদের দেশের মহিলারা অজ্ঞাত বলিলেও হয়, সে স্থলে এরূপ

জঘন্য পুস্তক প্রকাশ করিয়া মহিলাদিগকে সেই কুৎসিত বৃত্তির আভাস প্রদান করা গুরুতর পাপ। বেশ্যাগণ সমাজের কলঙ্ক—দেশের—কলঙ্ক আমরা তাহাদের কথা শুনিতে চাহি না, যদ্যপি বেশ্যাদিগকে উন্নীত করা ধীরেণ বাবুর উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক বেশ্যাবাটীতে যাইয়া তাহাদিগকে লেক্‌চার দিন—পুস্তক দিন—ভাল করুন—ক্ষতি নাই, বরং প্রসংশা করিব, কিন্তু এ কি,—বেশ্যার কথা ভদ্র সমাজে কেন? কোন ভদ্র মহিলা ইহা পাঠ করিয়া লজ্জিত না হইবেন? আর যে সকল পুস্তক সাধারণের, বিশেষতঃ মহিলাদিগের জন্য লিখিত, তাহাতে এ সকল জঘন্য কথা লিখিতে নাই—এরূপ বেশ্যা বিবরণ পাঠ করা, আর বেশ্যার সহিত আলাপ করা, একই কথা। ভদ্র মহিলারা যেন নাসিকায় বসন প্রদান করিয়া এরূপ পুস্তকের নিকট হইতে দূরে পলায়ণ করেন।

আমরা সকল অপেক্ষা সমাজের পক্ষপাতী, সমাজের উপর অন্যায় দোষারোপ সহ্য হয় না, মহিলাদিগকে অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে বড়ই দুঃখ হয়, তাই এত কথা লিখিলাম, নতুবা লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া এত কথা লিখিয়া আদরিণীর অঙ্গ কলুষিত করিতাম না।

উপসংহারে বক্তব্য যে ধীরেন বাবু বঙ্গভাষার উপর বড় চটা, কেন, তাহা তিনিই জানেন। নিজে অভাগিনী বঙ্গভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিব না এবং আবশ্যক মতে সাধারণেরও ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে না, এ কথাও বলিব। হায় রে পিঁচুটী নয়না বঙ্গভাষা, তোমার কপালে যে আরও কত দুর্গতি আছে তাহা কে জানে।

জীবন কয় দিন ?

মনুষ্য জীবনের ন্যায ক্ষণস্থায়ী বস্তু ইহ জগতে আব কিছুই নাই। তথাপি মানব সেই অল্প প্রাণ লইয়া ইহ-জগতে কি অচল দাম্ভিকতাব পরিচয না দিতেছে। প্রত্যেক যুবককে জিজ্ঞাসা কর তুমি তোমাব এই জীবনে কত আত্মীয শূন্য হইয়াছ, বোধ হয প্রত্যেকেই উত্তর দিবেন—অনেক। তোমাব চক্ষের উপব দিযা প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক মর্ত্তধাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে তাহাব স্থিবতা কি ? তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত আছ। ইহ সংসাব হইতে, সাংসারিক মায়া পাশ ছিন্ন কবিয়া আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, কলত্রাদিকে কাঁদাইয়া, সাধেব সংসাব ফেলিয়া যে তোমায় এক দিন কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে হইবে তাহাতে কি সন্দেহ আছে ? কিন্তু তুমি তাহা ভাব কই ? তুমি অবিনশ্বর জীবন পাইয়াছ ভাবিয়া অবিনশ্বব কার্য্য কবিতে অগ্রসব,—ধন্য মনুষ্য, ধন্য তোমার ভ্রম !

শেষেব সেই দিন কি ভয়ঙ্কর, এই আজন্ম প্রতিপালিত সংসার ত্যাগ করিতে হইবে, প্রাণেব প্রিয়জনকে পবিহার কবিতে হইবে, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিবে না। তোমার ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইবে, "কোথায় যাইতেছ—কাহার নিকট যাইতেছ, ভাবিয়া আকুল হইবে। এখানে কোমল শিবিশ সয্যা ব্যতীত শয়ন হয় না, আত্মীযবর্গ নিকটে না থাকিলে প্রাণ হু হু করিতে থাকে, কিন্তু সেখানে কি আছে, তাহা কে বলিবে ? এ সকল প্রত্যহ দেখি—প্রত্যহ শুনি, সোজ বুঝি, কিন্তু বুঝিয়াও কোন ফল হয় না কেন ? আকাশে সন্ধ্যাকালে অগণ্য নক্ষত্র দেখি—আবার ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে বিলীন হইতে দেখি, বৃক্ষে কত পত্র, কিন্তু সময়ে সে সকল ঝরিয়া গিয়া নূতন পত্রাবলী হয়, মনুষ্যেব দৈনিক হ্রাস দেখি, আবার নূতন সৃষ্টিও হয়। এ সকল হইবাব কারণ কি ?

কারণ, বড় কঠিন ব্যাপার, তাহার মীমাংসা এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে

পারেন নাই, সম্ভবতঃ পারিবেনও না, কিন্তু এ সকল প্রত্যক্ষ নিত্য দর্শন সত্ত্বেও মনুষ্য কেন এত উদাস? মানব কেন আপন হারাইয়া যায়, কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হয়?

মনুষ্য যে কবে মরিবে, কবে ইহ সংসার ত্যাগ করিবে তাহার স্থিরতা নাই, আপন আপন কার্য্য সমাধা করিয়া সকলকেই ইহ সংসার ত্যাগ করিতে হইবে, তবে মনুষ্য মাত্রকেই যে মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ কি?

মনুষ্যের জন্ম পরিগ্রহ করিবার মুখ্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলেও যে কোন উদ্দেশ্য অবশ্য আছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আত্মার, স্বদেশের, সংসারের উন্নতি করাই যে মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমরা তাহার কি করিয়া থাকি?

সাধারণতঃ সকল মনুষ্যই আপনার উন্নতি বা প্রতিপত্তি সাধনার জন্য সকল মস্তকেই পদাঘাত করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু সেই "আপনার" শব্দের অর্থ কি? আমি ও আমার পরিবারবর্গ প্রতিপত্তি লাভ করিবে, সুখ সম্ভোগ করিবে, এই আশায়, এই সাধনায় আমি পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই, পরের সন্তানকে কাঁদাইয়া আপন প্রিয় কুমারকে হাসাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু কে এই সংসারে কয় দিন আছে?

যোগবল, অধ্যাত্মিকবল, আত্মপরিচনাবল ইত্যাদি দেখিয়া আমার, পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, পরলোক না মানিয়া অনেকে শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড় হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরলোক নাই তাহা কিসে জানিলে ভাই? যদি না থাকে ক্ষতিনাই, কিন্তু যদি থাকে? তুমিত আজি পরের সন্তানকে কাঁদাইয়া আপন সন্তানকে হাসাইলে, সে কেবল ঈশ্বরকে ডাকিয়া, সাক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, ইহাতেই তাহার ঘোর বৈরনির্য্যাতন হইল। আবার দেখিতে দেখিতে তোমার সন্তান, তোমার সাধের সন্তান, তোমায় কাঁদাইয়া চলিয়া গেল, তুমি যদি পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার না কর তাহা হইলে আপাততঃ শুদ্ধ পুত্র শোক ভোগ করিলে বটে, কিন্তু যদি পরলোক থাকে, তবে কি হইবে? সেখানে আবার কি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখ দেখি, সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের কি প্রতিফল পাইবে না? পাইতেই হইবে, তবে কেন

মানব তুমি এত উন্মত্ত ? মায়াজাল সংসারীকে এত দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করিয়াছে যে সংসারী আত্মজ্ঞান হারাইয়াছে, সকল বিষয় বুঝিয়া, চক্ষের উপর দেখিয়াও তাহার প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হয়না। যদ্যপি মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন হইয়া সকল কার্য্য করে তাহা হইলে সংসারই স্বর্গ বলিয়া গণ্য হয়। সংসারের তুল্য সুখের স্থান আর নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু কে তাহা বুঝিবে, কে তাহা করিবে ? সকলেই স্বার্থের দাস, স্বার্থ স্বার্থ করিয়া সকলেই পাগল, স্বার্থানুসন্ধানে সকলেই রত—অধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী পত পত শব্দে উড্ডীন হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মের ভেরী নীরব প্রায়। সংসার দিনে দিনে ঘোর নরকপ্রায় হইয়া উঠিল। কিন্তু এরূপ কেন হয় বলিতে পার কি ?

এ জগতে স্থায়ী বলিতে কিছুই নাই, সমুদ্রও শুকায়, আবার প্রচণ্ড অচলও সাগর গর্ভে পতিত হইয়া তাহার চিহ্ন মাত্র রাখেনা, সেই স্থান মহাসাগরে পরিণত হয়। তাই বলি সংসারে স্থায়ী বস্তু নাই—বিশেষতঃ মনুষ্য জীবন—ইহার তুল্য ক্ষণ স্থায়ী পদার্থ আর কিছুই নাই—কিন্তু মনুষ্য ভ্রমেও তাহা চিন্তা করেনা আপন জীবন অক্ষয় ভাবিয়া সকল কার্য্যে ব্রতী হয়— ধন্য মানব! ধন্য তোমার সাহস!—কিন্তু যে দিন মানব বুঝিবে যে এ জীবন কিছুই নহে, জল বুদ্বুদ মাত্র, পদ্মপত্র স্থিত সলিলবৎ চঞ্চল, সেই দিন সংসারী মাত্রেই সুখের মুখ দেখিবে, সেই দিন সকলেই বলিবে "আর কেন—আর কেন পরানিষ্ট চেষ্টা, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার,—এই ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য জীবন কয় দিন ?"

নারী সঙ্গীত।

১

মায়া দয়া শান্তি সুখ স্নেহ ভালবাসা,
বিধাতার কল্পনার সার,
নিরমিলে নিরজনে মিটাইয়া আশা।
স্নেহময়ী নারী অবতার।
মরুভূমে তৃণচয়, শুষ্ক কাষ্ঠ পুষ্পময়,
হ'লে পরে যে সুখ উদয়;
পেয়ে নারী এ ভুবনে, সুখী সবে জগজ্জনে,
প্রেমময়ী রমণী হৃদয়।

২

প্রেম আশা, প্রেম কায়া, প্রেম হৃদি, প্রেম ছায়া,
প্রেমময়ী প্রেম-স্বরূপিনী,
প্রেমে স্বর্গ, প্রেমে সুখ, প্রেম ছাড়া সুধু দুখ,
প্রেমরূপী তুমি লো রমণী।

৩

প্রেম বিনা অসার অবনী,
প্রেম ছাড়া সুখ নাহি কার,
প্রেম শূন্য কেহ নাহি জানি;
থাকে যদি সে হৃদি অসার,
সেই প্রেম অনন্ত অপার,
শিখাইতে আইলা রমণী।

৪

দিব বলি হৃদয় আমার,
ছুটে গিয়ে নারীর চরণে,
প্রেম শূন্য যদি তাহা, প্রাণ শূন্য তবে কায়া
কেন নাহি হবে লো ভুবনে।
রমণী রমণী মণি, মর্ত্তে প্রেমস্বরূপিনী,
আমি তব প্রণযের দাস ;
তুমি নব জীবন রূপিনী,
মর্ত্ত ভূমে দেবী পরকাশ।

৫

তুমি না থাকিলে পরে—দয়ার কল্পনা—জানিত না নরে,
না থাকিত মর্ত্তভূমে—সুখের বাসনা—হৃদয় মাঝারে।
হ'ত তাহা মরুভূম মত,
বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, তৃণ হীন,
হ'ত তাহা আঁধারে নিহত,
অমানিশা মতন মলিন।
আঁধার জীবন তার, সুখ হীন অনিবার,
যে হৃদয়ে করে না বিহার,
রমণী সুধাংশু মণি—করুণা অপার!

৬

তুমি না থাকিলে পরে—কবির কল্পনা
হ'ত না বিকাশ।
জন্মিত না সেক্ষপীর,
বাহিত না প্রেম নীর,
দেখিতে না ভবভূতী,
দেখিতে না বিদ্যাপতি,
দেখিতে না জয়দেব, প্রিয় কালিদাস।

প্রণয় কাহিনী যত, আঁধারেতে আবরিত,
কি ছাই পড়িতে নর? হইতে নিরাশ,
রহিত জ্ঞানের তিন ভাগ অপ্রকাশ।

৭

কোথা পেতে বঙ্কিমের তর তর ভাষা,
কেমনে মিটাত মধু তোমার পিপাসা?
কেমনে গাহিত হেম, দেখা যেত বিনে প্রেম,
দেখা যেন নবীনের ছাঁত্রুনীর ছটা,
দেখা যেত অক্ষয়ের ত্রাস খেলা ঘটা।
যদি না থাকিত নারী, দূরে যেত জারি জুরি,
বাতাসে উড়িয়া যেত কল্পনার নাম,
কবির স্ফূরণ পেত অনন্ত বিরাম।

৮

তবু নর বুঝ নাকি তুমি,
কি যে নিধি রমণী ভুবনে,
বুঝ নাকি কত সুখ তার,
সুখী সেই প্রেম-পরশনে।

৯

কিন্তু তুমি নিরেট পাষাণ—বুঝিবে না তাহা,
বুঝিবে না, নারীর জীবন—তার দয়া মায়া।
ভাব তুমি দাসী মাত্র তারে—ভোগ বিলাসিনী,
কাম পিপাসার নীর, সংসার মাঝারে—নয়ন রঞ্জিনী।

১০

এখনও হৃদয় পটে রয়েছে অঙ্কিত,
ভাব না কি সেই মুখ গুলি,
পশিল অনল মাঝে অকুণ্ঠিত চিত,
সংসারের সব মায়া ভুলি।

চিতোরের সেই কথা, সেই প্রেমিকেব ব্যথা,
মনে যদি না হয় উদিত,
বুঝিবি না রে মানষ বমণীর চিত।

১১

বুঝিবি না তুই দাস পবাধীন নব,
পব হস্তে যেন মেষ পাল,
বুঝিতে পাবিতে, হ'লে তুমি বীববব,
বমণীব প্র[illegible] বিশাল।

১২

বীব ভাগ্যে বসুন্ধবা, বীব হৃদি প্রেম ভবা,
বীব অঙ্কে শোভে প্রণয়িনী।
বীব যেই জানে সেই, এ ধরায সুখ নেই,
বিনা যাব হৃদয় অমল—
প্রেম পবশনে কভু হযেছে শীতল।
জানে সেই প্রণয কেমন,
জানে সেই বমণী কি ধন,
জানে প্রেমে সুধা ঝরে, পোডা প্রাণ সুখী কবে,
বমণী প্রণয় নহে অলীক স্বপন,
শান্তিব অমৃত ফল, ত্রিদিব-বতন।

১৩

বীব দর্পে রণ স্থলে, পশে বটে কুতুহলে,
কিন্তু মনে যাগে সেই ছবি,
পবিত্র রমণী মণি, মর্ত্তে প্রেম স্বরূপিণী,
মানস সবসে স্ফূট কমল রূপিণী।

১৪

মনে পড়ে—সে কমল মুখ,
মনে পড়ে—প্রণয় বারতা।
ভুলে যায়—যাতনার দুঃখ,
স্মরি তার—প্রেম গভীরতা।

১৫

মনে হয়—বিদায়ের কালে,—কাকুতি মিনতি,
স্নেহ পূর্ণ—প্রেম আলিঙ্গনে,—দিলা যবে সতী।
মরি মরি—ছল ছল কঁদেনী-সে নয়ন দুটী,
ধীরে যেন—মুক্তাফল ঝরে,—কি বা পরিপাটী।

১৬

ঘোর অস্ত্র প্রহরণে, ক্ষত দেহ যবে রণে,
মনে পড়ে সেই মুখ খানি,
মনে পড়ে প্রাণ জায়া, সেই প্রেম স্নেহ মায়া,
কেঁদে উঠে মানস তখন।
চায় প্রাণ সেই দরশন।
সেই কর প্রলেপনে, কি যে সুখ সেই জানে,
যেই জন ভুগেছে কখন,
জানে যেই সেই আস্বাদন।

১৭

দূরে যাক বীরের বারতা,
বলি ভীরু শুন তবে ভাই,
সেই দিন সেই ক্ষণ, প্রাণ যবে উচাটন,
রোগে শোকে হইয়া আকুল,
বসিয়া শিয়র দেশে, প্রিয়ে যবে তব পাশে,
লভ কিবা আনন্দ অতুল!

১৮

যাও নাই দূর দেশান্তরে,
ভোগ নাই বিদেশ যাতনা,
জান না কি সুখী তুমি ঘরে,
সহ সেই পতিগত প্রাণা।
জানিতে যদ্যপি নর, আকুল হ'ত অন্তর,
বুঝিতে মানবী মন কত প্রেম ধরে,
বুঝিতে রমণী সুখে সুখী ভবে নরে।

১৯

জননীর স্নেহ মায়া অক্ষয় রতন,—নিখিল মাঝারে,
সেই সুখী ভাগ্যধর জন,—মাতা যার বিরাজে সংসারে।

২০

মনে পড়ে বাল্য কাল, তব স্নেহ মায়া,
মনে পড়ে জননী গো, তোমার যতন,
মনে পড়ে শৈশবের সেই সুখ ছায়া,
দুঃখের অবনী মাঝে স্বরগ স্বপন।

২১

সকলে স্বার্থের দাস স্বার্থ ভরা মন,
জগতের যত জন স্বার্থ সবে মাগে,
কিন্তু জানি হায় তব স্নেহ ভরা মন,
নিস্বার্থ ভাবেতে ভরা স্নেহ অনুরাগে।

২২

রে বিধাতঃ কর মোরে বালক আবার,
জননী কোমল কোলে, পশি গিয়ে কুতূহলে,
কুটিল সংসার মায়া ভুলি দুঃখ তার।
জ্ঞানের বিমল জ্যোতি, প্রতিভার ক্ষর ভাতি,
চাহি নাক, কর মোরে অজ্ঞান আবার,
নাচি হাসি খেলা করি কোলে গিয়ে মার।

২৩

না না তা হবে না আর,
সে দিন হয়েছে গত, ইহ জনমের মত,
এখন সহিতে হবে অদৃষ্ট তাড়না,
সহিতে হইবে শত সংসার যাতনা।
দুরাশার ঝঞ্ঝাবাতে, শত ঘাত প্রতিঘাতে,
সহিব মনেতে কত মনের বেদনা,
রহিবে মনেতে তাহা পরে জানিবে না।

২৪

স্নেহময়ী ভগিনী রতন,—কারুণ্যের যেন অবতার,
ভাগ্য দোষে অলীক স্বপন,—সেই স্নেহ কল্পনার সার।

২৫

না না দূরে ধীকি ধীকি জ্বলে—দুইটী রতন,
দুটী তারা যেন কৃপা করে—পবিত্র জীবন।
স্বরগের পবিত্রতা মাখা,
স্নেহ মায়া মূর্ত্তিমতী তায়,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঁকা,
সে মাধুরী নিজ প্রতিভায়।
সোদরা প্রতিমা মম, স্নেহময়ী নিরুপম,
আছে দুটী জানি মনে মনে,
সুখী হই সে স্মৃতি স্মরণে।

২৬

অন্ধকার ঘন ঘটা ভরে,
ভাবি যবে ধরা শূন্যময়,
নিবিড় হৃদয়াকাশে, ধীরে ধীরে পরকাশে,
সুখদ নীরদ সনে সুচারু শোভায়,
দুইটী বিজলী ছটা ভুলাতে আমায়।

২৭

যত কাল রহিবে জীবন,—ধীরে নাচিবে ধমনী,
বিরাজিবে হৃদে অনুক্ষণ,—দুটী ত্রিদিবের মণি।
হৃদয়েতে রহিবে সে স্মৃতি,—যত দিন রহিবে এ প্রাণ,
রমণীর স্নেহ মায়া কত,—মনে মনে করিব ধেয়ান।

২৮

সংসার অবির বাণে, ত্রাহি ত্রাহি যবে প্রাণে,
পাইয়াছি একটী রতন,
পুত প্রণয়ের ধার, জানি যার প্রেমাধার
যার তরে বুঝিয়াছি নারীর যতন।
বুঝিয়াছি রমণীর ভালবাসা কত,
বুঝিয়াছি রমণীর প্রেমভরা চিত,
বুঝিয়াছি মনে সার, নারী সুখে এ সংসার
শ্বাপদ শঙ্কুল ভবে নারী মাত্র সার।
নারী প্রেম, নারী নিধি গড়েছে যতনে বিধি,
নর হৃদি বেদনার করুনা আধার,
রচনা মহিমা তাঁর কবিতে প্রচার।

২৯

এস তবে নারী গীত করি সমাপন,
আয় প্রিয়ে সুখে তোরে করি আলিঙ্গন,
এক দৃষ্টে শূন্য মনে চাহি তোর মুখ পানে,
দেখি সেথা কত সুখ কত ভালবাসা,
কত মায়া কত স্নেহ কত সুখ আশা।
গোপনে রয়েছে আঁকা, দেখি প্রিয়ে, দেখা দেখা
কবির কল্পনা সেথা পশিতে না পায়,
গায়রে নীরব কবি, নীরব ভাষায়।

———

কুসুমিকা।

নবম পরিচ্ছেদ।

ধনাধিকার।

বৃদ্ধের অন্তেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপিত হইলে, কুসুমিকার স্মরণ হইল যে গৃহের উত্তর দিকের মেজেয় যাহা আছে তাহা বৃদ্ধ আমায় লইতে বলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে কি আছে দেখা যাউক। এই ভাবিয়া, তাহার একটী অতি বিশ্বাসিনী প্রিয় দাসী ছিল তাহার নাম মক্ষদা, মোক্ষদাকে তিনি "হাবি হাবি" বলিতেন,—সুতরা' বলিলেন "হাবি আমার সঙ্গে আয়ত।"

হাবি। কোথায় মা?

কুসুমিকা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কাশী যাবি?"

হাবি। না মিছে কথা।

কুসুমিকা বলিলেন "আয়।"

হাবি তাঁহার অনুসরণ করিল, বৃদ্ধ যে গৃহে মরিয়াছিলেন কুসুমিকা সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গল বদ্ধ করিয়া দিলেন। গৃহ মধ্যে একটী সাবল ছিল, তিনি সেই সাবলটী হাবিকে দিয়া বলিলেন "হাবি এই খান্‌টা খোঁড়।"

হাবি অবাক্ হইল, মারবেলের সুন্দর পদ্ম কাটা মেজে—সে মেজে নষ্ট করিতে কষ্ট হইতে লাগিল। খানিকটা খনন করিলে পর, একটী শব্দ হইল, হাবি মাটী সরাইয়া দেখিল ঘড়ার কানা, বলিল "মা ঘড়া আছে।"

কুসুমিকা ঘড়ার মুখ হইতে মৃত্তিকা সরাইয়া দেখিলেন ঘড়ার মুখ বদ্ধ, আবরণিটী উন্মুক্ত করিবা মাত্র দেখা গেল এক ঘড়া মোহর। কুসুমিকা

তাহার মুখ বন্ধ করিয়া আবার তাহার পার্শ্বে খনন করিয়া দেখিতে বলিলেন, আবার সেইরূপ শব্দ, এই রূপে পঁচিশটী ঘড়া পাওয়া গেল, পঁচিশটী ঘড়াই মোহর পূর্ণ। কুসুমিকা তখন বিমর্ষ ভাবে এত অর্থ লইয়া কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

কুসুমিকা আবার স্বামীর অনুসন্ধানের জন্য দেশে দেশে লোক পাঠাইলেন। বাটীর সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড শিবালয় সংস্থাপন করিলেন, এবং তাহা আপন নামে প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার দ্বার দেশে স্বর্ণাক্ষরে এই কয়টী কথা লিখিয়া দেওয়া হইল,—

ইষ্ট দেবতা
স্বামীর প্রীতি কামনায়
এই
মন্দির
তাঁহার স্ত্রী
শ্রীমতী কুসুমিকা দেবী কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হইল।
সন ১২৫১ সাল।

সেই মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড পান্থ নিবাস প্রস্তুত করা হইল, তাহা তাঁহার স্বামীর নামে প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং তাহার সম্মুখে স্বর্ণাক্ষরে এই কয়টী কথা লিখিত হইল,—

এই পান্থ-নিবাস
শ্রীমতী কুসুমিকা দেবীর
ইষ্টদেবতা—স্বামী
শ্রীযুক্ত হরিপদ দেবশর্ম্মণঃ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হইল।
সন ১২৫১ সাল।

বালুচরে ঔষধালয় ও বিদ্যালয় হইল। বিনা ব্যয়ে দারিদ্রেরা ঔষধ পাইতে লাগিল ও বালকেরা বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিল, সে সমস্তও হরিপদর নামে প্রতিষ্ঠিত হইল।

কুসুমিকা রাস্তা, ঘাট, জলাশয় প্রভৃতির বিশেষ সংস্কার করিয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহার দান অবারিত—দেশে তাঁহার যশ ধরে না। ইংরাজ বাহাদুর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাণী উপাধি দিতে প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু কুসুমিকা রাণী হইতে সম্মত হইলেন না। মনে করিলেন, যদি কখন হরিপদকে রাজা করিতে পারি তবে রাণী হইব, নতুবা নয়।

দেশ বিদেশ হইতে লোক প্রত্যাগত হইল, কিন্তু হরিপদর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। কুসুমিকার এ সমস্ত সুখ দিনে দিনে কণ্টক তুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি দিন দিন স্বামীর জন্য অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কুসুমিকা ভাল দ্রব্য আহার করিতেন না, মাটীতে শয়ন করিতেন, আর দিবা নিশি হা পতি যো পতি করিয়া কাঁদিতেন।

প্রতিবেশিনীরা আসিয়া তাঁহাকে কত প্রকার সান্ত্বনা করিতেন, কিন্তু কুসুমিকার তাহাতে হৃদয়ানল শান্ত না হইয়া দ্বিগুন জ্বলিয়া উঠিত। কুসুমিকা সমস্ত দিন বাতায়ন পথ হইতে পথের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, মনে করিতেন হয়ত হরিপদ এই পথ দিয়া যাইবেন, আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, আমি আমার প্রাণাধিককে পাইব। কিন্তু আশা আর পুরে না। দেখিতে দেখিতে প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, তথাপি হরিপদর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

হরিপদ।

আমাদের প্রথম পরিচিত বৃদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার পুত্রের শিষ্টালাপের কুফল বা সুফলে আজি কুসুমিকা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, তাঁহার বাটী হইতে বহির্গত হইয়া হরিপদ একেবারে লালগোলা যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় রাজসরকারে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনের একটী চাকরী পাইলেন,

চাকরী হইবা মাত্র হরিপদ হৃষ্ট চিত্ত হইলেন, এক মাসের বেতন পাইলেই কুসুমিকাকে আপনার নিকট আনিবেন, ইহাই স্থির হইল।

এ দিকে কুসুমিকা প্রস্থান করিলে ব্রাহ্মণ আপন গৃহিনী ও কন্যাকে তাহার প্রস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা কেহই প্রকৃত উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণ রাগভরে সকলকে যথোচিত তিরস্কার করায় কন্যা বলিয়া ফেলিল যে "তোমার ছেলে তাকে কি বলে ছিল, তাই হয়ত সে চলে গেছে।"

বৃদ্ধ তখন সকল কাহিনী বুঝিলেন, সন্তানকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন, এবং হরিপদ আসিলে তাঁহাকে কি বলিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন "সে তাহার স্বামীর নিকটই গিয়াছে, সে জন্য ভাবিতে হইবে না।"

বৃদ্ধ। তাহার স্বামী কোথায় গিয়াছে সে কথা কি বলিয়াছিল ?

গৃহিণী। আমাদের বলে নি বলিয়া কি আপনার স্ত্রীকেও বলে নি।

বৃদ্ধ কতকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এ দিকে হরিপদ এক মাসের বেতন ও সে মাসে আরও কিছু পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া কুসুমিকাকে লালগোলায় লইয়া আসিবেন বলিয়া হৃষ্টচিত্তে বৃদ্ধের বাসস্থানে গমন করিলেন। হরিপদকে দেখিয়া বৃদ্ধের বদন শুকাইল, বৃদ্ধের বদন ভাব দেখিয়া হরিপদ কোন বিপদ ঘটিয়াছে বুঝিলেন।

কেহ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, পরে হরিপদ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় এত বিষণ্ণ কেন ?"

বৃদ্ধ নিরুত্তর।

হরিপদ। কুসুমিকা কেমন আছে ?

বৃদ্ধ তথাপি নিরুত্তর।

হরিপদের চক্ষে জল আসিল, বলিলেন "তবে কি আমার কুসুমিকা নাই।"

তখন বৃদ্ধ উপায়ান্তর না দেখিয়া সকল কথা অকপট চিত্তে হরিপদকে বলিলেন। হরিপদ আকুল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধের সহিত আর একটী মাত্রও কথা না কহিয়া প্রস্থান করিলেন। আহা! হরিপদ আশা করিয়াছিলেন বুঝি এত দিনে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সকল আশাই বিফল হইল, তাঁহার জীবনে যত বিপদপাত হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা এইটীই ভীষণতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

হরিপদ পথে পথে কুসুমিকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন না। এক মুর্শিদাবাদে তিন মাস থাকিলেন, কিন্তু কোন সন্ধানই হইল না। পরে আপন দেশে গেলেন, তথায়ও সংবাদ নাই, তথা হইতে হরিপদ নানা দেশে ভিক্ষা অবলম্বনে কুসুমিকার অনুসন্ধানে রত হইলেন। দিবা নিশিই তাঁহার ক্রন্দনে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আশার সফলতা।

আজি প্রায় আট বৎসর অতীত হইতে চলিল হরিপদর কোন সংবাদ নাই, কুসুমিকার এখন বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর। যৌবনের মধুময় লালিত্য, অক্ষয় সৌন্দর্য্য, তাহার দেহের সর্ব্ব স্থানে যেন উছলিয়া উঠিতেছে, কিন্তু কি হইবে তাহাদের প্রতি কুসুমিকার লক্ষ্য নাই, এই মধুর যৌবনে কুসুমিকা এক বিষাদ অবলম্বনেই জীবন অতিবাহিত করিতেছে।

এক দিবস প্রাতঃকালে কুসুমিকা স্বীয় দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমি অদ্যই তীর্থ যাত্রায় গমন করিব, আমার বিষয় কার্য্য সমস্তই তুমি দেখিবে। দেব, দেবী, অতিথী সেবা প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য আছে তাহা যেন সুসম্পাদিত হয়।"

দেও। আপনি গেলে চলিবে কেন?

কুসু। আমি না থাকিলে কি কাজ চলে না?

দেও। বিশৃঙ্খলা হয়।

কুসু। না হয় তাহাই হইবে।

দেওয়ান আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। বলিলেন "কোথায় শুভাগমন হইবে?"

কুসু। স্থির নাই—

দেও। সঙ্গে কে কে যাইবে?

কুসু। লোকের আবশ্যক কি?

দেও। তাও কি হয় মা।

কুসু। তবে অতি অল্প লোক, দুইটী দাসী ও একটী দরবান।

দেও। অর্থ?

কুসু। যৎ সামান্য।

দেও। কত দিনে ফিরিবেন?

কুসু। ফিরিব কি না তাহার স্থির নাই।

দেওয়ান বুঝিলেন যে কুসুমিকার হৃদয় স্বামীর জন্য বিচলিত হইয়াছে। তিনিও কাঁদিলেন।

কুসু। তবে আমি চলিলাম।

দেওয়ান চমকিত হইয়া বলিলেন "এখনি!"

কুসু। এখনি।

কুসুমিকা শিবিকায় আরোহন করিলেন, পথের দুই পার্শ্ব দরিদ্রে ভরিয়া গেল, কুসুমিকা দুই হস্তে তাহাদিগকে মুদ্রা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুসুমিকা দরিদ্র কন্যা, দরিদ্র গৃহিণী, সুতরাং দারিদ্র কি তাহা তিনি বেশ জানিতেন, দরিদ্রের উপর তাঁহার বড় দয়া। কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে পারিতেছে না, কুসুমিকার ব্যবস্থা, কিন্তু সে কিছু পাইত না। কুসুমিকা বলিতেন "যাহার স্ত্রীকে অন্ন দিবার ক্ষমতা নাই, তাহার বিবাহ করা পাপ—মহাপাপ! সে বিবাহে দুঃখ ব্যতীত সুখের সম্ভাবনা বিরল, সুতরাং আমি কি জানিয়া শুনিয়া একটী ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিতে তাহার বিবাহ দেওয়াইয়া দিব।"

বালুচরের ঘাটে একটী সুন্দব বজবা ছিল, কুসুমিকা তাহাতে আরোহন করিলেন, কুসুমিকা এ সমস্ত আযোজন পূর্ব্ব হইতে গোপনে গোপনে করিয়াছিলেন। বজবা ছাড়িয়া দিল, যথা সময়ে বজবা আসিয়া কাশির মনিকর্ণিকার ঘাটে পৌঁছিল।

কুসুমিকাব প্রথম তীর্থ—মহাতীর্থ বাবাণসী, তিনি অতি যত্ন ও প্রগাঢ ভক্তি সহকাবে ৺ বিশ্বেশ্ববেব পূজা কবিলেন। এবং শ্রীমন্দিবের অনতি দূরে একটী পরিস্কাব বাসা ভাড়া লইয়া তথায় বাস কবিতে লাগিলেন।

কুসুমিকা প্রত্যহ বিশ্বেশ্ববেব পূজা কবিতে যাইতেন, শ্রীমন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে ভিক্ষুকেব সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইত, কেন না কুসুমিকা কখন কাহাকেও বিমুখ কবিতেন না। যথা সাধ্য সকলকেই দান কবা ছিল।

এক দিন কুসুমিকা পূজা সমাপন কবিযা আপন শিবিকায় আবোহন কবিতেছেন, হাবি ব্রাহ্মণ ও অপবাপবাকে দান দিতেছে, লক্ষ্মী নাম্নী দাসী কুসুমিকাব পার্শ্বে দণ্ডাযমানা, এমত সময় কুসুমিকা সহসা চমকিয়া উঠিলেন, যেন সংজ্ঞাভ্রষ্টা হইবাব উপক্রম হইল। লক্ষ্মী বলিল "কি মা, অমন কব কেন মা।"

সহসা লক্ষ্মীর হস্ত কুসুমিকাব গাত্রে পতিত হওযায় তাঁহার জ্ঞান পুনরুদিত হইল, বলিলেন "না।—দেখ্ লক্ষ্মী ঐ লোকটীকে বজরায় নিয়ে যা।"

লক্ষ্মী। কোন লোক,—যাকে হাবি টাকা দিচ্চে?

কুসু। হাঁ—

লক্ষ্মী। ও কে মা?

কুসুমিকার বদনে লজ্জাবঞ্জকচিহ্ন প্রতিভাত হইল, অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "তুই যানা।"

লক্ষ্মীর চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল, বলিল "মা আমি ছুটে যাই—আমি কি কবি মা, আমি যে আহ্লাদে মরে গেলাম।"

কুসুমিকাব দুই চক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল, বলিলেন "তাড়া তাড়ি কবিস্ নে,—এখন কিছু বলিস্ নে।"

লক্ষ্মী। না না,—আমি যাই—বাসায় যাবে না ?

কুসু। না।

দ্বারবান শিবিকার পার্শ্বে ছিল, সে আর কোন কথা না কহিয়া আহ্লাদে আপন শ্মশ্রুর শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল।

এতক্ষণে কুসুমিকা ভাবিলেন, যে হরিপদ জীবিত আছেন, এতক্ষণে তাঁহার শুষ্ক দেহতরু যেন নব রসে উত্তেজিত হইল। কুসুমিকা নির্নিমেষ-লোচনে অনেকক্ষণ তাঁহার প্রাণাধিক হরিপদবদিকে তাকাইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, শিবিকারোহণে বজরায় গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*:*—

মিলন।

লক্ষ্মীর আর হাসি ধরেনা, হাসিতে হাসিতে বলিল "ও হারি।"

হারি বিরক্ত হইয়া বলিল "কি লো ?"

লক্ষ্মী। নে—নে তোর থস্‌বাৎ বন্ধ কর।

হারি। কেন ?

লক্ষ্মী। কেন দেখবি চ.—টাকা চুরি করেছিস্ ?

হারি। ও মা, সে কি কথা, হাতে কুঠ মহাব্যাধি হোক, যদি চুরি করে থাকি।

লক্ষ্মী। ও বামুন ঠাকুর ?

হরিপদ চমকিত হইয়া বলিলেন "কি গা ?"

লক্ষ্মী। ফলার করবে ?—আমার মা বামুন ভোজন করাবে।

হরি। না।

লক্ষ্মী। না কেন ?

হরি। ইচ্ছা নাই—এই টাকা পেয়েছি, কিনে খাব এখন।

লক্ষ্মী। সে কি ঠাকুর, টাকা কি রোজ পাও, খেতে পাচ্চ খেয়ে নাও, টাকাটা কাল্ ভাঙ্গিও।

হরিপদ মনে মনে ভাবিলেন—মন্দ কি,—টাকার অনেক আবশ্যক, বিশেষতঃ কাপড় নাই।

লক্ষ্মী হরিপদকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল "আসুন।"

হরিপদ কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন "তবে চল।"

হাবি ও লক্ষ্মী চলিল, হবিপদ তাহাদেব অনুসবণ কবিলেন, সকলে বজবায় উঠিল। দ্বাবৰান হবিপদকে দেখিযা মহাসম্ভ্রমে উঠিযা দাঁডাইল, হরিপদ একবাব দ্বাববানটীব দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে মুখ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিল "যেন দায়া থাকে।"

হবিপদ হিন্দুস্থানী দ্বাববান ভদ্র হয়, তাহা জানিতেন না। তেবিয়া মেজাজ্, এত ঠাণ্ডা কেন? হবিপদ কোথাও দ্বাববান কর্ত্তৃক ভাল রূপে ব্যবহৃত হন নাই, কেবল এই মাত্র হইলেন।

লক্ষ্মী বলিল "আসুন, ভিতবে আসুন।"

হবিপদ ভিতবের কামরায় গেলেন।

লক্ষ্মী। এই বেণারসী জোড়টা পরুন।

হরি। এই গঙ্গা বক্ষে তোমাব দাণ গ্রহণ করিব?

লক্ষ্মী। করিবেন না?

হরি। না।

লক্ষ্মী। তবে আহার করুন।

এই বলিয়া নানা বিধ আহার্য্য সুবর্ণ থালে সজ্জিত করিয়া আনিয়া হরিপদর সম্মুখে ধবিল।

হরি। এ সকল কেন?

লক্ষ্মী। আপনার আহারের জন্য।

হরি। এই গঙ্গা বক্ষে।—আর তাহা না হইলেও খাইতাম না।

এই কথা বলিতে বলিতে হরিপদর চক্ষুদ্বয় সলিল পূর্ণ হইল।

লক্ষ্মী। আপনি কাঁদিতেছেন?

হরি। না।

লক্ষ্মী। না কি ?

হরি। সে অনেক কথা।

লক্ষ্মী হরিপদকে তাহা বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

লক্ষ্মীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে হরিপদ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলেন, শেষ শাশ্রুলোচনে বলিলেন যে "আমি আজ্ আট বৎসর ধরিয়া বঙ্গের সমস্ত স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি কিন্তু আমার কুসুমিকাকে কোথাও পাইলাম না।"

এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল "যৎকিঞ্চিৎ আহার করুন, তাহাতে দোষ নাই।"

হরি। না।

লক্ষ্মী। কেন ?

হরি। কেন। আমার কুসুমিকা হয়ত কোথাও উদরান্নের জন্য কষ্ট পাইতেছে, আর আমি স্বর্ণ পাত্রে এই সমস্ত রসনা তৃপ্তিকর আহার্য্য আহার করিব ? আহার না করিলে নয়, তাই করি, নচেৎবা কি আহার করিতে আছে।

হরিপদর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, অন্তরাল হইতে কুসুমিকাও কাঁদিলেন, মনে মনে বলিলেন "প্রাণেশ্বর। অনেক তপস্যা ব্যতীত তোমার ন্যায় স্বামী মিলে না।"

লক্ষ্মী। আহা অনেক টাকা পোন টোন দিয়ে বিয়ে করে ছিলে তা এমন হ'ল। তা বলি আর কিছু টাকার যোগাড় করতে পারেন না, তা হ'লে ফের বিয়ে হয়।

হরিপদ। আবার বিবাহ করিব ? আমার কুসুমিকা হয় ত হা স্বামী গো স্বামী করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া গিয়াছে,—আমি আবার বিবাহ করিয়া সেই প্রেমের অতুল বিনিময় দিব! এ ইচ্ছার পূর্ব্বে কি আমার মৃত্যু হইবে না ?

লক্ষ্মী মনে মনে হরিপদকে শত ধন্যবাদ দিল। কুসুমিকার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

লক্ষ্মী। আপনার স্ত্রী কি আপনাকে বড় ভাল বাস্‌তেন ?

হরিপদ তাহার প্রতিউত্তরে একটী মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

লক্ষ্মী। এখন আহার করুন।

হরিপদ। আবার ঐ কথা!

লক্ষ্মী মৃদু হাসিয়া বলিল "যার সে না হলে কি হয়, তোমার পিছনে কে দেখ দেখি, চিনিতে পার কি ?"

এই কথা বলিয়া সে তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

হরিপদ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,—চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "একি! একি। কুসুমিকা।। আমার প্রাণাধিকা কুসুমিকা।।!।

কুসুমিকা হরিপদর চরণ প্রান্তে পতিতা হইয়া বলিলেন "প্রাণেশ্বর। প্রাণাধিক।"

কুসুমিকা কাঁদিতে লাগিলেন, আনুপূর্ব্বিক দুঃখ কাহিনী সকল তাঁহার হৃদয়ে একবারে জাগরুক হইল,—মনে হইল "শুভক্ষণে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিল" ভাবিলেন "বিশ্বেশ্বর! শুভক্ষণে তোমার পূজা করিতে আসিয়া ছিলাম।"

হরিপদ কুসুমিকাকে বক্ষে ধারণ ও মুখ চুম্বন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দনে যত সুখ তত সুখ বুঝি আর কিছুতেই নাই— হরিপদ কুসুমিকাকে বক্ষে ধারণ করায় বোধ হইল যে তাঁহার বক্ষ যেন শীতল হইয়া যাইতেছে।

এত দিনের পর কুসুমিকার সুখের দিন আসিল। হরিপদর মনসাধ পুরিল।

দম্পতি যুগল সেই দিনই বালুচর যাত্রা করিলেন, যথা সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন, দেওয়ান প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ এ শুভ সংবাদ শ্রবণে যৎ-পরোনাস্তি পুলকিত হইলেন। প্রতিবেশিনীদিগের আনন্দের আর পরিসীমা নাই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিপালিকা কুসুমিকাকে পাইলেন, তাঁহার চির বিষণ্ণ বদনে হাসি দেখিলেন।

হরিপদ তথায় কিছু দিবস বাস ও বিষয় বিভবের নূতন করিয়া ব্যবস্থা করিয়া প্রাণাধিকা কুসুমিকাসহ স্বদেশে গেলেন, তথায় কেহই কুসুমিকার ঐশ্বর্য্যশালিনী হওয়ার সংবাদ পায় নাই, দেশস্থ লোক তাঁহা-

দিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখিয়া মহা আনন্দিত হইল,এবং সকলেই পরম আত্মীয় ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহারা কস্মিন কালেও হরিপদর বাটীতে যায় নাই—যাহার সহিত পথে মাথা ঠুকাঠুকি হইলেও কথা কহে নাই,তাহারা—"কোথায় ছিলে, এত দিন সংবাদ দিতে নাই, তুমি কেমন লোক গো, আমরা কত ভাবি" ইত্যাদি কত প্রকার আত্মীয়তা জ্ঞাপক কথা কহিয়া আত্মীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

হরিপদ সেই পৈতৃক ভিটায় একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তথায় কিছু দিবস বাস করিয়া পরে বালুচরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তারাবিহারীতে আর বাস করা হইল না। কারণ কুসুমিকা বৃদ্ধের মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে তিনি বালুচরে বাস করিবেন, সুতরাং তাহাই করিলেন।

হরিপদ স্থির করিলেন, তাঁহার যদ্যপি সন্তানাদি হয় তাহা হইলে তাহাদিগের একজন পিতৃভিটায় বাস করিবে। হরিপদর আশা কি পুরিল না? পুরিল বই কি—কিছু দিবস পরে সন্তান সন্ততীতে হরিপদর সাধের—সুখের সংসার পূর্ণ হইল। সেই অর্দ্ধস্ফুট কুন্দদন্তের চারু হাসিতে তাঁহাদিগের মন, প্রাণ, সংসারমায়ায় দিন দিন সমধিক বিমোহিত হইতে লাগিল। সুখের সংসার মহা সুখসাগরে ভাসিতে লাগিল।

সমাপ্ত।

কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই বাক্যের প্রমাণে আমাদের মনে এত কথা উদয় হইতেছে, যে আমরা কোনটি রাখিয়া কোনটি পাঠককে উপহার দিব ভাবিয়া আকুল। সকল কথা বিস্তৃত ভাবে বলিতে গেলে একখানি নাতিক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া বসিতে হয়। অতএব আমরা অতি সংক্ষেপে ২। ৪ কথা বলিয়া অদ্যকার মত নিরস্ত হইব। ভবিষ্যতে কবিকঙ্কণের আলোচনা (Study) সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আমাদের ইচ্ছা রহিল। পাঠক! যদি ষোড়শ শতাব্দীর এক খানি সুবিস্তৃত গ্রামের চিত্র দেখিতে চাও, তাহা হইলে গুজরাট নগরের বর্ণনা পাঠ কর। তাঁহার সময়ের একটী ভোজ দেখিতে চাও ত "খুল্লনার বন্ধন" এবং "ভোজ" এই দুইটী প্রবন্ধ পাঠ কর (৫) সে সময়ের সম্বন্ধ নির্ণয় এবং বিবাহ প্রভৃতি দেখিতে চাও ত খুল্লনার জন্য বরান্বেষণ এবং তাহার বিবাহ প্রভৃতি বর্ণনা পাঠ কর (৬)। এইরূপ তিনি সকল বর্ণনাতেই আপনার সম সাময়িক ঘটনা ও বস্তু নিচয়কে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। একবার গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই সকলে আমাদের এই কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

অনন্তর আমরা সংক্ষেপে পরবর্ত্তী কবি সমাজে এবং মাতৃভাষায় তাঁহার আধিপত্য প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই জন্য তদীয় পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী কবিদিগের পৃথক্ করণ নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের মতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কয়েকজন বৈষ্ণব কবি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কৃত্তিবাস তাঁহার সম-সাময়িক অথবা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তদ্ব্যতিরিক্ত

(৫) কবিকঙ্কণ চণ্ডী—পৃ (৪০২—৪১২)। অক্ষয় বাবুর সংস্করণ।
(৬) ঐ পৃ (৩০৩—৩০৪)।

সকল শাক্ত কবিই তাঁহার পর সাময়িক। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তদীয় "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়" বলিয়াছেন "কিন্তু ইঁহাদের (মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস) কথা বলিবার অগ্রে আর একটী কবির কথা সারিয়া রাখিতে চাহি। সেই কবির নাম ক্ষেমানন্দ। ইনি কবিকঙ্কণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।" (৭) সম্প্রতি বান্ধব পত্রিকার সুযোগ্য লেখক এবং আমার প্রিয় বন্ধু বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন; কিন্তু যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি এই মত সমর্থন করিতে চান তাহা আমার নিকট অকাট্য প্রতীয়মান না হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই (৮); কারণ ক্ষেমানন্দ অতি নিম্ন শ্রেণীর কবি এবং গননার অযোগ্য। আমরা প্রবন্ধান্তরে উপরোক্ত মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াশ পাইব।

পূর্ব্বে মুকুন্দরামের মৌলিকতার উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় কোন কবির রচনাকেই আপনার আদর্শ করেন নাই। তিনি যাহা কিছু অনুকরণ করিয়াছিলেন তাহা আপনার লেখা হইতে। পাঠক তাঁহার ঝড় বর্ণনা, ফুল্লরা এবং খুল্লনার বার মাসের দুঃখ বর্ণনা পাঠ করিয়া আমাদের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। এইরূপে কালিদাস রঘুবংশ এবং কুমার সম্ভবে পুর সুন্দরীগণের বর দর্শনের আগ্রহ কিরূপ এক ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। মুকুন্দরামের পরে কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসরের মধ্যে যত কবি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে তাঁহার নিকট ঋণী। রামেশ্বর হইতে ঘনরাম পর্য্যন্ত সকলেই তৎ প্রদর্শিত পথানুসারী হইয়া আপনাপন উপাস্য দেবতার আরাধনার পদ্ধতি এবং অবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভারতচন্দ্র তাঁহার নিকট এতদূর ঋণী যে তাঁহার "অন্নদা মঙ্গল" মুকুন্দরামের চণ্ডী মঙ্গলের অনুলিপি মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারত-

(৭) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা—পৃ ১০।

(৮) বান্ধব। ৬ষ্ঠ খণ্ড। পৃ ২০০।

চন্দ্রের কিছুমাত্র মৌলিকতা নাই, যে টুকু আছে, সে টুকু না থাকিলেই বঙ্গদেশের মঙ্গল হইত। ভারতচন্দ্রের এক গুণ এই, তিনি আদর্শের উপর কিছু সুন্দর রং দিতে পারিতেন। তাঁহার "সুন্দব" কালকেতু এবং ধনপতির বিশ্লিষ্ট উপকবণে গঠিত, তাহার মালিনীর বেসাতি দুর্ব্বলার বেসাতির অনুকরণ, দেবীর ঈশ্বর পাটনির নিকট পবিচয়, ফুল্লরার নিকট পরিচয়ের প্রতিরূপ। এইরূপ হর-পার্ব্বতী কোন্দল, বরবেশী শিব দর্শনে নগরবাসীগণের খেদ প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের কত উপকারে লাগিয়াছিল, পাঠকগণ একবার তুলনা করিয়া দেখিবেন। মুকুন্দরাম বঙ্গসাহিত্যের অসীম উপকাব সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ বঙ্গদেশ এতদিন মূলধনীকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সিংহাসনে তাঁহার ক্রোড়েকে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু কালে যতই চণ্ডীমঙ্গলের প্রচারাধিক্য হইবে ততই বঙ্গ সাহিত্যেব উন্নতি প্রবলতব হইবে; এবং এত কাল ভারতচন্দ্র যে উচ্চ আসন অধিকাব করিয়াছিলেন তাহা হইতে অধঃস্থাপিত হইবেন।

শ্রীভৈরবচন্দ্র দত্ত—বি, এ,

রমণীর প্রেম।

মরি মরি কি অপূর্ব্ব পদার্থ ঐ রমণীর প্রেম। যে প্রেমে মজিয়া জ্ঞান হাবাইয়াছি, বিনা মূল্যে আপন জীবন বিকাইয়াছি, আপন ভুলিয়া পরের হইয়াছি—নিজের অস্তিত্ব লোপ করিয়াছি—কেবল ভালবাসি সেই মন-মোহিনী, যাহাব প্রণয় আমার আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার তৃপ্তি, আমার সুখ, আমার জীবন, আমার ইহ জীবনেব সর্ব্বস্ব। মরি মরি রমণী, তুমি কি প্রেমই শিখিয়াছ, যাহার কণামাত্র পাইবার আশায় পুরুষ উন্মত্ত, পুরুষ তোমার ভক্ত, তোমার অনুগত, তোমার ক্রিড়া কন্দুক।"

রমণি! বলিতে কি তোমার মোহিনী প্রেমই সংসারের শৃঙ্খল, তোমার প্রেমই সংসারের মায়া, যদি তোমার ঐ প্রাণ মন ভুলানি প্রেম না থাকিত, তুমি যদি প্রেমপরায়ণা না হইতে, তাহা হইলে কি সংসারে তোমার এত আদর হইত ?

বলিতে কি রমণী তোমার এক মাত্র প্রেম লইয়া এ মহা সংসারে কত যে অক্ষয় কীর্ত্তি হইয়া গিয়াছে ও প্রতি নিয়ত হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কত রাজ্য ছারখার হইয়াছে, কতলোক পথের ভিখারী হইয়াছে, কত আত্মহত্যা, কত লাঞ্ছনা, কত আত্মবিরোধ, কত শোনিত পাত, কত কি হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, তাই বলি রমণী তোমার প্রেম কি অমূল্য পদার্থ!

কত কবি তোমার প্রেম বর্ণনা করিয়া আপন অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কত প্রেমিক তাঁহার হৃদয় মন্দিরে তোমার প্রেম ধ্যান করিয়া অবনীতে স্বর্গ সুখ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন,—কেহবা তাহার আভাস মাত্র পাইয়া আপনা হারাইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন—তাই বলি, রমণী! তুমি এমন সর্ব্বনাশী প্রেম কোথায় শিখিয়াছ ?

ক্লিওপেট্রা সুন্দরী হউক, সে ফুলে সৌন্দর্য্য থাকুক, সুরভী ছিল না, কিন্তু তাহার প্রেম লালসায় এ পৃথিবীতে কি ভয়ঙ্কর অভিনয় না হইয়া গিয়াছে!—রমণী তোমার গলিত প্রেমের যদি এত আদর, সকলের যদি এত আগ্রহ, অবলার পবিত্র প্রেমে না জানি কি হয়। পুরুষ তোমার প্রেমের আশায় একেবারে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয—পতঙ্গের অনলে পড়িবার ন্যায় জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহাতে আত্মাহুতি প্রদান করে, পরিণাম ভাবে না—বুঝি বা ভাবিতে জানেনা—না তোমার প্রেমের বুঝি এমনি মোহিনী শক্তি যে তাহার তাহা ভাবিবার অবকাশ থাকে না।

রমণী তুমি কি প্রেমের সাধের বিপনি খুলিয়াছ? তাই তুমি মহাজন, পুরুষ তোমার খাতক, এ ব্যবসা কোথায় শিখিয়াছ ভাই? এযে দুনা লাভ—দিবে এক রত্তি, লইলে দুই—তুমি যদি তোমার প্রেমের মোহিনী চক্ষে একবার ভ্রান্ত পুরুষের দিকে চাও, একবার মাত্র কটাক্ষপাত কর, তাহা হইলে আর পুরুষের প্রাণে প্রাণ থাকে না—সে তখন পৃথিবীতে হইতে যেন কোথায়

উধাও হইয়া যায়। সে তখন কি করিয়া তোমায় ভালবাসিবে, কি করিয়া তোমার সেই চাহনীর পূজা করিবে, কি করিয়া তোমার সেই প্রেমের উচিত মূল্য ও সমুচিত প্রতিদান ও পুরস্কার দিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হয়, জ্ঞান বিরহিত হয়।—সেই শশী মুখের একটী মধুমাখা কথা অমূল্য রত্ন, এ সংসারে আর তাহার মূল্য নাই, তোমার সেই প্রেমপূর্ণ হাসি যে কি অমূল্য রত্ন তাহা তুমি জাননা, কিন্তু পুরুষ জানে। তোমার এক একটী হাব ভাব আজ কাল আধুনিক যুবকদিগকে কবি করিয়া তুলে, আপনা ভুলাইয়া আপন ক্ষমতা ভুলাইয়া কবিতা লিখিতে বসায়। তাই বলি রমণী তোমার প্রেমের কি ক্ষমতা ভাই, একটী চাহণীতে পুরুষ তোমার প্রেমের গভীরতা বুঝে, অমনি আকাশ পাতাল প্রকৃতি খুঁজিয়া তাহার তুলনা খুঁজিয়া আকুল হয়, আপন কবিত্বের বিকাশ হয়না দেখিয়া যে কি যাতনা পায়, তাহা সেই জানে। হে কবিত্বরূপিণী প্রেমসম্পন্নারমণী, তোমার প্রেমের কি মূল্য আছে ভাই?

তোমার প্রেমের প্রলোভনে পড়িয়া কতলোক কত জ্বালা সহ্য করিয়াছে, কতবার হৃদয়াগুণে জর্জ্জরিত হইয়াছে, কতবার পৃথিবী অসার মরুভূমি ভাবিয়াছে, কিন্তু তুমি একবার তাহার প্রতি করুণ নেত্র পাত কর দেখি, সে অমনি অমাবস্যায় চন্দ্র দেখিবে, ফাল্গুতে চিরকাল অগাধ জল দেখিবে, পৌষে বসন্তাগম উপলব্ধি করিয়া আপন মনে আপনি পুলকিত হইয়া তোমার প্রণয়ের দাস হইবে, বিনামূল্যে তোমার নিকট আত্মবিক্রয় করিবে,—তাই বলি—ধন্য রমণী, ধন্য তোমার প্রেম! ধন্য তোমার প্রেমের ক্ষমতা।

———

সমাজ-তত্ত্ব।

—:o:—

প্রথম প্রস্তাব।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্ব্ব ও আধুনিক সমাজের তুলনায় দোষ গুণ বিচার করাই সমাজ-তত্ত্বের উদ্দেশ্য। যে জাতির সমাজ নাই সে জাতিই নহে, যাহাদের সামাজিক বল নাই, তাহাদের চির অবনতি চিরকাল প্রত্যক্ষিভূত হইয়া আসিতেছে। অতএব আমাদের এত উপকারি, এত প্রিয় সমাজ সম্বন্ধে কোন কথা না বলা যুক্তি যুক্ত বোধ হয় না।

যখন আদিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হয়, তখন সম্ভবতঃ কাহার সংসার বা কোন সমাজ ছিল না। তখন মনুষ্যও পশু ভাবাপন্ন ছিল। ক্রমে জ্ঞানের যত উন্মেষ হইতে লাগিল—বহুদর্শিতা যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই স্বজাতি-প্রেম, স্বজাতি সহানুভূতি, স্বজাতি আত্মীয়তা ও স্বজাতি ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে স্ত্রী পুরুষে প্রেম—স্বামী—স্ত্রী—হইল। এই-রূপে এক একটী মনুষ্য সংসার গঠিত হইল। মনুষ্য তখন সান্নিকট্য প্রেম বুঝিল, একত্রে বাস ভালবাসিল, আপনাপন প্রতিবেশী যুটাইল, তাহা হইতেই আপনাপন উন্নতি, সুখ সাধনা ও সচ্ছন্দতার জন্য ক্রমে সমাজ সৃষ্ট হইল।

আপনাপন লইয়া সংসার, কিন্তু সাধারণ লইয়া সমাজ। এক জন ও তাহার পরিবারবর্গ লইয়া একটী সংসার, এবং সাধারণ সংসার সমষ্টী লইয়া একটী সমাজ। সংসারী আপন সংসারের সুখ-দুঃখ, উপকার অনুপকার আপনি চিন্তা করে, কিন্তু সাধারণ সংসারী সমষ্টির সুখ-দুঃখ, উপকার অনুপকার প্রভৃতির নানাবিধ চিন্তা সমাজ কর্ত্তৃক সাধিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বঙ্গে তেমন কোন সমাজ নাই, যাহার মতানুবায়ী সকলে চলে। দিনে দিনে আমাদের সমাজ বন্ধন শিথিল হইতেছে, পূর্ব্ব সামাজিক রীতি নীতি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে, এবং তাহদের পরিবর্ত্তে নূতন প্রকার আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমাজ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছে।

মনুষ্যের সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু কোন স্থলে—যে স্থলে দেখিবে যে ইহা দ্বারা সামাজিক মঙ্গল আছে, ইহাতে সাধারণ সংসারের সুখ বৃদ্ধি হইবে। যে সমাজ সাধারণ সংসারিক সুখকে উপেক্ষা করিয়া বিকৃত মতের পোষকতা করে, আমরা তাহাকে সমাজ না বলিয়া, সমাজের জঞ্জাল বা সমাজ কল[ঙ্ক] বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হই না।

বঙ্গ সমাজ এখন একটী নূতন জীব, তাহার দিন দিন ভাবান্তর হইতেছে, দিন দিন নূতন আচার ব্যবহার রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহার অঙ্গপুষ্টি করিতেছে, বোধ হয় বাঙ্গালির বিজীত ভাবই তাহার প্রধান কারণ।

যখন আমরা মুসলমান অধিকারে বাস করি, তখন মুসলমানদিগের অনেক প্রকার আচার ব্যবহার আমাদের সমাজে গুপ্ত ও অজ্ঞাত ভাবে প্রবেশ লাভ করে, তখন ইষ্টানিষ্ট বুঝি নাই,—আমাদের মানসিক তেজের বিকলতা দর্শনে তাহারা আপনা আপনি প্রবেশ লাভ করে এবং আমরাও তাহাদিগকে অন্ধের ন্যায় আশ্রয় প্রদান করি,—সুধু করি নাই—করিতেছি, এখনও তাহারা আমাদিগের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ক্রমে সে দিন গেল, আর কিছু নূতন হইল না; কিন্তু আমরা আবার নূতন করিয়া নূতন লোকের সেবার জন্য নিয়োজিত হইলাম, আমাদিগের অবস্থার আর একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইল, ইংরাজ আমাদের সর্ব্বে সর্ব্বা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা হইলেন, আমরা আবার আহ্লাদে গদগদ হইয়া ইংরাজদিগের বাহ্যিক সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহার অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইলাম—আহ্লাদ সহকারে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলাম, এবং তদজ্ঞ লোকদিগকে মনে মনে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলাম। আপন আচার ব্যবহার, আপন রীতি নীতি ভুলিয়া পরের ঐ সকল গ্রহণ করিয়া পুলকিত হইলাম! বিচার নাই—বিবেচনা নাই—তর্ক নাই—বিতর্ক নাই—আপন সমাজের দিকে দৃষ্টিপাতও করা নাই—অধম বাঙ্গালির তাহাতে কি সর্ব্বনাশ হইতেপারে বা হইতেছে একবার তৎপ্রতি দৃষ্টিও নাই! ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? এরূপ উপায়

সকল অবলম্বনে বঙ্গের কি কখন কোন উপকার সাধিত হইবে? কখনই না, বরং অপকার হইবে, সে অপকার যখন বাঙ্গালি বুঝিবে তখন বঙ্গের মঙ্গল নতুবা আমাদের আর মঙ্গল নাই। কিন্তু বাঙ্গালি কি তাহা কখন বুঝিবে না বুঝিয়াছে? যাহাদিগের আপনাদিগকে বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা করে, বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করিতে মাথা ধরে, তাঁহাদের দ্বারা কি দেশের কখন কোন উপকার হইবে? তাঁহারা কি কখন বাঙ্গালির সামাজিক প্রথার উন্নতি কল্পে বদ্ধ পরিকর হইবেন? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভারত মাতাব আধুনিক কতিপয় কুসন্তানের জ্বালায় হিন্দু সমাজ, বঙ্গ সমাজ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে যে সকল প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার যে অধিকাংশই ভাল তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য। এই দারিদ্র দুঃখ নিপীড়িত বঙ্গ সমাজ অনেক যত্নে, অনেক ক্লেশে, অনেক চিন্তায়, অনেক অধ্যবসায়ে সৃজিত হইয়াছিল, প্রাচীন সমাজাভিজ্ঞ বহুদর্শিরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া,—দেশ কাল, অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে সকল সমাজ বন্ধন সৃজন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা যাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। এখন দেখা যাউক যে এই দৈনন্দিন সামাজিক পরিবর্ত্তনে আমাদের দেশের—সংসারের কোন বিশেষ অমঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে কি না।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

পাশ করা ছেলে ও চিনির বলদ শ্রীদুর্গাচরণ রায় প্রণীত, [illegible]সু প্রেস, কলিকাতা।

যিনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "কল্পদ্রুমে" "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" লিখিয়া রস প্রিয় পাঠকবর্গকে পরিতোষ করিয়াছিলেন, তিনিই শীর্ষোক্ত গ্রন্থ দুই খানির প্রণেতা।

পুস্তক দুই খানি পাঠ কালে গ্রন্থকারের সামাজিক কুপ্রথার উপর কিরূপ তীব্র দৃষ্টি, তাহা বেশ বুঝা যায়। প্রথম খানি বিবাহ কালে পাশ করা ছেলে কিরূপ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয় তদ্সম্বন্ধে লিখিত, দ্বিতীয় খানি একটী কৃপণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। দুই খানিতেই রসিকতার বিলক্ষণ বুকনী আছে, হাস্যরসোদ্দীপনায় দুর্গাচরণ বাবু যে কিরূপ পটু তাহা যিনি তাঁহার এক খানি মাত্রও পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন।

এ দুই খানি পুস্তক পাঠ কালে হাস্য সম্বরণ করা যায় না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনা আপনি হাসিয়া ফেলিতে হয়, এবং গ্রন্থকারের বহুদর্শিতাকে প্রসংশা করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে।

আমরা গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি যে তিনি তাঁহার "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সাধারণ পাঠক সমাজকে—তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে—তাঁহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিতে, এবং তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে দিয়া সুখী করিবেন।

নারিদেহ তত্ত্ব। (যুবতী, প্রসূতি, ও জননীর প্রতি উপদেশ।) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বেদান্ত প্রেশ, কলিকাতা।

এ পুস্তক খানিতে জ্ঞাতব্য বিষয় আছে বটে, কিন্তু ইহা বড়ই অশ্লীলতা দোষে দূষিত। যাঁহাদের জন্য এ পুস্তকখানি লিখিত, তাঁহাদের হস্তে এ পুস্তক খানি, কে অকুণ্ঠিত চিত্তে দিতে পারেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এখানি যাঁহাদের জন্য লিখিত, গ্রন্থকারের স্বেচ্ছাচারিতায় ইহা সম্পূর্ণতঃ তাঁহাদের অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। নীচ ভাষায় যাহা অশ্রাব্য, সুভাষায় তাহা কতক পরিমানে শ্রাব্য, কিন্তু গ্রন্থকার গোড়াতেই বিশমোল্লায় জবাই করেন, অভাগিনী বঙ্গভাষার সহিত তাঁহার চির বিরোধ—সুতরাং আর কি বলিব।

———

নৈশবিহার।

ভাগিরথী কূলে।

গ্রীষ্মকাল, পূর্ণিমারজনী,—ভাগিরথী সুধাধবলিত অঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিতা। আমি গৃহের শিখর দেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা বিশোভিত জাহ্নবীবক্ষ প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিলাম, বিশাল অনন্ত নীলাকাশের ইতস্ততঃ দুই একটী নক্ষত্র যেন সুধাকরের রূপ-প্রভায় ম্লান হইয়া নীরবে কাঁদিতেছে, আর চন্দ্রদেব যেন তাহাদিগের বিষাদের কারণ বুঝিতে পারিয়া দুই একটী ক্ষুদ্রকায় ছিরদ খণ্ডের সহিত চলিয়া চলিয়া হাসিয়া হাসিয়া মনের সুখে ভাসিতেছে। চন্দ্রদেবকে আমার চিরদিন অতি প্রশান্তমনা বলিয়া ধারণা আছে, কিন্তু একি চাঁদ কেন আজি ক্ষুদ্রের হৃদয়গত ঈর্ষা জনিত দুঃখ দেখিয়া হাসিতেছে! নানা চাঁদের কি এ কার্য্য সম্ভবে! চাঁদ হাসিয়া হাসিয়া তাহাদিগকে বলিতেছে, ভয় কি, এই যে আমি চলিলাম, তোমরা আবার তোমাদের রূপের গৌরবে হাসিও। আমি মনে মনে বলিলাম বেশ ভাই, বেশ তোমার জ্ঞান, কিন্তু এই মর মানব কেন এই ক্ষণিক প্রভা বিকাশ করিতে পারিলে বাহজ্ঞান পরিশূন্য হয়,—কেন আত্ম বিস্মৃত হয়?

আমি ক্ষণেক চাঁদের দিকে চাহিয়া আবার ক্ষুদ্র তরঙ্গ মালা পরিশোভিতা ভাগিরথীর দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, প্রত্যেক তরঙ্গ সঙ্গে সুধাংশু ক্রীড়াপর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীগুলি দাঁড় ফেলিয়া আসিতেছে, অংশুমালী সুখের হাসি হাসিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, এই সামান্য ক্রীড়ায় কি চাঁদের এত হাসি? না না ইহা অসম্ভব।

দেখিলাম—তরণীগুলির মধ্যে যেগুলির পাইল ছিন্ন, অথচ উজান বাই-তেছে সেগুলি প্রায়ই কাঁপিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে। যে গুলির পাইল ভাল সে গুলি বেশ যাইতেছে, ছিন্ন পাইল যুক্ত নৌকাগুলির যে গুলির কর্ণ-

ধারগণ বেশ দক্ষ তাহারা ছিন্ন পাইল সত্বেও বেশ দক্ষতার সহিত আপন বাহিত্রগুলি নাচাইতেছে, কিন্তু সকলগুলি সমান দেখিলাম না, কোনটী বড়নৌকা, কিন্তু নাবিক কম; কোনটীতে নাবিক বেশি, কর্ণধার অপটু; কোনটীর ক্ষেপনি ভগ্ন, কোনটীর কর্ণ ভগ্ন, কোনটীর দণ্ড নাই,—এইরূপ। সকলেই যেন এক উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইতেছে। স্থানে স্থানে তরণীর হাট লাগিয়াছে।

আমি অনেকক্ষণ শূন্যমনে তরণীগুলির প্রতি তাকাইয়া রহিলাম, আমাতে যেন আমি নাই, আমার হৃদয়ে যেন হৃদয় নাই, কতক্ষণ আমি এ অবস্থায় ছিলাম তাহা জানি না, এমত সময়ে সহসা আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, আমার প্রিয়তমা চিন্তা সহচরী আসিয়া আমার সেবায় মনোনিবেশ করিল। তখন মনে হইল যিনি এই তরণীর সৃজনকারী তিনি না জানি কি ভাবুক লোকই ছিলেন, তিনি অতি আশ্চর্য্য ভাবুকতার সহিত সংসারের সহিত অমোঘ তুলনায় তরণীর সৃজন করিয়াছেন।

দেখ এই ভবার্ণবে সংসারতরী সকল ভাসিতেছে, কেহ কেহ তরঙ্গাভিঘাতে কাঁপিতেছে। সংসারী মাত্রেই কেহ কর্ণধার, কেহ নাবিক, কেহ বা আরোহী, যে সমান ভাবে জোয়ারে যাইতেছে সে বেশ যাইতেছে, কেহ বা বলবতী ইচ্ছার সহায়তায় আপন ইপ্সিত স্থানে শীঘ্র যাইবে বলিয়া উজান যাইতেছে। যাহার পাইল ভাল, কর্ণধার ভাল, দাঁড়ি মজবুত, সে বেশ গেল, যাহার তাহা নাই, সে আঁকুবাঁকু করিল মাত্র, কিন্তু কোন ফল হইল না। কর্ণধার ভাল হইলে সকলই হয়, কিন্তু সময় গুণে কর্ণের দোষে অনেক সময় আবার কর্ণধারকে অপদস্থ হইতে হয়। নৌকার নাবিক, কর্ণধার ও তাহাদের দাঁড় প্রভৃতি ভাল হইলে যাতায়াতের যেমন সুবিধা, এ সংসারেও তাই, কিন্তু সকল সমান মিলে না, সমান হইলে ত সংসার সুখের হইত, কিন্তু তাহাত হয় না, তবে ত সংসার তরী ভাল নয়। সংসারী তুমি তরী বাহিতে শিখিলেনা, এ জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিলে না? ছি মানব! ইহা কি সামান্য অনুতাপের বিষয়! আপন ইষ্ট সাধনায়, আপন সুখাভিলাষে, আপন শুভ কামনায় তুমি দিক্ শূন্য, জ্ঞান শূন্য হইয়া কোথায় যাও তাহার ইয়ত্তা থাকে না।

তরণী পরিচালনের উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু সংসারীর সংসারের উদ্দেশ্য কি? সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই কি সংসারীর উদ্দেশ্য?—মানব! আপনার ও আপন স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদির সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধান করাই কি তোমার জন্ম পরিগ্রহণের সার কর্ম্ম? অন্ততঃ আমিত তাহাই দেখি, মনুষ্য অন্ধের ন্যায় জ্ঞান শূন্য হইয়া আপন সংসার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি লালসায় কি না করে! আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কি না করিতে পারে। কিন্তু এ সকল কেন? এ সংসার কয় দিনের, যাহার জীবন তরী সংসার মহাসাগরে অনুক্ষণ টল মল করিতেছে, প্রবল বাত্যাবিতাড়নে ডুবু ডুবু হইতেছে, সামাল সামাল ডাক উঠিতেছে, তাহার এত কেন? এ জীবন কয় দিনের। চির দিনের জন্য কে সংসারে আসিয়াছে? তবে কেন আমি আত্মজ্ঞান হারাই, আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, আপন সুখ বৃদ্ধি লালসায়, স্বীয় ধনাগমের ইচ্ছায়, পরের সর্ব্বনাশ করিতে ভ্রমেও কুণ্ঠিত হই না? যখন সম্বন্ধ জীবনাবধি নিহিত হইয়াছে, যখন একবার চক্ষু মুদিলে আর কাহার সহিত সম্বন্ধ নাই, তখন এত কেন?

দূরের কথা ছাড়িয়া দাও, এই যে সংসার, যে সংসারের সুখ বৃদ্ধি কামনায় তুমি উন্মত্ত, স্থির বুদ্ধে পর্য্যাবেক্ষণ কর দেখি, দেখিবে স্ত্রী, পুত্র, মাতা ভ্রাতা, ভগিনী তোমার সংসার রঙ্গালয়ের প্রধান অধিনায়ক, তাঁহাদিগের জন্যই সংসার, তাঁহাদিগকে লইয়াই তোমার সংসার। কিন্তু তুমি সেই সংসার লইয়া কি সুখী, তুমি যে এই শীত নাই, বর্ষা নাই, গ্রীষ্ম নাই, হেমন্ত নাই, রৌদ্র নাই, নীহার নাই, সকল প্রকার শারীরিক ক্লেশকে গ্রাহ্য নাই, দিবা নিশি, এক সংসারের উন্নতি কামনায় অধীর, আচ্ছা ভাই তোমার এত সাধের এত সাধনার সংসার লইয়া কি তুমি সুখী? বস্তুতঃ এ সংসারের সুখে সুখী অনেকে হয়, কিন্তু দুঃখে দুঃখী কে হয়? তুমি বলিবে কেন হয় না, আমার সেই অরবিন্দরূপিণী মধুরভাষিনী প্রাণসখী প্রিয়তমা, সেত আমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, কিন্তু প্রকৃতই কি তিনি তাই? সুখের সাথী বটে, কিন্তু দুঃখের সহিত বড়ই কম সম্বন্ধ। সংসারে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক, সুতরাং তাঁহাদের অর্থের সাচ্ছল্য না থাকুক, নিয়মিত আর্থিক অভাব বিমোচিত না হইলে দেখ দেখি কেমন তোমার মধুর হাসিনী মধুর-

ভাবিণী সুখের উচ্ছ্বাসে, সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া, মধুর হাসিয়া, মধুর ভাষিয়া তোমার তাপিত প্রাণ শীতল করেন। তখন তুমি তাহাকে তোমার তাপিত প্রাণ শীতল করিতে বক্ষে ধাবণ করিতে যাও, হয়ত তিনি গম্ভীর ভাবে বদন ভার করিয়া বলিবেন "মন ভালনাই ও সকল ভাল লাগে না" তোমার সুখ কোথা রহিল ভাই? তুমি বিষাদিত হইলে, কিন্তু তিনি কই তোমার উৎসাহ দিয়া বলিলেন "ভয়কি ঈশ্বর আছেন সকল দিন সমান যায় না তিনি অবশ্যই কৃপা করিবেন।" কিন্তু এ কথা প্রাণ থাকিতে সে মুখ বাহির হইবে না, তিনি বলিলেন "অর্থ দাও" তুমি বলিলে "অর্থ নাই।" তুমি পাও নাই, তোমার নাই, এ কথায় কি সে সবলার মন ভিজিবে? তিনি বলিবেন "নাই তা আমি কি জানি তুমি যেখান হইতে পাও আনিয়া দাও, তুমি কোথায় পাইবে তাহা আমার ভাবিবার আবশ্যক নাই।" এ দুঃখের জ্বালার সংসারী তোমার সুখ কই ভাই? এ স্বার্থপর সংসারে সুখের সংখ্যা বড়ই কম। পিতা মাতার যত্ন শুনিয়াছি সকল সন্তানে সমান, কিন্তু তাহার ও প্রমান পাই না, যে সন্তান রোজকারী তাহার প্রতি পিতা মাতার যত যত্ন, তাদ্বিপরীত ভাবাপন্ন সন্তানের প্রতি তত নয়,—তবে কেন সংসার-মমতা? ঐ দেখ একজন বিচক্ষণ, বিদ্বান, ধনী লোকের তিনটী বিধবা কন্যা, কিন্তু তন্মধ্যে এক জনার প্রচুর অর্থ আছে, সে স্বামীধনের অধিকারিণী হইয়াছে. কেন পিতা তাহাকে যত স্নেহ করেন, ভালবাসেন, যত্ন করেন, অপর কন্যা গুলির প্রতি তাহার একাংশও করেন না? তাই বলি সংসার তোমার কুহকে পতিত মানব যে কি কিম্ভূত কিমাকার জীব তাহা বুঝি না। সংসারে সুখের সংখ্যা কম, তথাপি মানব কেন এত স্বার্থপর তাহাই ভাবি, কিন্তু পোড়া বুদ্ধিতে তাহার কিছুই স্থির হয় না!

সংসারের ত গতিক এই, তবে সংসার কি উদ্দেশ্য বিহীন বস্তু? মনুষ্যের বুদ্ধির স্থিরতা নাই, তাই সংসারকে উদ্দেশ্য বিহীন বস্তু বলিয়া ভাবি, কিন্তু ঈশ্বরের বুদ্ধির ত সীমা নাই, তাঁহার সেই অনন্ত অসীম অপরিমেয় বুদ্ধির ফল—মানবের জীবনের উদ্দেশ্য কি? মনুষ্য কি স্বার্থান্ধ হইয়া বৃথা মায়ার মুগ্ধ হইয়া "সংসার সংসার" "আমার আমার" করিয়া চীৎকার করিতেই ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে?

ভাবে বোধ হয়, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য আছে। যাঁহার অসীম বুদ্ধি বলে চন্দ্রদেব পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিতেছেন, সচন্দ্র পৃথিবী সৌর জগতকে ঘুরিয়া আসিতেছে, উত্তাল তরঙ্গমালা সমাকুল পারাবার দুর্জ্জয় বেগ ধারণ করিয়াছে, অভ্রভেদী পর্ব্বত সমূহ উর্দ্ধ মস্তকে দণ্ডায়মান, যেন জগতের কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। যিনি, যে মহান্ ব্যক্তি এই সকলের সৃষ্টি কর্ত্তা, যাঁহার কোন কার্য্য উদ্দেশ্য বিহীন নহে, তিনি যে এই অমূল্য মানব জীবনকে উদ্দেশ্য হীন করিয়াছেন ইহা সম্ভবপর নহে, তবে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি?

দেখ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকল আপনাপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনাপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। একটী সামান্য বৃক্ষ ঔষধী রূপে ব্যবহৃত হইয়া স্বউদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। ভীতি সম্পাদক সর্পের গরল মনুষ্যের উপকারে আইসে। অতএব যখন জীবিত জড় সকল পদার্থের উদ্দেশ্য আছে তখন মনুষ্য জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। এ কথা বিশ্বাস করা অপেক্ষা স্বপ্নে বিশ্বাস করা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়।

তবে ত তরণী ও মানব জীবনে তুলনীয় কিছুই নাই। তরণী ভাঙ্গিলে বা ডুবিলে তরণীর মুখ্য উদ্দেশ্য ফুরায়, কিন্তু মানব সম্বন্ধে ত তাহা নহে। এই নশ্বর অবনীতে মানব জীবন শেষ হইলে ত তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হয় না। তাহার অন্য উদ্দেশ্য আছে,—সে উদ্দেশ্যে হয়ত সেই পরম পিতা, সেই সর্ব্বসুখ দুঃখ নিয়ন্তা, জগত বিধাতার নিকট তোমার সকল সুখ দুঃখের ও সকল কার্য্য কারিতার হিসাব দিতে হইবে। হায় এ জীবনে কি করিলাম, আহার নিদ্রা বৃথা সুখে মত্ত রহিয়া দিন কাটাইলাম। কেন সংসারে আসিয়াছি, জীবন কেন, তাহা জানি না,—তবে কি করিয়া জবাব দিব? কত দাম্ভিক দুরাচার মহাপাপী সামান্য অর্থ লোভে পরের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে অকুণ্ঠিত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সেখানে কি জবাব দিবে? যাহার অপহরণ করিলে, সুখে হউক দুঃখে হউক তাহার ত দিন কাটিতেছে, কিন্তু তুমি সুখী কই? তুমি দিন দিন মলিন ও কৃশ হইতেছ, লোক উপর খড়্গ হস্ত, কেন?—তোমার দৌরাত্ম্যে, কিন্তু

এ দৌরাত্ম্য কেন ? একবার চক্ষু বুজিলে এ সাধের হাট বাজার, তোমার সাধের বস্তু সকল কোথায় থাকিবে ? তখন তুমি কি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে আসিবে ? আর এমন কখন মনে করিও না যে তোমার সকল দিন সমান যাইবে !

যে দিন ঘোর নিদ্রা আসিবে, যে দিন আসন্ন ভাবে আসন্ন কালে মহা নিদ্রায় অবিভূত হইবে, তখন আর কে তোমার ? সেই সর্ব্বজ্যোতিঃ সম্পন্ন সর্ব্ব গুণনিধান জগতজীবনের নিকট তোমার কার্য্যের কথা বলিতে হইবে, তোমার আত্মীয় স্বজন পিতা পিতামহ প্রভৃতি যাঁহারা তোমায় ফেলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারা হয়ত তথায় তোমার সহিত মিলিত হইবেন, তুমি কি বলিবে ভাই ? যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন—আমি তোমার কত উপকার করিয়াছি, শেষে আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তান সন্ততির কি এত অনিষ্টই করিতে হয় ? কেহ কহিবেন—আমি তোমার হস্তে সমস্ত বিশ্বাস করিয়া সমর্পন করিয়া পরলোকে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এইরূপ সর্ব্বনাশ কি করিতে হয় ? তখন তোমার সেই দিব্যজ্ঞানে কি বলিবে ভাই ? শত সহস্র নরক কুণ্ড, অগ্নি কুণ্ড অপেক্ষা কি ইহা ভয়ানক নহে ? তাহার পর আবার শাস্তির নরক আছে। কি ভয়ানক কথা। মানব তথাপি কি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নাই ? ইহাকি সম্ভব ? যখন বৃহৎ হইতে অতি সামান্য বস্তু পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইবার উদ্দেশ্য আছে, তখন মানব জীবনের উদ্দেশ্য নাই, ইহা কি বিশ্বাস্য ? অতএব মানব তুমি সাবধান হও, তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে মহাকাল সাগরের ক্ষুদ্র তরণী নহ, সামান্য তরণীর সহিত তোমার তুলনা করিতে গিয়া আমার অন্যায় হইয়াছিল, আমার মতিভ্রম হইয়া ছিল,— আমায় ক্ষমা কর।

অপূর্ব্ব স্বয়ম্বর।

(কুসুমোদ্যানে)

১

সুখদ শরদে, চারু প্রদোষ সময়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা বায়ুভরে করি খেলা
পশ্চিম গগনে আসি
হইল উদয়।
ধবিল রক্তিম আভা দেব দিনমণি,
ধরণী নবীন বেশে সাজিল অমনি।

২

অমনি সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা জলধর দল,
সুধীর সমীর-ভরে ভাসিতে ভাসিতে পরে
তবক তবকে যেন
মিলিল সকল,
সহসা বিস্মিত চিত্তে হেরিনু তখন,
রঞ্জিত রক্তিমা রাগে পশ্চিম গগন।

৩

অস্তগিরি 'পরে বসি শারদীয় রবি,
বিস্তরি বিনোদ-বিভা বিনোদ বরণে কিবা
সাজাইল চারু সাজে
জলধর-ছবি।
বিরহিনী নলিনীর মলিন বদন,
দেখি বুঝি দিনমণি মূরতি মোহন—

৪

আঁকিলা যতন করি গগনের ভালে ;—
সরলা দিনেশ-প্রিয়া সে আলেখ্য নিরখিয়া
বিরহ-যাতনা তার
ভু'লে যাবে ব'লে !
কিন্তু কমলিনী তাহা না করি লোকন,
বিষাদে মলিন মুখী মুদিলা নয়ন !

৫

হেথা'য় ভূতলে সেই জলদ-পরভা
ভাতিল অমনি আসি, ধরিল ধরণী হাসি
অমরাবতীর সম
মনোলোভা শোভা !
উজল নবীন রাগে বন উপবন,
উজল নবীন রাগে কুসুম-কানন !

৬

ঐ হেন সময়ে পশি কুসুম-কাননে,
দেখিনু সুন্দর কিবা ফুল-স্বয়ম্বর-সভা
চারি দিক উজলিয়া
শোভিছে বিজনে।
সুশীলা প্রসন্নমুখী ফুল-কুল-বালা,
পরায়েছে বর-গলে চারুবর-মালা।

৭

সমাদরে গন্ধরাজে বরি বরাননা,
স্বয়ম্বর-সভামাঝে ভুবন মোহন সাজে
বিরাজে অপরাজিতা
লতিকা শোভনা,
বিজড়িত শ্যামদলে শ্যাম কলেবর,
নীলিম-লহরী তাহে কুসুম নিকর !

৮

না জানি এ বন-লতা শিখিল কেমনে,—
সমাদরে ধবিগলা পবাইতে বর-মালা
বাঁধিতে প্রেমেব ডোরে
পবাণেব ধনে।
ভবে স্ববগীয় প্রেম প্রকাশ কারণ,
বিভুব নিযমে হয এ মধু মিলন।

শ্রীহবিপ্রসন্ন সরকার।

কমল কুমারী।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাতা ও কন্যা।

জৈষ্ঠ্য মাস বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, প্রখর তপনের কিবণ জালে মহানগবী দিল্লী হাস্যমযী। সেই সৌধ কিরীটিনী মহানগরীর উত্তর প্রান্তস্থ প্রান্তবের একটী কুটীর দ্বারে, একটী দীনা মলিনা বৃদ্ধা কর কপোলিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ঘোর দারিদ্রতা, ঘোর দুশ্চিন্তা যেন তাহার চির সহচবী। তাহার সেই কঙ্কালসার ললাটে বিধাতা যেন তাঁহার লৌহ লেখনী দ্বারা দারিদ্রতার ঘোর মসিলেখা দিয়াছেন। সেই কোটরাশ্রয়ী চক্ষু যেন সংসারে বিষাদময়ী চিত্রের বিষণ্ণ চিত্র সন্দর্শন

করিতে সেই বদন মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বৃদ্ধা স্থির দৃষ্টে পথপানে চাহিয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, মধ্যে মধ্যে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে দুই একটী হৃদয় বিদারী দীর্ঘশ্বাস প্রবাহিত হইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে সহসা যেন সেই জ্যোতিহীন নয়ন যুগল প্রসন্ন হইল, তিনি যাহার ধ্যানে ছিলেন, যেন তাহাকে পাইলেন, অনতি বিলম্বেই একটী পরমা সুন্দরী দ্বাদশ বর্ষিয়া বালিকা সেই কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ছিন্ন বসন, অঙ্গে ধূলী, প্রখর তপন তাপে মুখ মণ্ডল সমধিক রক্তাভ, কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদমালা দেখা দিয়াছে,—কিন্তু এত হীন অবস্থাতেও সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই—সেই সুটানা চক্ষু, তদুপরে সূক্ষ্ম ভ্রূযুগলের বক্রভাব, মনোহর নাসিকা, সেই গোলাপ কলিকা সদৃশ ওষ্ঠ যুগল, সেই ক্ষুদ্র কর্ণদ্বয়,—ক্ষুদ্র অথচ পরিপাটী ললাটের গঠন ভঙ্গি, স্ফুরিত অথচ মনোমুগ্ধকর গণ্ডস্থল, সেই অঙ্গের সুগোল সুমার্জ্জিত গঠন, জানি না, বিধাতা কত সাধে, কত যত্নে, কত অধ্যবসায়ে গড়িয়া তাঁহার অক্ষয় শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অভাগিনীর এ ভাব কেন? এ সোনার কমল ধূলায় কেন?

বৃদ্ধা বালিকাকে দেখিয়া স্নেহ ভরে কহিলেন "কমল, এলি মা?"

বালিকাটীর নাম কমল—বা কমল কুমারী, কমল বিমর্ষ ভাবে বলিল "হাঁ।"

বৃদ্ধা বালিকাকে কোলে করিলেন এবং সস্নেহে মুখ চুম্বন ও তাহার চিবুকে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন "মুখটী এত শুক্‌নো কেন?"

কমল। আজ এই দুটী খানি চাল পেয়েছি, কি হবে মা।

বৃদ্ধা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আহা তোর কপালে এত দুঃখ ছিল কমল, তুই আমার দুধের ছেলে, তোকে কি না ভিক্ষে করে আমায় খাওয়াতে হ'ল।"

কমল বিষন্ন ভাবে কহিল "তাই কই পারি মা, চলে চলে পা ছিঁড়ে গেছে, তবু পেটের ভাত হলো না।"

বৃদ্ধা। তোমার ত হবে।

কমল। না মা, আমি খাব না, তোর্ এই দুখানা হাড, না খেয়ে কদিন বাঁচ্‌বি ?

বৃদ্ধা। বালাই, ষেটের বাছা আমার, তুমি খাবে না আমি খাব ? আমার পেবাস উঠ্‌বে ?

কমল। কেন মা, আমি আবাব ভিক্ষে কব্‌তে যাব, এনে খাব।

বৃদ্ধা। ঐ কটী চেলের ভাত রেন্ধে দি, খেয়ে ভিক্ষেয এস, এনে দিলে আমি খাব।

কমল। না মা তা হবেনা, তবে দুজনে খাই এস।

সেই কটী চাউল বৃদ্ধা বন্ধন কবিতে লাগিলেন, কমল স্নান করিয়া আসিল, সেই ছিন্ন বসন মাত্র তাহাব সম্বল, সুতবাং তাহাই অঙ্গে রৌদ্র-তাপে শুষ্ক করিতে লাগিল।

বন্ধন হইলে উভয়ে সেই অন্নগুলি আহাব কবিল, আহারান্তে কমল আবার সেই অসহ্য সূর্য্যতাপে ভ্রূক্ষেপ না কবিয়া ভিক্ষায় গমন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মেঘেতে বিজলী।

অভাগিনী কমল কুমারী সেই প্রচণ্ড বৌদ্রে সজল চক্ষে বিষাদিত অন্তঃকবণে ভিক্ষায় চলিল। ভগবান্, তোমাব অনন্ত লীলা বুঝা ভার, তুমি বালক বালিকা বুঝ না, বৃদ্ধ যুবা ভাব না, তোমার অশান্ত নিয়তি চক্রে সকলেই ঘুবিতেছে। পাঁশ কুঁড়ে পদ্ম ফুল দেখিলে যে দুঃখ, আকন্দ ফুল দর্শনে তত দুঃখ হয় না, বুঝি মনুষ্যে্র সেই ভ্রম সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করাইতে উষব ক্ষেত্রে কমল রূপিনী পাবিজাতেব বিকাশ। জগদীশ! ধন্য তোমার তুলাদণ্ড, ধন্য তোমার ন্যায় পরায়ণতা! তোমাব বিচাব বুঝা ভার।

কমল ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে, কিন্তু যেখানে পাঁচ জন ভদ্রলোক সেখানে তাহাব মুখ ফুটে না, চাহিতে পারে না, তাহার দুঃখের কথা জানা-

ইতে পারে না। নির্জ্জনে একাকী কাহাকেও দেখিলে তাহাকে বলে, নতুবা রমণী মণ্ডলীই তাহার যাচ্ঞার স্থান। কমল প্রত্যহ আপনাদের আবশ্যক মত ভিক্ষা পাইলেই সন্তুষ্ট হইত, আর ভিক্ষা করিত না, সেই জন্য যে দিন কম পাইত, সে দিন প্রায়ই অর্দ্ধাহার হইত। আজি বালিকার দশায় তাহাই ঘটিয়াছে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

এরূপ অর্দ্ধাহারে সে আপনার জন্য কোন বিশেষ ক্লেশ অনুভব করে না, তাহার দুঃখ বৃদ্ধা মাতার জন্য—কমলের বড়ই মাতৃভক্তি, মাতাকেই সে ইহ জগতের সার বলিয়া জানিত, এবং উপাস্য দেবী ভাবিয়া ভক্তি করিত।

কমল ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি লইয়া দ্রুতপদে স্বকুটিরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে এমত সময় একটী দুরন্ত বৃষ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার দিকে সবেগে ধাবমান হইল, বালিকা চীৎকার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল, কিন্তু সে প্রান্তরে কে তাহার সহায়তা করিবে, কে সেই বৃষভকে তাহার রোষ হইতে প্রতি নিবৃত্ত করাইবে? আহা আর বিলম্ব নাই—বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কমলের দশায় কি এই ছিল? জগদীশ। বৃদ্ধার দশায় কি হইবে? তাহা কি তুমি ভাবিবে না?—সকলি গেল, বৃষ আবার বীরদর্পে ভয়ঙ্কর আস্ফালন ও পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া অভাগিনী বালিকার দিকে ধাবমান হইল। বালিকা আবার আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিল—অবোধ বালিক! এ প্রান্তরে কে তোমার কাতরোক্তি শুনিবে? বালিকা প্রাণভয়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে যে বৃষটী তীর বিদ্ধ ও রুধির ধারায় প্লাবিত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। কমল অবাক্ হইয়া এদিক ওদিক চাহিল. দেখিল দূরে একটী যুবা অশ্ব পৃষ্ঠে দ্রুতবেগে সেই দিকে আসিতেছেন। তাঁহার হস্তে শরাসন দেখিয়া বালিকা বুঝিল যে সেই যুবকই তাহার রক্ষা কর্ত্তা এবং বৃষ হন্তা।

বালিকা কি বাক্যে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারে, মনে যাহা আসিল, মুখে তাহা ব্যক্ত হইল না, কিন্তু চক্ষু কি ক্ষান্ত থাকে, সে আপন কার্য্য আপনি করিল, দুই চক্ষে তপ্ত অশ্রুধারা বহিল।

যুবক অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া আপন কমাল দ্বারা বালিকার চক্ষু জল মুছাইয়া বলিলেন "ভয় কি, কাঁদিও না।"

কমলের বাস্তবিক আর এখন এমন কোন ভয় নাই, সুতরাং ভয়ের জন্য কাঁদে নাই। বালিকা কেন কাঁদিল তাহা সে জানে না।

যুবক আবার বলিলেন "কাঁদিও না,—তোমার নাম কি?"

কমল অধোবদনে বলিল "কমল কুমারী"

যুবক। তোমার কে আছে?

কমল। মা।

যুবক। আর—

কমল। আর কেহ নাই—

যুবক। তুমি একাকিনী কোথায় গিয়াছিলে?

কমল। ভিক্ষায়।

যুবক। পথে কি রাঙ্গা কাপড় পরিতে আছে।

কমল। আমার যে আর নাই।

যুবক। তোমার বাটী কত দূর?

কমল। অতি নিকট।

যুবক। তোমরা রাজপুত?

কমল। হাঁ।

যুবক। চল তোমার মার কাছে যাই।

কমল সহ্লাদে কহিল "আসুন"

যুবক গমনোদ্যত হইয়াছেন মাত্র, এমন সময় বৃষাধিকারী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, যুবক তাহাকে তাহার বৃষের ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য প্রদান করিলেন এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া কমলের সহিত তাহার কুটিরাভিমুখে চলিলেন।

যুবকটীর পরিচ্ছদ বেশ পরিপাটী,—রাজপুত দিগের ন্যায়, গলদেশে অমূল্য মুক্তাহার শোভা পাইতেছে, কোটী তটে কোষাবদ্ধ অসি ঝুলিতেছে। তাঁহার মুখ মণ্ডলের অপূর্ব্ব ভাব, মনোহর গঠন পরিপাট্য দর্শনে তদ্নির্ম্মাতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতন লোক।

কমল কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে যুবক বলিলেন "কমল এই তোমার বাটী?"

কমল। হাঁ।

যুবক। এখানে থাক কি করিয়া?

কমল মধুর ভাবে কহিল "আমরা যে গরিব।"

যুবক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

কমল মাতাকে তাহার বিপদের কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবৃত করিল। বৃদ্ধা সজল নেত্রে কমলকে ক্রোড়ে করিয়া ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ এবং যুবককে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বাবা ঘরে এমন কিছু নাই যে তাহাতে তোমায় বসিতে দি।"

যুবক কুটীরের মৃন্ময় বেদীতে উপবেশন করিয়া কহিলেন "ইহাই আমার স্বর্ণাসন।"

ক্ষণেক উপবেশন করিয়া যুবক বৃদ্ধার হস্তে একটী স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন।

বৃদ্ধা কহিলেন "ইহা লইয়া কি করিব, কোথায় ভাঙ্গাইব বাপ্।"

যুবক অগত্যা স্বর্ণ মুদ্রাটী পুনঃ গ্রহণ করিয়া অশ্বারোহন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন, যাইবার কালে আবার কল্য আসিবেন এই কথাটী মাত্র বলিয়া গেলেন।

বেলা অবসান, পশ্চিমাকাশ অস্তগামী সূর্য্যালোকে এমনও রঞ্জিত, গগনমণ্ডল যেন পক্ষিগণের কাকলীতে পূর্ণ,—দূরে সৌধকিরিটীনী দিল্লির সৌধপুঞ্জে এখনও সূর্য্য কর ক্রিড়াপর—প্রকৃতিকে অন্ধকার আবরণে আবরিত করিতে আর অতি অল্প মাত্র বিলম্ব, এমন সময় গুটীকত লোক নানাবিধ আহার্য্য, ও বসন ভূষণ আনিয়া বৃদ্ধার কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধা বলিলেন "এ সকল কে পাঠাইল ?"

উত্তর। একটী লোক।

বৃদ্ধা। তিনি কে ?

উত্তব। তাহা জানি না।

বৃদ্ধা বুঝিলেন যে ইহা সেই দয়ালু যুবকেব কার্য্য, সুতরাং সে গুলিকে গ্রহণ করিলেন।

পব দিবস প্রত্যুষে কতক গুলি লোক আসিয়া বৃদ্ধের কুটীর ভাঙ্গিয়া সুন্দর গৃহ প্রস্তত করিয়া দিল। এবং পূর্ব্ব মত প্রত্যহ নানাবিধ আহার্য্য ও বসন আসিতে লাগিল, বৃদ্ধাব দাবিদ্র ঘুচিল।

কিন্তু বৃদ্ধ প্রত্যহ এত দ্রব্যাদি লইযা কি করিবে,আর কেনই বা লইবে ? বৃদ্ধা একথা সমাগত লোক দিগকে বলিলে তাহারা ইহার কোন প্রতি উত্তর দিত না, লইতে অস্বীকার করিলে তাহাবা বিনা বাক্য ব্যয়ে সে সমস্ত গৃহে বাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইত। বৃদ্ধা তাহাদের এতাদৃশ ব্যবহারে কুণ্ঠিত ও বিস্মিত হইতেন।

সেই দিন হইতে যুবক সন্ধ্যা সমাগমে প্রত্যহ কমল ও বৃদ্ধাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহাকে একথা বলিলে তিনি বলেন "কই আমি ত কোন দ্রব্য পাঠাই না, কে পাঠায় জানিতে পারিলে তাঁহাকে পাঠাইতে নিষেধ কবিব।"

এই রূপেই দিনেব পর দিন, মাসেব পব মাস, যাইতে লাগিল। কমলকে আব ভিক্ষায় যাইতে হয় না। কমল এখন কেবল সেই বৃদ্ধা মাতার শুশ্রূষায় নিবতা, কমলেব ইহাতেই অতুল আনন্দ।

যুবকটীর সহিত কমল ও বৃদ্ধার নিতান্ত ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছে। বৃদ্ধা তাঁহাকে আপন পুত্রেব ন্যায় দেখেন, এবং মনে মনে ভালবাসেন। যুবকটী আপন পরিচয়ে বলিয়াছেন যে তিনি রাজপুত জাতীয় এবং তাঁহার নাম—কুমার সিংহ। কমল তাঁহাকে কুমার বলিয়া ডাকে। কুমার যেন তাহাদের পরিবারবর্ত্তী, কুমাবকে না দেখিলে তাঁহারা বিকল চিত্ত হয়েন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—— ০:০ ——

ঘনিষ্টতা।

প্রত্যহই কমল কুমারসিংহকে দেখিতে পায়, কিন্তু আজ সন্ধ্যা হইয়া আসিল তথাপি কুমার আসিলেন না! ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, সে রাত্রিও পোহাইল, কিন্তু কুমারের দেখা নাই। পর দিবস কমল আরও উৎকণ্ঠিতা হইল। পাঠক! কমলের এত উৎকণ্ঠার কারণ কি? তবে কি কমল মনে মনে কুমারকে ভালবাসিয়াছে, আত্মসমর্পন করিয়াছে? আমরা বলি কমল প্রকৃতই কুমারকে ভালবাসিয়াছে। আবার রাত্রি হইল, কমলের আর কখন রাত্রি এত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় নাই। রাত্রি যেন আর পোহায় না, কতবার তন্দ্রা আসিল, কতবার ভাঙ্গিল, ক্রমে সে রাত্রিও পোহাইল। পর দিবস যথা সময়ে দিল্লি হইতে আবার আহার্য্য আসিল, কমল তাহাদিগকে ব্যগ্রতা সহ কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাহারা প্রতি উত্তরে কহিল তাহারা কুমারকে জানে না। কমলের আশা নিষ্ফল হইল, হৃদয় আবার ব্যথিত হইল। কমল হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, গৃহের বাহিরে যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যে সকল লোক প্রত্যহ আহার্য্য আনিত, কমলের তাহাদের প্রতি সন্দেহ জন্মিল, কমল মনে ভাবিল ইহারা কে? যদি কুমারের লোক না হইবে তবে আমাদের প্রতি ইহাদের এতদৃশ অনুগ্রহ কেন? আর যদি প্রকৃতই কুমারের লোক হয়, তাহা হইলে ইহারা তাঁহার সংবাদ দেয় না কেন? আমার তাপিত প্রাণ শীতল করে না কেন? কমল এইরূপ কতই ভাবে,—কতই কাঁদে।

তাহার পর দিন সেই লোকগুলি আবার আহার্য্য লইয়া আসিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল, কমল তাহাকে কহিল "আপনিও কি কুমার সিংহকে জানেন না?"

বৃদ্ধ। না।

কমল। এত আহার্য্য কে পাঠায় ?

বৃদ্ধ তাহার কোন উত্তর দিল না।

কমল। উত্তর না দিলে আমরা এ সকল কিছুই লইব না।

বৃদ্ধ। লওয়া না লওয়া তোমার ইচ্ছা, আমি রাখিয়া চলিলাম।

এই কথা বলিয়া তাহারা দ্রব্যাদি রাখিয়া চলিয়া গেল। কমল আবার বিষণ্ণা হইল। আবার কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চিন্তা মগ্না হইল। কমলের মুখে আর সে হাসি নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই, নয়নের সে প্রাণহারী সৌন্দর্য্য নাই, সাধের কমল যেন শুষ্ক, অমল সুধাংশু যেন প্রভাহীন।

একদিন দুদিন করিয়া সপ্তাহ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এইরূপে একটী মাস অতীত হইল। কমল এ জীবনে অনেক মাস যাইতে দেখিয়াছে, কিন্তু এত দীর্ঘ স্থায়ী মাস সে আর কখন দেখে নাই। কমলের মানসিক যাতনা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধা মাতা তাহার মনোভাব বুঝিলেন, একদিন বলিলেন "কমল, তুই দিন দিন এমন হচ্ছিস্ কেন না ?"

কমল জড়িত স্বরে তাহার উত্তর দিল "কই না—না।"

এই কথা বলিয়া দ্রুত পদে তথা হইতে চলিয়া গেল, বাহিরে যাইয়া চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসাইতে লাগিল। বিধাতঃ প্রেমের পরিণামই কি ক্রন্দন, না ক্রন্দনে প্রেমের পরিপুষ্টি ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুখ-সম্মিলন।

কুতব মিনারের পার্শ্বে, প্রস্তরসোপনোপরী একদিন একাকিনী কমল উপবিষ্টা, মানসিক বিকলতা হেতু মনে মনে গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছিল, এমত সময়ে একটী যুবক আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে হস্ত দ্বারা তাহার চক্ষুদ্বয় আবরিত করিল।

কমল বলিল "দূর পোড়াব মুখী ছাড়।"

যুবক হাত ছাড়িয়া হাসিয়া কহিল "পোড়াব মুখী নয়,পোড়ার মুখো।"

কমল চমকিয়া উঠিল, বলিল--"আ—আ আপনি।"

যুবক। আবাব আপনি—"তুমি" বল।

কমল যেন সহসা স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল, তাহাব হৃদয যেন মর্ত্ত ছাড়িয়া স্বর্গেব বিমল বিভায বিভাষিত হইল, বলিল "আচ্ছা তুমি।"

যুবক। আমি কে?

কমল অধোবদনে মৃদু হাসিয়া কোন কথা কহিল না।

যুবক কমলেব মুখ চুম্বন কবিয়া বলিলেন "কে বল?"

কমল। না।

যুবক। তবে আমি আবার যাইব।

কমল। আবাব।

যুবক। তবে বল আমি কে?

কমল। কুমাব—আমাব কুমাব।

যুবক। তুমি আমার সাধেব কমল।

কমল। আমি এখানে আছি কি করিয়া জানিলে?

যুবক। প্রাণ যাবে চায়, সে কোথায, তাহা জানা কি বড কঠিন?

কমল। আমি তোমাব সহিত কথা কহিবনা।

যুবক। কেন?

কমল। এত দিন কোথায় ছিলে?

যুবক। কোন বিশেষ কার্য্যে দেশান্তরে গিয়াছিলাম।

কমল। তবে আমি আব তোমায় ভালবাসিব না।

কুমাব। কেন কমল?

কমল। তুমি আবাব কবে কাঁদাইয়া যাইবে।

কুমাব কমলেব মুখ চুম্বন কবিয়া কহিলেন "কমল, তুমি আমার জন্য কেঁদে ছিলে?"

কমল। না, কাঁদিনি বই কি?

কুমাব। আমি কি কাঁদিনি কমল?

কমল। কখন না।

কুমার। কিসে জান্‌লে ?

কমল। প্রাণ কাঁদলে না দেখে থাকা যায়।

কুমার। বিশেষ কার্য্য—

কমল। ভালবাসায় কার্য্যকি ?

কুমার। আমি অন্যায় করিয়াছি, ক্ষমা কর।

কমল। তুমি ত কোন অন্যায় কর নাই যে ক্ষমা করিব।

কুমার। আমার উপর রাগ ক[illegible] ?

কমল। তোমার উপর রাগ [illegible]হা কি সম্ভব। তুমি যে আমার জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব, তোমার [illegible]বর।

কুমার। তবে কি করিয়াছ ?

কমল। কিছু না।

কুমার। কিছু না।

কমল। না,—কেবল আপন মনে, আপন প্রাণে, এই এক মাস যে কি যাতনা ভোগ করিয়াছি তাহা আমিই জানি।

কুমার। সে দুঃখ ভোল।

কমল। তাহাত ভুলিয়াছি।

কুমার। কখন ?

কমল। তোমাকে দেখিবা মাত্র।

কুমার স্নেহভরে কমল কুমারীকে আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "আমাকে দেখিবা মাত্র কমল ?"

কমল। হাঁ, তোমাকে দেখিবা মাত্র।

কুমার। কমল, তুমি আমায় ভালবাস ?

কমল মৃদু হাসিয়া কহিল "না।"

কুমার। একটা কথা বলি শুনিবে ?

কমল। শুনিব।

কুমার। আমি অতি দীন হীন, আমায় ভালবাসিবে ?

কমল। বাসিব।

কুমার। কমল ভাবিয়া দেখ—এখনও বিবেচনা কর, তোমার যে অতুল সৌন্দর্য্য, তাহাতে অনেক ক্ষত্রীয় রাজপুত্র তোমায় বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু সে সুখ ছাড়িয়া তুমি এ দরিদ্র রাজপুতকে কেন ভালবাসিবে ?

কুমার স্থির দৃষ্টি কমলের বদন প্রতি চাহিয়া ছিলেন, তিনি যেন ত ন তাহার হৃদয়ের অতি গোপন কথা সকল পাঠ করিতে ছিলেন।

কিন্তু কমলের মুখ হাসি ভরা, সে যাহারে চায়, আজি তাহারে পাই যাছে, তাহার হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে।

কমল কুমারের এই কথা শুনিয়া নিল "কুমার আমি ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে আমি আ কিছুই চাই না, আমি সহায়, সম্পদ, মান, যশ নি না নহি,—আমার পূর্ব্বাবস্থা কি ছিল ভাই ?"

কমল। তথাপি তোমার কটাব ছি ।

কমলের চক্ষু সজল হইল, বলিল—"কুমার তুমি আমার হৃদয় জান না, তুমি যদি দিবা রাত্র পরিশ্রমকারী সামান্য কৃষকও হও, এবং তোমায় বিবাহ করিয়া যদ্যপি আমাকে অতি সামান্য অবস্থায় পরপদসেবিকা দাসী বৃত্তিও অবলম্বন করিয়া উদরান্ন সংস্থান করিতে হয়। এমন কি যদি পরান্নে জীবন ধারণও করিতে হয়। তরুতলে বাস, অধিক কি কোথায় উত্থান, কোথায় শয়ন তাহারও যদ্যপি স্থিরতা না থাকে। অনন্তব্যাপী নক্ষত্র খচিত নৈশাকাশই যদ্যপি আমাদের একমাত্র আশ্রম স্থান হয়, তাহা হইলেও তোমার সহবাসে আমার সুখ ধরিবে না। তোমার মুখে হাসি দেখিলে আমি সকল যন্ত্রনাকে উপেক্ষা করিব। কিন্তু কুমার বল—বল, তুমি কি আমায় ভালবাস ?

কুমার সস্নেহে কমলের পুনর্ব্বার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "তোমায় ভালবাসি কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ কমল,—তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না ?"

কমল লজ্জিত হইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "না।"

———

নারীমাহাত্ম্য।

একদা নৈমিষারণ্যে সমবেত সনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষিমণ্ডলী পরম-তত্ত্বজ্ঞ, পৌরাণিক সত্তম, সুতনন্দন সৌতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৌতে। আমরা তোমার নিকট মহর্ষি দ্বৈপায়ন প্রণীত, সরহস্য অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি, তাহা বলিয়া জানাইবার নহে। তুমি ঐ সকল গূঢ়তত্ত্বের যে রূপ মর্ম্মজ্ঞ তাহা অন্যে কদাচিৎ সম্ভবে না। ফলতঃ মহর্ষি বেদব্যাস যে রূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ, তুমিও তাদৃশ অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও সদর্থ প্রকাশক। ভবাদৃশ ব্যক্তিই এই প্রত্নতত্ত্বের যথার্থ সদ্বক্তা, যাহাহউক আমরা তোমার মুখে এই অলৌকিক বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেও আর একটী বিষয়ে আমাদিগের অদ্যাপি শ্রবণ লালসা আছে, আমরা তজ্জন্য তোমাকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি আমাদিগের অন্যান্য সকল কৌতূহল যেমন পরিতৃপ্ত করিয়াছ, তদ্রূপ এ কৌতূহলটীও পরিতৃপ্ত কর।

আমরা শুনিয়াছি যেমন তোমার নিকট শ্রুত অষ্টাদশ পুরাণ সকল সংশয়ের ছেদক, এইরূপ ইহার অতিরিক্ত ঊনবিংশ পুরাণ নামে আর এক মহাপুরাণও ভগবান্ দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। অধিকন্তু সেই পুরাণে নারীমাহাত্ম্য নামে একটী অপূর্ব্ব উপাখ্যান আছে, তাহা শ্রবণে নাকি জীবের সকল দুষ্কৃতের বিমোচন হয়, অতএব আমরা সেই পুরাণ আদ্যোপান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি এই অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আমাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত কৌতূহল চরিতার্থ কর।

সুতনন্দন ঋষিকুল কর্ত্তৃক এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ, আপনারা আমাকে যে আদেশ করিলেন, তাহা অতি কঠিন ব্যাপার। আমি সে পুরাণের এখনও মর্ম্মজ্ঞ হই নাই; তবে তদন্তর্গত নারী মাহাত্ম্যের কথা যাহা আপনারা উল্লেখ করিলেন, সে পরিচ্ছেদটীর

আমি কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছি বটে, আমি আমার গুরুর নিকট তাহা যে রূপ অধ্যয়ন করিয়াছি তাহা আপনাদিগের নিকট যথাযথ বিবৃত করিতেছি। আপনারা সবিহিত চিত্তে সেই পাপনাশক, পুণ্য বিবর্দ্ধক, বিষয় শ্রবণ করিয়া ইহ পারলৌকিক শ্রেয়ঃ সাধন করুন্।

সৌতি কহিলেন—"একদা গোলকধামে পুরুষোত্তম নারায়ণ রত্নাসনে সুখাসীন হইয়া লক্ষ্মীসহ পাশক্রীড়ায় আবিষ্ট রহিয়াছেন। লক্ষ্মী নানা প্রকার আড়ি মারিতেছেন, নারায়ণ সক্ষম হইয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় হারিতেছেন, ও লক্ষ্মীর জয়োল্লাস দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতেছেন, কিন্তু প্রকাশ্যে যেন সাধ্যসত্বেও লক্ষ্মীকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছেন। এই ভাবে কিয়ৎকাল ক্রীড়ামোদে যাপিত হইলে নারায়ণ কয়েক বাজি হারিয়া, পরিতোষ লাভ করিয়া লক্ষ্মীকে কহিলেন "কমলে! আমি অদ্য তোমার ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি, বল দেখি তুমি এরূপ খেলা কতদিন শিখিয়াছ? তুমিত ইতি পূর্ব্বে কখন খেলায় জয়ী হইতে না, অদ্যতুমি কিরূপে আমাকে এমত পরাস্ত করিলে?" শুনিয়া লক্ষ্মী মনে মনে বলিলেন, "এখনই তোমার হারির কি হইয়াছে, আর কিছু দিন পরে হারি কাহাকে বলে তাহা দেখিবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি গোলোকে তোমার নিকট কবে পরাস্ত হইয়াছি? মর্ত্ত্য ভূমে নররূপে একবার আমায় হারাইয়াছ বটে, সেবার রামাবতারে সীতা রূপে আমাকে যা ঠকাইয়াছ, তাহার পর আর ঠকাইয়া হারাইবে ইহা মনেও করি না।" এইরূপ নানা কথাপ্রসঙ্গে রামাবতারের কথা উত্থাপিত হইলে লক্ষ্মীর সীতামূর্ত্তির কথা সমস্ত মনে পড়িল। তখন বনবাস, রাবণ, কর্ত্তৃক হরণ, অশোকবনে রাক্ষসী গণের তাড়না, পরে লোকাপবাদ ভয়ে রাম কর্ত্তৃক ছলে নির্ব্বাসন প্রভৃতি সমস্ত মনে উদয় হওয়াতে লক্ষ্মী একেবারে শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে অধীরা হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমশঃ নারায়ণের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া নারীজাতীর স্বাভাবিক ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধানে তৎপর হইলেন। তখন কমলাদেবীর নাসিকাগ্রে রোদন চিহ্ন অর্থাৎ লোচন প্রান্তে বারি বিন্দু দেখাদিল। ক্রমে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নারায়ণের দিকে বিমুখ হইয়া অধোবদনে কাল যাপন করিতে লাগিলেন,

ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগরূপ শরবাতে নারায়ণের ভৃগু পদাহত বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রভু দেখিলেন, যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। সন্ধিই শ্রেয়ঃ, কিন্তু সন্ধিইবা কিরূপে সমাহিত হয়। এক বার কৃষ্ণাবতারে ব্রজ-ভূমে এই বিপদগ্রস্ত হইয়া যে বিব্রত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে তাহা মনে উদিত হইল। ভাবিলেন, বৃন্দাবনে এই বিপৎপাতের সময় স্বয়ং কোন প্রতিবিধানে অসমর্থ হইলেও সন্ধি বিগ্রহের যোজককর্ত্রী বৃন্দাসখীর সাহায্যে সেবার পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি, এবার এখানে সেরূপ সহায় কেহই নাই, এবার সন্ধির প্রস্তাবকারী হয় এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না, করি কি? এইরূপ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া শেষে স্থির করিলেন, যাহাই হউক বৃথা ভাবিলাই বা কি ফলোদয়, এদিকে মুহুর্মুহু অস্ত্রাঘাতেও শরীর জর জর হইতেছে, আপনিই সন্ধির প্রস্তাবকর্ত্তা হই।

সৌতি কহিলেন, নারায়ণ এইরূপ ভাবিয়া, দেবির চিবুকাগ্রে নিজ দক্ষিণ হস্তটী স্পর্শ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে, খেলার সময়ে বহু-কালাতীত ঘটনা স্মরণ করিয়া এই সুখধামে দুঃখভাব প্রকাশ করা ভবাদৃশার যোগ্য নহে। রামাবতারে লোকশিক্ষার্থে নরদেহ ধারণ করিয়া লোকোপদেশার্থে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা কখনই আমার আন্তরিক নহে। তুমিও সেবার যে কিছু কষ্ট সহ্য করিয়াছ তাহাও আমার স্পৃহনীয় নহে। হে আয়তলোচনে, আমিও তোমার সেই দুঃখ বিমোচনার্থে কৃষ্ণাবতারে তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিয়াছি। দেখ রাধামূর্ত্তিধারিণী তোমার মানের দিবসে আমি কিপর্য্যন্ত তোমায় সম্মানিতা না করিয়াছি। এমন কি, চরণ ধারণ প্রভৃতিতেও পরিত্রাণ না পাইয়া অবশেষে দাসখত লিখিয়া কোটালি করিয়া, তোমার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছি। প্রিয়তমে! ইহাতেও কি তোমার সীতাবতারের দুঃখ অপনীত হয় নাই! ভাবিয়া দেখ, তোমার তুল্য নারীজাতি মধ্যে সৌভাগ্যশালিনী আর দ্বিতীয় কে আছে।" নারায়ণ শত শত বাক্য বলিতে লাগিলেন কিন্তু তথাপিও লক্ষ্মীর দুঃখভারাক্রান্ত চিত্ত শান্ত হইল না। তখন নারায়ণ অনুপায় ভাবিয়া ভর্ত্তা ভাবে লক্ষ্মীদেবীকে পুনর্ব্বার সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "বরাননে! আর অনর্থক

দুঃখ পরতন্ত্র হইয়া নিত্য সুখের ব্যাঘাত জন্মাইওনা; এক্ষণে তোমার যদি কিছু অভিলাষ থাকে তাহা আমার নিকট প্রসন্নভাবে ব্যক্তকর, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমার যাহা কিছু অভিলষিত হইবে, আমি তাহা অবিলম্বে শ্রবণ মাত্রেই প্রদান করিব, আমার এইভিক্ষা যে তুমি আর মৌনা থাকিয়া আমার হৃদয়ে শেলাঘাত করিও না। আমি তোমার প্রসন্ন-বদন না দেখিয়া যে কষ্ট সহ্য করিতেছি, আমার বোধ হয় তুমিও তাহা অজ্ঞাত নহ।"

অনন্তর নারায়ণের এইরূপ বচন পরম্পরা শ্রবণে ও অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে মর্ম্মাহত জানিয়া, দেবী কিয়ৎক্ষণের জন্য শরসন্ধানে নিবৃত্ত হইলেন। এবং স্বীয় অস্ত্রের প্রতিসংহাররূপ মধুসূদনের প্রতি একটী সতৃষ্ণ বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। মুররিপু তাহাতেই নিঃশল্যও প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনর্ব্বার সন্ধির প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নারায়ণকে নিতান্ত সন্ধি সমুৎসুক জানিয়া লক্ষ্মী মনে মনে অভিলষিত সন্ধির পণ নির্দ্ধারিত করিলেন। কিন্তু পাছে প্রভু সকল পণ স্বীকৃত না হন এই ভাবিয়া আর একটু পাকা পাকি করিতেও ছাড়িলেন না। অনন্তর কমলাদেবী এই ভাবে কথা আরম্ভ করিলেন। "দেব, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার মনঃকষ্ট নিবারিত হইতে পারে না। দেখুন, আমি অবলা, অবলা বলিয়া আমার প্রতি চির দিন আপনার এইরূপ প্রতারণা কি অন্যায় হইতেছে না। আপনি বলিলেন, রামাবতারে সীতারূপে আমাকে যে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা লোক শিক্ষার্থ, তথাপি আপনি আমার সেই কষ্টের প্রতিশোধের জন্য কৃষ্ণাবতারে রাধারূপিনী আমার চরণ ধারণ, কোটালী গ্রহণ, দাসখত লিখন প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু নাথ, ভাবিয়া দেখুন দেখি, এই সকল বাক্য কি আপনার চাটু বচন মাত্র নহে? বৃন্দাবনের নিবিড় বনমধ্যে মানব সমাগম মাত্র শূন্য স্থানে প্রথমে আমাকে প্রতারিতা করিয়া পশ্চাৎ একবার আমার চরণ ধারণ করাই কি বিনাদোষে গর্ভাবস্থায় বনবাসদানের প্রায়শ্চিত্ত! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তাহাইবা কয়দিন? আমাকে কিছুদিন সমাদৃতা করিয়াই আবার কি প্রত্যাখ্যান করেন নাই? মধুপুরে কুব্জারাণীর প্রসঙ্গ কি ভুলিয়া গেলেন। ভাল, আর একটী অবি-

চারের কথা দেখুন দেখি। রামাবতারে আমি যেমন সীতারূপিণী হইয়া দুঃখসহ্য করিয়াছি, অনন্তদেবও তদ্রূপ লক্ষ্মণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। কৃষ্ণাবতারে আপনি অনন্তদেবের সেই কষ্টের প্রতিশোধ জন্য তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু মথুরা গমন কালীন আমি পরিত্যক্তা হইলাম, বলদেব জ্যেষ্ঠ ভাবে সঙ্গে সঙ্গে সম্মানিত থাকিলেন, তবে দেখুন দেখি, উভয়কে আপনি সমান সম্মানিত করিলেন কই? অনন্ত পুরুষ বলিয়া তিনি চির সমাদৃত থাকিলেন, আর আমি স্ত্রী বলিয়া কিয়ৎকাল সমাদৃতা হইয়াই যে অনাদৃতা সেই অনাদৃতাই হইলাম। অতএব বলুন দেখি আপনার আমার প্রতি চির দিনের নির্দ্দয়াচরণ কি না?" ভগবান্ এই বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া প্রথমে অধোবদন হইলেন, পরে দেবীকে সম্বোধন করিয়া পুনরাপি বলিলেন, "দেবি, আর আমার ক্ষতে ক্ষার প্রদান করিও না, আমি যথার্থই তোমাকে অবমানিতা করিয়াছি। আমি এবার যথার্থই তোমার সেই অপমানের প্রতিশোধ করিব। আমি অদ্যহইতে তোমার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে তোমার দাসানুদাস হইয়া থাকিব। তুমি যখন যে আদেশ করিবে, অবিচারিত ভাবে তখনই তাহা প্রতিপালিত হইবে। শুদ্ধ এইমাত্র নহে, আমি অদ্য হইতে এই নিয়ম সংস্থাপন করিলাম, যে জগতে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই আমার মত পত্নীদাসত্বে নিযুক্ত হইবে। পত্নী যখন যে আজ্ঞা করিবেন, পতি মাত্রেরই তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। আর আমি মনুষ্য মূর্ত্তিতে তোমার প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করিয়াছি, অতএব মনুষ্য প্রতি কতকগুলি ইহার অতিরিক্ত বিশেষ নিয়মও নির্দ্ধারিত করিলাম।"

ভগবানের এই বাক্যে লক্ষ্মী প্রীতা হইয়া কহিলেন, "স্বামিন্। তোমার বাক্য কদাচিৎব্যর্থ হইবার নহে, তুমি যাহা বলিলে তাহা আমার প্রীতিকর, আমি অবশ্যই ইহাতে প্রসন্না হইব। বিশেষতঃ মানবজাতির প্রতি আপনি যে অতিরিক্ত কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন ইহাতে আমি সাতিশয় সন্তোষলাভ করিয়াছি। কিন্তু নাথ। সেই নিয়মগুলি আমি শুনিতে

ইচ্ছাকরি, আপনি তাহা ব্যক্ত করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

নারায়ণ বলিলেন, "দেবি। অতঃপর নবগণের যাহা করিতে হইবে তাহা যদ্যপি শুনিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, শুন; আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, ও তৎসঙ্গে নারীগণের যে মাহাত্ম্য নিরূপিত হইল তাহাও বিবৃত করিতেছি। অনন্তর নারায়ণ বলিতে লাগিলেন, "প্রথমতঃ এই নিয়ম হইল নারীগণ অতঃপর আর পুরুষের অধীন থাকিবেন না। তাঁহারা যেমন এতদিন পুরুষের দাসীবৃত্তি করিয়াছে, এক্ষণে পুরুষগণ তদ্রূপ তাঁহাদিগের শুশ্রূষা পরায়ণ হইবে। নারীগণ গুরুজন শঙ্কায় সদা সশঙ্কিত ভাবে এতদিন যাপন করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণ হইতে গুরুজনেরা তাঁহাদিগকে দেখিলেই সশঙ্কিত হইবেন। শ্বশ্রু, ননান্দৃ প্রভৃতি যে সকল গৃহিণীপদাধিষ্ঠাত্রীরা বধূদিগের চিরকাল যন্ত্রণার কারণ বলিয়া পরিচিতা, তাঁহারা এক্ষণে বধূদিগের মনোরঞ্জনার্থই নির্দ্দিষ্ট হইল—বধূদিগের সন্তুষ্টি সাধনাই তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইল। বিশেষতঃ শ্বশ্রুদিগের প্রধান কার্য্য এই হইল যে তাঁহারা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াই গৃহ কর্ম্ম সমাধা ও ষোড়শোপচারে বধূদিগের আহার্য্য পাক করণান্তর নিদ্রাভঙ্গ করাইবেন। বধূরা নিদ্রাভঙ্গের পরই হস্তমুখ প্রক্ষালন, কদাচিৎ স্নান করিয়াই যেন আহারীয় প্রস্তুত প্রাপ্ত হয়। ননান্দৃ বিধবা হইলে তাঁহারও এইকার্য্য ও সাধ্যমত বধূদাসীত্ব কর্ত্তব্য হইল। বধূদিগের কার্য্য কেবল আহার, নিদ্রা, তাসক্রীড়া, কদাচিৎ কার্পেট বোনা এবং বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে শ্বশ্রু ননান্দৃর কৃত কার্য্যের দোষ নির্ব্বাচন করা মাত্র। পতিরা প্রাতঃকাল হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যাহা কিছুকার্য্য করিবেন, তাহার উদ্দেশ্য পত্নীর সন্তোষ সাধনই, মাত্র হইবে। অর্থাৎ পতিরা এই নিয়মাধীন হইবেন যে, প্রাতঃকালেই তত্ত্বাবধারণ করিবেন জননী, ভগিনী প্রভৃতিরা নিয়মিত কার্য্য করিয়াছেন কিনা, যদি কাহার ও কোন কার্য্যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য বা ত্রুটী দেখেন তবে তৎক্ষণাৎ তাহার উচিত দণ্ড বিধান করিবেন। পরে পত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তত্ত্বাবধান করিবেন, তাঁহার প্রাতরাশ নির্ব্বিঘ্ন কিনা। পরে যাঁহারা চাকরী

উপলক্ষে প্রভুর পাদুকা বহনার্থ গমন করিবেন, তাঁহারা যথা সম্ভব আহার করিয়া কিয়ৎক্ষণ রমণীপদমর্দ্দন পুরঃসর কর্ম্মস্থানে গমন করিবেন। তথায় যথাসম্ভব শ্বেতাঙ্গের সেবা বরণ পূর্ব্বক প্রায় সূর্য্যাস্তকালে স্বগৃহে প্রত্যাগমন কালীন বাজার হইতে রমণীর আজ্ঞামত যাকিছু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবেন, একার্য্যে তাঁহাদিগের প্রতুলা প্রতুলতা কিছু আপত্তি থাকিবে না। অনন্তর গৃহাগমন মাত্রেই পত্নীর দৈনিক স্বাস্থ্যের অগ্রে তত্ত্বাবধান করিবেন। পরে কিঞ্চিৎ মিষ্টভৎসনা (দুই টারা গালি) জলযোগ করিয়া বেশপরিত্যাগের পর একবার শ্রমহারিণী তামাকু দেবীর স্বাদ গ্রহণের অবকাশ পাইবেন, পরক্ষণেই পত্নীর আদেশমত কার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন। এই ভাবে সম্ভব মত আহার বিহারাদি করিয়া তিনি নিশাযাপন করিতে পাইবেন, কিন্তু যাহা তাঁহার পক্ষে পত্নী বিধান করিবেন, তিনি তাহার অতিরিক্ত কোন বিষয়ে বাক্যব্যয় করিতে সমর্থ হইবেন না। মাত্রভিন্ন সামান্য কারণে বা অকারণে পত্নীর যে ক্রোধোদয় হইবে, তাহাও তাঁহাকে ভঞ্জন করিতে হইবে। ক্রোধোপশম নিমিত্ত পতিকে চরণ ধারণ, মাতাকে প্রহার, ভ্রাতাকে পরিবর্জ্জন, বন্ধু সমাগমত্যাগ, এগুলি পত্নী ইচ্ছা মাত্রেই করিতে হইবে।

হে দীর্ঘাপাঙ্গি! আমি পত্নীর প্রতি পতির যাহা কর্ত্তব্য তাহা তোমাকে বলিলাম, কিন্তু পত্নী অর্থে এখন হইতে কেবল বিবাহিতা রমণীই বুঝিও না। অনেক স্থলে পত্নী অর্থে এখন হইতে উপপত্নীও বুঝিতে হইবে; নচেৎ সকল স্থলেই পত্নী শব্দে এক বিবাহিতা নারীকেই বুঝিলে এ নিয়মের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। ফলতঃ বিবাহিতা, অবিবাহিতা, যাঁহাই হউক, নর মাত্রকেই কোন না কোন নারীর এইরূপ সেবা পরায়ণ হইতে হইবে। আর বিবাহের নিয়মও এক্ষণ হইতে পূর্ব্ববৎ থাকিবে না। নিত্য নৈমিত্তিক দৈনিক, ক্ষণিক প্রভৃতি নানা প্রকার বিবাহ এখন হইতে প্রচলিত হইবে। সে সকল বিবাহের কথা এস্থলে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক দোষ ঘটিবে। ইতি পূর্ব্বে আমার পূর্ব্ব সহযোগী শ্রীমান্ বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় তাহা এক প্রকার ব্যক্ত করিয়াছেন, যদি তোমার জানিতে কৌতূহল হয় একবার

বঙ্গদর্শনে বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের বক্তৃতা পাঠ করিলেই সে কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবে।

ক্রমশঃ

নববর্ষ।

দেখিতে দেখিতে একটী বৎসর আমাদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল ; ১২৯১ সাল আর নাই, কাল যাহা স্বীয় প্রভাবে আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছিল, আজি আর তাহা নাই, পৃথিবীর মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অন্বেষণ করিয়া দেখ আর ইহার অস্তিত্ব কোথাও নাই ; দিনের পর দিন আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে—মাসের পর মাস আসিতেছে ও যাইতেছে, বৎসরের পর বৎসর ... ছে, কিন্তু কেহই যাইবার সময় একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে না, যে যায় সে আপনিই যায়, কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, এই বৎসরের মত, এই নশ্বর জগতে যে কেহ যায়, সে আর ফিরিয়া চাহিয়া দেখে না, সে আপনার প্রভায় আলোকিত হইয়া—কেহ বা হাসাইয়া কেহ বা কাঁদাইয়া চলিয়া যায়, কিন্তু লোকে তাহার জন্য হাসিতেছে, না কাঁদিতেছে দেখিবার জন্য মুহূর্ত্ত কালও অপেক্ষা করে না। সে সংসারের উপকার করিল, কি অপকার করিল—লোকে তাহার যাওয়ায় আহ্লাদিত, কি দুঃখিত হইল, তাহা দেখিবার জন্য ফিরিয়া দেখিবার অবসরটুকুও লয় না। সংসারের সকলের প্রতিই দৃষ্টিপাত কর—সকল সম্বন্ধেই এই নিয়ম, ১২৯১ সাল চলিয়া গেল, ১২৯২ আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিল ; কিন্তু পরিত্যক্ত বৎসর লোকের ভাল করিল, কি মন্দ করিল, তাহা দেখিবার জন্য তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিল না, সময় আসিল—সে আপনিই চলিয়া গেল, কাহাকেও সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত ডাকিল না। সময় স্রোত ক্রমিক যাইতেছে—কখনই বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, আসিতেছে আর চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া

যাইতেছে। মনুষ্য স্রোতও তাহাই; আসিতেছে, আর কাল চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া যাইতেছে; যখন সময় হইল, তখন মনুষ্য আপন প্রভায় দশদিক আলোকিত করিল, মহাপ্রতাপে সংসার রণক্ষেত্রে দেখা দিল—কার্য্য করিতে দশ জনের সাহায্য চাহিল—কখন বা নিজের প্রতাপেই বলীয়ান হইয়া অপরের বল তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিল—পুনরায় সময় বিভিন্নভাবে আসিল—সে আর কাহাকেও চায় না—পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দেখে না—সে আপনার গোঁয়ে আপনি চলিল—কাহারও কথা শুনে না—কাহারও কথা মানে না। যেন সে আপনার বলেই বলীয়ান—যেন তাহার ক্ষমতার নিকট আর কাহারও ক্ষমতা তিষ্ঠিতে পারে না, সে তখন আর কাহাকেও চায় না—যে তাহার জন্য এক সময় স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিল তাহাকেও নয়—যে তাহার চিরকালের সুখ-দুঃখের সমস্ত অংশ-ভাগী—চির সহচর ও সুহৃৎ তাহাকেও নহে—সে তখন আর কাহাকেও চায় না। যাহাকে সে মুহূর্ত্তমাত্র না দেখিলে বাচিত না—যে তাহাকে ক্ষণকাল না দেখিলে মরিয়া যাইত, তাহাকেও নহে। বিধাতার এ এক প্রকার কৌশল বটে। এ বিচিত্র কৌশলের মর্ম্ম হীনবুদ্ধি মানব কি বুঝিবে? লোকে যখন সংসার ক্ষেত্রের কর্ম্মের ভারে ক্লান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে—যখন অনন্তে যাইয়া মিশিবার জন্য প্রস্তুত হয়—তখন কি বিচিত্র কৌশলে তাহার নিকট হইতে আজন্ম প্রতি-পালিত—ও পরিপোষিত মায়া মমতা পাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা অল্পবুদ্ধি মানব কি বুঝিবে? বিধাতঃ! যে যায় তাহার যেমন মায়া মমতা, দয়া-স্নেহ কিছুই থাকে না—সবই তাহার সঙ্গে চলিয়া যায়, তেমনই যাহারা পড়িয়া থাকে, তাহাদেরও কেন তাহার অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে, স্নেহ-মায়া সমস্ত চলিয়া না যায়, জগদীশ্বর যেমন সকল বিষয়েই সাম্য রক্ষা করিতেছেন—এ বিষয়ে এত বৈষম্য কেন? যাহারা পড়িয়া থাকে—তাহাদিগকে কি আজীবন যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই, ঈশ্বরের ন্যায়রাজ্যে এরূপ বিচার, না মানবের এইরূপ স্মৃতির অসহ্য বৃশ্চিক দংশন তাহার পক্ষে মঙ্গল কর—আমরা হীনবুদ্ধি; ইহার ত কিছুই বুঝিতে পারি না। স্মৃতির জ্বালা হৃদয়ে জাগরুক রাখিয়া মানবের কি

মঙ্গল সংসাধন হয়, আমাদের অল্প বুদ্ধিতে তাহার ত কিছুই ধারণা করিতে পারি না। বিধাতঃ তুমি মঙ্গল ময, অবশ্য ইহা তোমাব কোন মঙ্গলময কার্য্য, কিন্তু মানবকে তাহা বুঝিতে দাও না কেন? মনুষ্য বুঝিতে পারিলে হৃদয়কে ত কতকটা আশ্বস্ত করিতে পাবে। তাহাব হৃদয়েব শান্তি কি তোমার অভিপ্রেত নহে; যাহাব হৃদয প্রচণ্ড সূর্য্যকবদ্দীপ্ত মরুভূমিব ন্যায়—যাহাব হৃদয় সমুদ্রেব জল পান করিতে চায়—তাহার হৃদয়ে বিন্দু পরিমিত জল দেওয়াও কি তোমাব অভিপ্রেত নহে। ইহা কি তাহার প্রায়শ্চিত্য? যদি তাহা হয়, তবে কোন ভীষণ পাপেব এ ভীষণ প্রায়শ্চিত্য, তাহা কি সে শুনিতে পাবে না, শুনিলে সে যদি আপনাকে সংশোধন করিতে পাবে—তাহা কি তোমাব অভিপ্রেত নহে? জানি না—দেব! তোমাব কি প্রকাব বিচার। যে যায় তাহাব আব কিছু থাকে না; থাকে কেবল স্মৃতি; সে আপনাব সঙ্গে মাযা মমতা সমুদায়ই লইয়া যায়। সে যায় আব আসে না, কিন্তু পৃথিবীব লোক সংখ্যা কি তাহাব গমনে কমিল? না কখনই নয; যেমন একদিক দিয়া কতকগুলি প্রস্থান কবিতেছে,—অমনি অন্য দিক দিয়া আর কতকগুলি আসিযা প্রবেশ লাভ করিতেছে, মনুষ্য স্রোতের বিবাম নাই—বিশ্রাম নাই। যেমন ১২৯১ সাল হাসাইয়া—কাঁদাইযা জন্মেব মত চলিয়া গেল—আর কথনই ফিরিবে না; তেমনই ১২৯২ সাল আসিয়া তাহাব স্থান অধিকাব কবিল। ১২৯১ সাল যেমন এ হতভাগার ন্যায় অনেককে কেবল কাঁদাইযাছে—অনেকেব আশা কলিকা একেবারে বিমর্দ্দিত কবিয়াছে—উত্থানের আশা একবাবে নষ্ট কবিয়াছে জানি না ১২৯২ সাল আবাব তাহাদের ভাগ্যে কি ভাবে সমুদিত হইতেছে। নববর্ষ আপনাব ভবিষ্যগর্ভে কি ধবিয়া বাখিয়াছে? তাহাদিগকে কাঁদাইবাব আব কতপ্রকাব অসহ্য নূতন নূতন যন্ত্রণা স্থিব করিয়া রাখিয়াছে? না নববর্ষ তাহাদেব হৃদয়ে কতকটা শান্তিবারি নিক্ষেপ করিবে। জানি না নববৎসব সুখের—কি দুঃখের হইয়া সমুদিত হইয়াছে।

ব্রজপতি।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ভারতবাসী সাপ্তাহিক পত্র। নগদ মূল্য দুই পয়সা। ক্রাউন প্রেস কলিকাতা।

এই বৃহদাকারের পত্র খানি বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদকীয় কার্য্য অতি গুরুতর, সে ভার বাবু হরিদাস গড়াগড়ীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। হরিদাস বাবু সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তিনি একজন বিচক্ষণ ভাষাজ্ঞ বহুদর্শী সুলেখক। তাঁহার দ্বারা যে ভারতবাসী অচিরে প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রিয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যে কয় সংখ্যা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে ইহার লেখকদিগের চিন্তাশীলতা ও পার-দর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি। আশা করি, ভারতবাসী দীর্ঘজীবি হইয়া, ভারতবাসীর অশেষ বিধ মঙ্গলময় কার্য্যের সহায়তা করিয়া, স্বদেশের স্বজাতীর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবে।

আজ কাল বাঙ্গালী, সংবাদ পত্র পাঠ করিতে শিখিয়াছেন, সংবাদপত্র প্রচারের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং সাধ্যমত উৎসাহ দিয়া স্বদেশের, স্বজাতীর গৌরব বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন। সুতরাং এ সময়ে, এ সুখের দিনে, বাঙ্গালীর নবজীবনের অভ্যুর্থানের সময়ে, ভারতহিতৈষী ভারতবাসী যে অক্ষয় পোষকতা প্রাপ্ত হইয়া অমীত-তেজে অসীম সাহসে, বীরদর্পে, আপন কর্ত্তব্য পালনে কৃতকার্য্য হইয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবাসী সম্বন্ধে আর একটী বলিবার বিশেষ কথা আছে, এ পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রায় সামান্য লোকদিগের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। অতি অল্পই ধনী, ব্যবসায়ী লোক এই শুভকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু আজি আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এখানি সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নহে।

এখানি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ও ব্যবসায়ী পি এম সুর কোম্পানির যত্নে প্রচারিত হইতেছে। সুতরাং আশা আছে যে, অর্থের দ্বারা সংবাদ পত্রের যত কিছু উন্নতি করিতে পারা যায়, তাহা ইহাঁরা করিতে ত্রুটী করিবেন না।

ভারতবাসীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্যারীলাল নিয়োগী একজন শিক্ষিত কর্ম্মঠ সুচতুর শ্রমসহিষ্ণু, উদ্যমশীল যুবক, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার যত্নে ইহার ক্রমোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। এখন প্রার্থনা করি ঈশ্বর তাঁহার সহায় হউন এবং আশীর্ব্বাদ করি প্যারীলাল তাহার এই শুভ উদ্যমে কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণের প্রীতি ভাজন হউন।

ভারতবাসী বঙ্গের উচ্চ শ্রেণীর সংবাদ পত্র মধ্যে স্থান পাইবে ও পাইয়াছে। ইহার লেখা সতেজ ও গম্ভীর। দুঃখের কথা লিখিতে রসিকতার বুকনি দিতে ইহাঁরা জানেন না। "তাঁবুর ছড়াছড়ি, সাদা মাথার গড়াগড়ি, উইলসেনের খাড়া বড়ি—হুড়ুম হুম, গুড়ুম গুম্" প্রভৃতি পাঁচালির ছড়ার ন্যায় শ্রুতি মধুর বাক্য লহরীতে আধুনিক অর্দ্ধ বা অশিক্ষিত পাঠকদিগের নিকট বাহবা লইতে অভিলাষী নহেন। বস্তুতঃ যাঁহারা অতি সুলভ মূল্যে বৃহদাকারের সারগর্ভ প্রবন্ধপূর্ণ সংবাদ পত্র পাঠ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা ভারতবাসী পাঠ করিতে কখন যেন বিস্মৃত না হন, ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ২৲টাকা ব্যয় করিতে যেন কুণ্ঠিত না হন।

দৈনিক, কলিকাতা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। নগদ মূল্য এক পয়সা।

বঙ্গবাসীর সত্ত্বাধিকারীগণ দিন দিন সুলভ মূল্যের সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইতেছেন, ও স্বদেশের মহোপকার করিতেছেন। দৈনিক সপ্তাহে পাঁচ দিন প্রকাশিত হয়, বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র। আমরা দৈনিকের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিলে নিতান্ত প্রীত হইব।

দামোদর তীরে।

সময় নিশীথ।

ফাল্গুণ মাস; সময় নিশীথ; কৃষ্ণ সপ্তমীর ক্ষীণ চন্দ্র পূর্ব্বগগনে প্রকাশিত হইয়াছে; লোকজনের কোলাহল নাই; পক্ষীকুল আর মধুর স্বরে তান ধরিতেছে না—কেবল মধ্যে মধ্যে বসন্তসখা প্রাতঃকাল হইল ভাবিয়া এক একবার থাকিয়া থাকিয়া কুহু কুহু স্বরে পঞ্চমে ঝঙ্কার দিতেছে—তাহার শব্দ শুনিয়া কোকিলা জাগিল—এখনও অনেক রাত্রি বলিয়া সে আপনার স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল—কোকিল বুঝিল না; দুই জনের মিষ্টালাপে প্রতিবেশী পিকদের [illegible]দ্রা উড়িল—এসে উঠিয়া [illegible]; [illegible]বর জাগি[illegible] [illegible] মধুর কণ্ঠে তান ধরিল—তাহাদের দেখাদেখি দূরস্থ বৃক্ষ হইতে একটী তান তাহার সঙ্গে মিলাইল—ক্রমে চারিদিক হইতে মধুর শব্দ মিলিত হইল—সেই পঞ্চম স্বরে—সেই কোকিল কোকিলার সুধাময় ঝঙ্কারে বনস্থলী মুহূর্ত্ত জন্য মাতোয়ারা হইল; তাহাদেরি দেখাদেখি পাপিয়া সপ্তমে আপনার কণ্ঠ তুলিল; আবার মুহূর্ত্ত জন্য সব নীরব হইল—কোকিল-কোকিলার আর সে মধুমাখা স্বর নাই—পাপিয়ার সে মনোহর তান নাই, সকলই নিস্তব্ধ—জগৎ নিস্তব্ধ; যেন পৃথিবী লোকের কোলাহল হইতে নিস্তার পাইল—ধ্যান নিমীলিত নেত্রে তাহার শ্রষ্ঠা, সেই বিশ্ব-নিয়ন্তাতে আপনার দেহ মন সমর্পণ করিয়াছে—পৃথিবী তখন যেন সমাধিমগ্ন যোগীবরের ন্যায়; নিবাত—নিষ্কম্প; দামোদর তীরে অসংখ্য বৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান—সপ্তমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোক বৃক্ষের নবোদ্গত পত্রের উপর মনস্বা শোভা দেখাইতেছে, কিন্তু নিবাত-নিষ্কম্প; নদীর পরপারে দৃষ্টি গেল—দেখিলাম একটী বিস্তীর্ণ অরণ্য; সেখানে ক্ষীণ চন্দ্রকিরণ ঝলসিতেছে না—তাহার উপরিভাগ অন্ধকারময়—ভিতর ভয়ানক গাঢ় কালিমা ময়, কিন্তু নিবাত-নিষ্কম্প; [illegible] বক্ষে দৃষ্টিপাত করিলাম—দেখিলাম একটী অতি বিস্তৃত শ্বেত [illegible]ন্ত রহিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি গেল, ততদূর দেখিলাম সেই বিস্ত-

স্থিত আস্তরণ—নদীর পর পারেও তাহাই; তবে আমার নিকটবর্ত্তী আস্তরণ হইতে কিঞ্চিৎ মলিন; যেন দামোদর বক্ষের উভয় দিকে দুইটী বিস্তীর্ণ শয্যা সজ্জিত রহিয়াছে; কিন্তু নিবাত-নিষ্কম্প; তাহার মধ্যভাগে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মাকারে একটী গাঢ় কালিমাময়-রেখা সেই শ্বেত আস্তরণে সমান্তর রূপে শায়িত রহিয়াছে—মনে করিলাম ইহা বুঝি প্রকৃতি দেবী মনোমত উপাধান; কিন্তু নিবাত-নিষ্কম্প। সপ্তমীর চন্দ্র ক্রমে উর্দ্ধগগনে আসিয়া উদয় হইল—দামোদর বক্ষে আস্তরণ মধ্যস্থিত কালিমাময় রেখা ঈষৎ প্রফুল্লিত হইল—দেখিলাম গগনস্থিত স্থির চন্দ্র সেই উপাধানে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল—স্বর্গের চন্দ্র মর্ত্তে শয়ন করিল—দেখিবার জন্য, আকাশের নবোঢ়া বধূগুলি উঁকি মারিল—সে শয্যা দেখিয়া আর স্বরগের শয্যা তাহাদের ভাল লাগিল না—তাহারাও আনমনে সেই শয্যায় আসিয়া মস্তক ন্যস্ত করিল; তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া, প্রকৃতি দেবী ঈষৎ হাসিল—তাঁহার হাস্যে পবন দেবের ঘুম ভাঙ্গিল—সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; সুধাকর ও স্বর্গাঙ্গনাগণ গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না—হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; তাহার হাস্যে চন্দ্রমা চঞ্চল হইল—দিবাঙ্গনাগণ লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল আর দেখা গেল না; চন্দ্রমা তাহাদের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইল, সেই উপাধানের উপর সর্ব্বত্রই চকমক্ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; পবন তদ্দর্শনে আরও উচ্চ হাস্যে হাসিয়া উঠিল; চন্দ্রদেব ব্যতিব্যস্থ হইয়া পড়িল, চন্দ্রের এই অবস্থা দেখিয়া সমীরণ থামিল,—স্বর্গাঙ্গনাগণ আসিয়া যুটিল—চন্দ্র নিরস্ত হইল—পুনরায় সেই নিবাত—নিষ্কম্প ভাবে জগৎ পূর্ণ হইল, কোন শব্দ নাই—এই লোক পরিপূর্ণ কোলাহলময় পৃথ্বী পুনরায় নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হইল; প্রকৃতি পুনরায় গম্ভীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সে ধীর-গম্ভীর মূর্ত্তির তুলনা নাই—আবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম সে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিবার লোক নাই; একা দেখিয়া মন পরিতৃপ্তি হইল না, তাই চক্ষু নানাদিকে প্রাণীর অন্বে[ষণ] করিতে লাগিল—কিন্তু কেহই মিলিল না—চক্ষু চারিদিক চাহিয়া নিরস্ত হইল, মনে সহসা একটু ভয়ের আবির্ভাব হইল—এক্ষ[ণ]

ভয়ের কারণ ছিল না—সহসা কোথা হইতে ভয় সমুদ্ভূত হইল, বুঝিতে পারিলাম না; জিজ্ঞাসা করি—এমন লোক দেখিতে পাইলাম না; সহসা মনের দিকে হৃদয় আকৃষ্ট হইল—হৃদয়কে এ ভয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—হৃদয় থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—আমিও সহসা চমকিয়া উঠিলাম; হৃদয়ের গতি বলবতী হইল—হৃদয় কম্পিত স্বরে উত্তর দিল—"হতভাগ্য! কাহাকে জিজ্ঞাসিতেছ? এ সংসারে তোমার কেবল আমিই আছি; আমাকে আবার বিরক্ত করিতেছ?" উত্তর শুনিয়া আমি কম্পিত হইলাম; মনে ভাবিলাম—সত্যই কি আমার কেহ নাই, প্রাণের দিকে মন ফিরাইল—দেখিলাম শূন্য; বুঝিলাম সত্যই কেহ নাই; এই বিশাল জগতের মধ্যে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই—অহো! বিধাতঃ কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত? যখন বুঝিলাম আর হৃদয় মন, হৃদয় নাই—তখন প্রকৃতির সে স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি আর এক প্রকার নবে ধূসরের সঙ্গে প্রতীয়মান হইল; প্রকৃতির সে রমণীয়তা নাই—সে মনোহারিত্ব নাই—যেন কি ভয়ানক—কি যাতনা পূর্ণ—কি বিভীষিকাময়। সেখানে সেইরূপ অবস্থায় আর দাঁড়াইতে সাহস হইল না—মস্তক ঘুরিয়া গেল—আমি বসিয়া পড়িলাম। এমন সময় নদীবক্ষে শৃগাল ডাকিল "ও কে হে"; ডাক শুনিয়া হৃদয় আশ্বস্ত হইল—ভাবিলাম আমি একা নহে; এ জনশূন্য স্থানে আমি একা নহি; আরও প্রাণী আছে; হৃদয় সাহসে পূর্ণ হইল—কোথা হইতে আবার নূতন ভাব হৃদয়ে সমুদিত হইল—আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আবার সেই প্রকৃতি নবভাব ধারণ করিল; হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল—মন বুঝিল আমি যেখানেই থাকি না, একা নহি—সেখানে সেইরূপ প্রাণী মিলিবেই; একা কেহ কখন বাস করিতে পারে নাই—পারিবে না। হৃদয়ে পূর্ণ হইল—এ সংসারে আমি একা কিসে? এমন সময় পূর্ব্বগগনে দৃষ্টিপাত হইল—দেখিলাম ফরসা হইয়াছে—প্রাতঃসমীরণ মৃদুমন্দ বহিয়া হৃদয় সুশীতল করিতেছে, আমি গৃহে চলিলাম।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

বিরহ।

—০:০—

১

কে বলে গগন ভালে পূর্ণ শশী শোভা করে,
কে বলে মধুরা নিশি হাসে তাহে প্রেমভরে,
কে [illegible] তাহা[illegible] সতী,
হাসে এই [illegible]মতী,
কে বলে নীরদ কোলে তারাদল ঝলমলে,
বিমোহিত করে চিত ভাবুকের কুতূহলে ?

২

কে বলে শ্যামলা নিশা ভীষণা নয়নে হাসে,
ঘনতর ঘনবর তাহে যদি ধীরে ভাসে,
কে বলে কোকিল বর,
ধরে সুমধুর স্বর,
নিখাদ পঞ্চমে তুলে মাতায় মানব মন,
পরতে পরতে উঠে কেন বল অকারণ ?

৩

খাম্বাজ ঝিঁঝিট নাকি বিমোহিত করে প্রাণ,
দেখিয়াছি,—দেখিতাম থাকিলে সে তান্‌মান,
আঁধার হৃদয় মন,
আঁধার এ ত্রিভুবন,
আঁধার সকলি হেরি কেন বল দেখি আজি,
লুকাল কোথায় হায় জগতের শোভারাজি।

৪

নহে দূর দেশ এই, নহে বহু দিন গত,
আসিয়াছি প্রীতি হেতু একটী মাসের মত,
অমানিশা দিয়া কোর,
দ্বিতীয়া হয়নি ভোর,
একটী পূর্ণিমা নিশি দেখিয়াছি জানি মনে,
এখনি কাঁদিছে প্রাণ কার তরে অকারণে ?

৫

অকারণে, না না মিছা, অসংখ্য কারণ আছে,
জগতের যত সুখ জানি সুধু তার কাছে,
সে, মোর হৃদয় মন,
আঁখি নব প্রাণ ধন,
তারে ছাড়ি চক্ষু মি, আজি—নীর ছাড়া মীন কেন,
প্রেম ছাড়া প্রাণ, ছি ছি আমি ছাড়া প্রিয়জন !

৬

প্রণয় রূপিণী প্রিয়ে, তুমি স্নেহ-স্বরূপিণী,
তুমি মন, তুমি ধন, প্রেমময়ী সুহাসিনী,
এক বৃন্তে ফুল মত,
বাঁধা আছি অবিরত,
দ্বাদশ বৎসর গত, নহেক একটী দিন,
তোমা ছাড়া প্রেয়সীরে করে প্রাণে প্রাণহীন।

৭

তুমি মোর চক্ষু মন কল্পনার সহচরী,
দেখিলাম, বুঝিলাম, আজি কে লো প্রাণেশ্বরী,
তোমা ছাড়া প্রাণাধার,
সুধুই আঁধার সার,
সাহারার মরু প্রায় কেবল জলিয়া যায়,
বারি পুষ্প লতা হীন বিভীষণ মহাকায়।

৮

প্রণয় স্বরগ ভূমি, প্রেম ছাড়া সুখ নাই,
প্রণয়ী প্রেমিক সদা এক সূত্রে গাঁথা তাই;
এ প্রেম বুঝে না সবে,
কোথা সুখ তবে ভবে,
ভেক কবে কমলিনী করিয়াছে সুধাপান,
এক সরোবরে রয়, নয় তবু এক প্রাণ।

৯

তোমা সুখে ভাগ্যবান আমি ভাবি জানি মনে—
তোমা বিনা সহি কত জ্বান প্রিয়ে এ জীবনে,
যায় প্রাণ, আর নয়—
দূরে যাও আশা চয়
চলিলাম, ছুটিলাম, তাহারে ধ... বুকে—
হেরিলে যাহারে প্রাণ পুলকিত হয় সুখে।

কমল কুমারী।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুখের শেষ।

এইরূপ অনন্ত সুখে কমলের দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল। কমল কুমারী মহাসুখে মহানন্দে কুমার-সন্দর্শন-সুখভোগে দুইটী বৎসর কাটাইল। দুইবার হাসিতে হাসিতে শারদীয় জ্যোৎস্না চলিয়া গেল, দুইবার রঙ্গ সহ

বসন্তের মৃদু অনীল তাহাদের কোমল দেহায়তন পরিতুষ্ট করিল। আজি সেই সুখ শান্তিময় দুইটী বৎসর অতীত হইয়াছে। এখন আর কমল বালিকা নহে, এখন তাহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, যৌবনের মন-মুগ্ধকর মোহিনী ছটা তাহার অঙ্গে অঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে। পুরাতনে নূতনের সমাবেশ হইয়াছে, কমল কুমারীর জীবন-বর্ষে আজি বসন্ত উদয় হইয়াছে— মধুর ফাল্গুণ মাস দেখা দিয়াছে।

পাঠক! তুমি সেই দ্বাদশ বর্ষিয়া কমল কুমারীর বালিকা বয়সের সুন্দর রূপ-বিভায় এক দিন চক্ষু জুড়াইয়াছ, কিন্তু আজি তাহাতে আবার কি নূতন শোভা হইয়াছে তাহা দেখিবে না কি? আজি তোমার সেই ...স্তকারী রম্যকাননের কচি কচি চাবা গাছগুলিতে কি ফুল, কি ...কি কুড়ি, কি বল্লরী, স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া তোমার নয়ন সমুখে রহিয়াছে, তাহা আঁখি মেলি দেখিবে না কি?

সেই বালিকা বয়সেব চক্ষু দেখিয়াছ, আজি আবার তাহার ভাবান্তর দেখ, কি মনোহর উজ্জলতায় পবিপূর্ণ,—ওষ্ঠ যুগল কে যেন অল্প অলক্তকে রঞ্জিত করিয়াছে,, বিধাতঃ তুমি সেই অবধি কেবল কমলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেই নিযুক্ত আছ? বক্ষেব কি মোহন ভাব! বস্তুতঃ দূর হইতে দেখিলে কমল মানবী বা সুচতুর ভাস্কর নির্ম্মিত প্রস্তব মূর্ত্তি তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

নিতম্বিনীর নিতম্ব ভাব কি পরিপাটী, উরুদেশ কি মনোহব—তায় আবাব তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ সূক্ষ্ম বসন ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। কে এমন সুন্দর পদ যুগলের সৃষ্টি করিয়াছিল রে? কুঞ্চিত কেশ দাম যেন উন্মাদ ভাবে সেই পদ চুম্বন করিতেই ধাবিত। কি অঙ্গুলির গঠন পারিপাটা—সুন্দব, সে সৌন্দর্য্যের উপমা নাই—দন্তাবলী এমন সৌন্দর্য্য সহকারে সন্নিবেশিত যে তাহার উল্লেখ কবা যায় না, যে সেই কমল মুখের মধুর হাসি দেখিয়াছে, সেই জানে যে তাহা কত সুন্দর, তাহাতে বিধাতার কি অপরূপ শিল্প নৈপুণ্য বিরাজমান।

কমলের বেশ বিন্যাস করা নাই—এক দিন কুমার তাহাকে বেশ বিন্যাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কমল তাহার প্রতি উত্তর দিয়াছিল, যে

দিন সমাজ-চক্ষে তুমি আমার, আমি তোমার হইব, সেই দিন বেশ বিন্যাস করিব,—এখন নয়।

কুমার বলিয়াছিলেন "না কর ক্ষতি নাই, তাহাতে তোমার সৌন্দর্য্য বাড়িবে না, তবে ভাবান্তর মাত্র।"

আমরাও বলি প্রকৃত তাই—কাহার সাধ্য এ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে? ইহা যতদূর বাড়িবার তাহা বাড়িয়াই আছে। এই ত বসন্ত কাল, আজি কমল কুমারী একখানি পরিস্কার কাপড় পরিয়া একটী নির্জ্জন প্রান্তরে একাকিনী অনন্ত প্রকৃতি ভাণ্ডারের—বসন্তের, নবীন শোভা দেখিতেছে। আমরা বলি প্রকৃতিকে আপন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া লজ্জা দিতেছে। কেশ অরচিত পৃষ্ঠ দেশে বিলম্বিত, মৃদু অনীল তাহাদিগকে লইয়া পরম কৌতু... করিতেছে, কখন বা মাতিয়া উঠিয়া রমণীকে ব্যতিব্যস্ত ক... রমণী মৃদু হাসিয়া শশব্যস্তে বসন সাবধান করিতেছে, মনে মনে প্রাণশূ... বায়ুকে ভৎ র্সনা করিতেছে—অমনি অপাঙ্গে এদিক ওদিক চাহিতেছে। পাঠক! কাহার জন্য কমল এখানে? তাহা কি আর বলিতে হইবে?— কিন্তু কই কুমার কোথায়? সূর্য্য যে অস্ত যায়, সন্ধ্যা যে আর থাকে না? এ শোভা, এ অনন্ত শোভা আর তিনি কখন দেখিবেন?

আজি দুইটী বৎসরের পর কমলের চক্ষু আবার সজল হইল, কুমার আজি আবার আসিলেন না। আজ কাল করিয়া সপ্তাহ গেল আবার কুমার অদৃশ্য, হা বিধাতঃ! কমলকে কেন কাঁদাও—ও চক্ষু ত কাঁদিবার জন্য সৃজন কর নাই।

সপ্তাহ, সপ্তাহ করিয়া মাস অতীত হইল, কিন্তু কুমার আসিলেন না, দিনে দিনে কমলের মানসিক যাতনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, দিনে দিনে বিভাকর বিহনে কমল শুকাইতে লাগিল।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে দিল্লী হইতে হিন্দু দাসেরা সেই পর্য্যন্ত প্রতি দিন কমলকে নানা বিধ আহার্য্য ইত্যাদি আনিয়া দেয়, কাহারও নিষেধ শুনে না, কাহারও কথা মানে না, তাহারা আপন কার্য্য আপন মনে করিয়া যায়, কিন্তু আজি সন্ধ্যা হইল, কই তাহারাও আসিল না ত? ক্রমে তাহাদের আসাও বন্ধ হইল। কমল মনে মনে জানিত

যে আহারীয় প্রেরণ কুমারের কার্য্য, সুতরাং তাহাদিগকে না আসিতে দেখিয়া তাহার মন আরও সন্দিগ্ধ হইল—চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, মনে হইল—"কুমার কেমন আছে, তাই বা কে জানে!"

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

———*———

নবপরিবর্ত্তন।

তাহার ভগিনী কমলের আবার পূর্ব্ব দশা উপস্থিত, আবার তাহার কমাস্তা হইল, কি করিয়া বৃদ্ধা মাতাকে ভরণ পোষণ করিবে ভাবিয়া অস্থির হইল। এখন আর কমল বালিকা নহে, যে যাহার তাহার কাছে যাইয়া ভিক্ষা করিবে, এখন তাহার অঙ্গে মদনের রাজ্যাধিকারের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছে, এখন যুবতী কমল কি করিয়া ভিক্ষায় বাহির হয়?—অথচ ভিক্ষা ভিন্ন উপায়ই বা কি আছে?

কমল মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিল, পরিশেষে ভিক্ষায় যাওয়াই স্থির হইল, পর দিবস অতি প্রত্যূষে অনন্যোপায় হইয়া ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইল।

আজি কমল সহরে, আর কখন সে সহরে আসে নাই, যদিও আসিয়া থাকে, সে অতি শৈশব অবস্থায়। কমল ভিক্ষা করিবে কি, দেখিয়া শুনিয়াই হতবুদ্ধি হইল। কেহ বিদ্রূপ করিতেছে, কেহ উপহাস করিতেছে, কেহ কত কথা কহিতেছে। কমলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, কমল অনেক কষ্টে সে ভাব দমন করিয়া অন্য দিকে চলিল।

কমল আপন মনে যাইতেছে এমন্ত সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "কমল।"

কমল ফিরিয়া দেখিল, যে বৃদ্ধ তাহাদের বাটীতে আহার্য্য লইয়া যাইবার সময় যাইতেন ইনি সেই পূর্ব্ব পরিচিত বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ বলিলেন " আমায় চিনিতে পার ! "

কমলের বক্ষ দুর দুর করিতেছিল, মনে হইতেছিল পাছে সে বলে যে কুমারের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। কম্পিত স্বরে কহিল "পারি।"

বৃদ্ধ। এ দিকে কোথায় যাইতেছ ?

কমল। ভিক্ষায়।

বৃদ্ধ। কেন তোমাদের কি বড় কষ্ট হইয়াছে ?

কমল সজল চক্ষে বলিল "বড় কষ্ট।"

বৃদ্ধ। সে যুবকটী আর আসেন না, বটে ?

কমল। না, আপনি তাঁহার কোন সংবাদ জানেন কি ?

বৃদ্ধ। কিছু না।

কমল বিমর্ষ হইল।

বৃদ্ধ। তুমি চাকরী করিবে ?

কমল। কোথায় ?

বৃদ্ধ। বাদসাহ বাটীতে, তোমার কোন আশঙ্কা নাই—জাতি যাইবার ভয় নাই—আমি তোমার পিতৃ সদৃশ, আমার কথায় বিশ্বাস কর।

কমল। করিব।

বৃদ্ধ। কিন্তু আগ্রায় যাইতে হইবে।

কমল। আগ্রায় !

বৃদ্ধ। ভয় কি ?

কমল। মা যে আছেন।

বৃদ্ধ। তাহা জানি, তিনিও যাইবেন, সেই খানে তাঁহাকে একটী বাসা ভাড়া করিয়া দিবে।

কমল। তবে যাইব।

বৃদ্ধ কমলের হস্তে গুটীকত টাকা দিয়া বলিলেন "যাও বাজার করিয়া লইয়া যাও, আহারাদি করগে, কাল ভোরে তোমাকে লইতে যাইব।"

কমল কুমারী নিতান্ত কুণ্ঠিত ভাবে বৃদ্ধের নিকট হইতে টাকাকটী লইয়া আপন আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাটী গেল। কমল

যথা সময়ে সমস্ত কথা মাতাকে বলিলেন। আকবর বাদসাহের রাজ্যে, হিন্দু মুসলমানে বিদ্বেষ ভাব ছিল না, ধর্ম্মগত কোন অনিষ্টাচরণ হইত না, তথাপি বৃদ্ধা তাহাতে সহসা স্বীকার করিলেন না, কিন্তু কমল অত্যন্ত জীদ করায় অগত্যা স্বীকৃতা হইলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে বৃদ্ধ আসিয়া কমল ও তাহার মাতাকে আগ্রায় লইয়া গেলেন। বাদসাহের প্রাসাদ সন্নিকটে একটী সামান্য বাসা বৃদ্ধার জন্য ভাড়া করিয়া দিলেন, এবং কমলকে বাদসাহ আকবর সাহেব তনয় সাহাজাদা সেলিমের পত্নীর দাসী ভাবে নিযুক্তা করিয়া দিলেন। কমল প্রত্যহ মাতার নিকট আসিয়া আহার করিবার অনুমতি পাইল, এবং বেগম তাহাকে আপন ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিলেন।

কমলের ন্যায় মনোহর স্বভাব সম্পন্না রমণীকে কে না ভালবাসে? কিন্তু কমল তোমারভাগ্য বড় মন্দ। যে রাজ মহিষী হইবার উপযুক্ত ভাগ্য দোষে আজি তিনি সামান্য পরিচারিকা মাত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

কুমার সিংহ।

কমলার দাসী বৃত্তি অবলম্বন করিবার প্রায় দুই মাস পরে একটী যুবক সন্ধ্যার প্রাক্কালে কমলার কুটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় কেহই নাই, চালে খড় নাই, ঘর ভগ্নপ্রায়। তন্নিকটে দুই এক ঘর ইতর লোকের আবাস ছিল, তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাদিগের দ্বারে দ্বারে যাইয়া কমল এবং তাহার বৃদ্ধা মাতা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সংবাদ দিতে পারিল না। তাহারা বলিল "কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না।"

যুবকের বদন মণ্ডল গম্ভীর হইল, শারদীয় চন্দ্র যেন রাহু গ্রস্ত হইল, যুবক বিমর্ষভাবে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই ভগ্ন কুটির মধ্যে

প্রবেশ করিলেন। নীরবে ক্ষণেক অশ্রু বরিষণ করিয়া তথা হইতে ধীর পাদ বিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার তৎকালিক মনভাব বর্ণন করা দুরূহ, সে যাতনা সহৃদয় বুঝিতে পারে, কিন্তু বুঝাইতে পারে না। "মন কেমন করা" যে কি তাহা লোকে বুঝে, কিন্তু বুঝাইতে জানে না।

যুবক ধীরে ধীরে মহানগরী দিল্লীতে বাদসাহ আকবর সাহের সুবিস্তৃত প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভূতলের একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, একটী সুন্দর শয্যায় শয়ন করিলেন, অনেকক্ষণ কি চিন্তার পর বলিলেন "কমল, প্রাণাধিক কমল, তুমি কোথায় গেলে, আমায় অকুল পাথারে ভাসাইয়া কোথায় গেলে।"

যুবকের দুই চক্ষু বাহিয়া তপ্ত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

ক্ষণেক প্রকৃতিস্থ হইয়া একটী হাত তালি দিবা মাত্র একটী সুন্দর বেশ ভূষা-বিভূষিত ভৃত্য আসিয়া তাঁহার পদ প্রান্ত চুম্বন করিয়া দাঁড়াইল।

যুবক বলিলেন "আমির খাঁ কোথায়?"

ভৃত্য। আগ্রায়।

যুবক বিরক্তি সহকারে কহিলেন "যাও।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল। আমির খাঁ একটী বৃদ্ধ মুসলমানের নাম। আমির খাঁ সাহাজাদা খসরুর বড় বিশ্বাসী ভৃত্য।

তখন যুবক বলিলেন "সকলি ফুরাইয়াছে, আমার ও সময় নিকট— কমল বিহনে এ প্রাণ কি ধরিতে পারিব? বিধাতঃ। যে ছবি স্বর্গে দুর্লভ, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন?"

যুবক গলদেশ হইতে মুক্তা-মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, বলিলেন "আর কেন, যখন কমল হারাইয়াছি তখন আর এ ছাই মালা কেন?" কোটিদেশ হইতে রত্ন খচিত সুবর্ণ কোষস্থিত করবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "তুমি নিপাত যাও, যুদ্ধ সাধ জন্মের মত হৃদয় হইতে দূরে যাও—এই নৃসংশ যুদ্ধ পিপাসায় অতুর হইয়া আজি এক বৎসর কমল ছাড়িয়া বিদেশে ছিলাম। সেই জন্যই কমল হারা হইলাম। কমল, প্রাণাধিক কমল, একবার দেখা দাও—"

যুবক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "কেন যুদ্ধ সাধ—কেন

কাশ্মীর গিয়াছিলাম, রণজয়ী হইয়া আমার কি সুখ হইল? এ জীবনে হৃদয় হারা হইলাম। না গেলে ইতিহাস লেখক না হয় আমাকে কাপুরুষ বলিত—বলুক ইতিহাস—আমি শত জন্ম কাপুরুষ হইব। বিধাতঃ! দয়াময়! আমার জীবন সর্ব্বস্ব কমলকে দাও—কমল—কমল—ক——"

যুবক সংজ্ঞা শূন্য হইয়া মূল্যবান কিংখাপ আসনে নিপতিত হইলেন। তৎক্ষণেই অগণিত দাস "কি হইল- কি হইল, সাহাজাদা খসরুর কি হইল" বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ হাকিম আসিয়া বহু যত্নে তাঁহার সংজ্ঞা সম্পাদন করিলেন।

সাহাজাদা চক্ষু উন্মীলন করিয়া মনে মনে বলিলেন "রণোমত্ত প্রাণ—কেন প্রেম-নীর পানাভিলাষ করে?—প্রেম ত সাহাজাদার দাস নয়—এ বিশ্ব ভুবনে পথের ভিখারী হইতে বাদসাহ পর্য্যন্ত প্রেমের দাস।"

পাঠক! বোধ হয় এখন বুঝিয়াছেন যে কুমার সিংহ কৃত্রিম নাম মাত্র, তিনি বাদসাহ আকবর সাহেব তনয়, মহারাজ মানসিংহের ভাগিনেয়, সাহাজাদা খসরু ব্যতীত অপর কেহই নহেন।

ইনি ইতিপূর্ব্বে আর একবার যুদ্ধে গিয়াছিলেন বলিয়া এক মাস কমল কুমারীর নিকট অনুপস্থিত ছিলেন। আজি বৎসরাতীত হইল কাশ্মীরে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। অদ্য মাত্র আসিয়াছেন, আসিয়াই প্রাণের প্রাণ কমলের কুটীরে কমলমুখী কমলকুমারীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় কমল—আর কোথায় কমলবল্লভ সাহাজাদা খসরু!

নবম পরিচ্ছেদ।

কমল ও বেগম।

দিবা দ্বিপ্রহর অতীত—আগ্রার মতি মহলের একটী সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে একটী ষোড়ষ বর্ষিয়া যুবতী একটী সুচারু কারুকার্য্য সম্বলিত মর্ম্মর-প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে গোলাপের ফোয়ারা শত মুখে সুশীতল সুবাসিত

গোলাপজল উদ্গীরণ করিয়া দেহের শান্তি ও গৃহের সৌগন্ধ সম্পাদন করিতেছে। যুবতী তাহার সেই সুন্দর মনোহর পদযুগল ফোয়ারার নিম্নস্থ গোলাপজলে স্থাপিত করিয়া বিমর্ষভাবে কি ভাবিতে ছিলেন, গোলাপজল যুবতীর সুন্দর মনোহর পদযুগল চুম্বন সুখাস্বাদনে বিভোর হইয়া, মৃদুমন্দ বাহিত হইয়া আপন জীবন যেন সার্থক করিতেছিল, কিন্তু এ সুখেও যেন যুবতীর নয়ন দ্বয় শোকোচ্ছ্বাসে বিভাসিত। হায় রে বিষাদ, তোমার রাজ্যাধিকারের বিজয় আধিপত্যের নিকট সকলি তুচ্ছ! সেলিম, যিনি বাদসাহ জাহাঙ্গির নামে আখ্যাত হইয়া দিল্লীর শাসন দণ্ডের স্বেচ্ছাচার ব্যবহারে সমগ্র ভারত ভূমি বিকম্পিত করিয়াছিলেন, তাঁহার মহিষী হৃদয়েও তুমি তোমার ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়াছ!

যুবতী এইরূপ বিষাদিত ভাবে উপবিষ্টা, এমত সময়ে তথায় কমল আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলের এখনও হিন্দু বেশ, কিন্তু অতি পরিপাটী। যুবতী তাঁহার সকল দাসীরই হিন্দুনামের পরিবর্ত্তে একটী করিয়া ম্লেচ্ছ নাম দিয়া ছিলেন, কিন্তু কমলের দেন নাই, তাহাকে কমল বলিয়াই ডাকিতেন।

কমলকে দেখিয়া যুবতী হর্ষোৎফুল্ল নয়নে বলিলেন "কমল, আমার কাছে এস।"

কমল যুবতীর নিকটে বসিয়া বলিল "আপনি এত বিষণ্ণ কেন?"

যুবতী। কমল, আমি কবে বিষণ্ণ নই, তুমি কবে আমায় হাসিতে দেখিয়াছ?

কমল। দেখি নাই বটে, কিন্তু দেখি না কেন? আপনার অভাব কিসের?

যুবতী গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আমার অভাব নয় কি?—আমার কি সুখ আছে ভাই, তবে অর্থ সুখ, কে কবে অর্থ সুখে প্রকৃত সুখী হইয়াছে?—যে রমণী পতি সুখে সুখী নয়, তাহার আবার সুখ কি?"

কমল। কেন, সাহাজাদা কি আপনাকে ভালবাসেন না?

যুবতী। তুমি পাগল, সাধের ভালবাসা কি পাঁচ জায়গায় হয়। তাই

আমি কে, আর তিনি কে, তিনি প্রভু আমি দাসী। এখানে কি প্রণয় সম্ভবে? প্রণয় শূন্য রমণী হৃদয় কি অসার নয়?

কমল। আমি বনের পাখি বনে থাকি, ও কথা কি করিয়া বুঝিব।

যুবতী। না কমল, তুমি সব বুঝ, তুমি যাহা বুঝ, আমি জানি, আর কেহ তত বুঝেনা।

কমল নিস্তব্ধা হইয়া রহিল।

যুবতী। আচ্ছা একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

কমল। করুন।

যুবতী। তুমি কেন সদাই বিষণ্ণ—বন-বিহঙ্গিনীর এভাব কেন?

কমল। কেন, আমি ত হাসি, কত হাসি।

যুবতী। সে যেন জোর করে।

কমল। না, স্ব-ইচ্ছায়।

যুবতী। আচ্ছা সেদিন রঙ্গমহলের সেই কোনের ঘরটীতে একলা বসে কাঁদ্‌ছিলে কেন?

কমল। আপনি কিরূপে জান্‌লেন।

যুবতী মৃদু হাসিয়া কহিলেন "আমি জ্যোতিষ জানি।"

কমল। মার অসুখ করেছে বলে।

যুবতী। তখন ত তোমার মার অসুখ করে নি।

কমল। তবে মন বোধ হয় আপনা আপনি কেঁদে ছিল।

যুবতী। সুধু কি প্রাণ কাঁদে।

কমল। আমরা অনাথা, আমাদের সকলি সম্ভবে।

যুবতী। না কমল তুমি আমার কাছে লুকুচ্চ।

কমল। আমি আপনার দাসী, আমাকে ও প্রশ্ন কেন?

যুবতী। আমি কি তোমায় কখন দাসী বলিয়া ভাবি?

কমল। না।

যুবতী। তবে কেন ও কথা?

কমল। আর বলিব না।

যুবতী। তবে বল, তুমি কি কাহাকেও ভালবাস?

কমল। বাসি।

যুবতী। কাহাকে?

কমল। কুমার সিংহকে।

যুবতী। তিনি কে?

কমল। তাহা জানি না।

যুবতী। জান না!

কমল। না।

যুবতী। তিনি কোথায়?

কমলের চক্ষে জল আসিল, কোন উত্তর দিল না।

যুবতী। তবে কি তিনি নাই?

কমল বলিল—"বালাই।"

কিন্তু তাহার ইন্দিবর চক্ষু বহিয়া সবেগে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল।

যুবতী। তুমি কাঁদ্চ?

এমত সময়ে একজন দাসী আসিয়া কহিল "সাহাজাদা আসিতেছেন।"

কমল শশব্যস্তে উঠিয়া গেল, অন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া আবার নীরবে, আপন মনে, উদাস হৃদয়ে, কাঁদিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত রহস্য।

কমল কুমারীর মাতা সাংঘাতিক পীড়িতা, তাঁহার জীবনের আশা অতি অল্প। কমল বড়ই বিষাদান্বিতা। আজি চারি দিবস ধরিয়া কমল বাদসাহ ভবনে যায় নাই, কেবল মাত্র বৃদ্ধা মাতার শুশ্রূষায় নিরতা আছে।

বেলা প্রায় অবসান, এমত সময়ে কমল একবার বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার ইচ্ছা করিল। একটী দাসীকে মাতার নিকট রাখিয়া আপনি প্রাসাদাভিমুখে চলিল।

বাদসাহ ভবন দেখা যাইতেছে, আর অল্প দূর মাত্র যাইলেই কমল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে এমত সময়ে দূরে একটী ভীষণ জনতা পরিলক্ষিত হইল। তাহা কি জানিবার জন্য কমল একটী বৃক্ষ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তথায় একটী তাহার সমবয়স্কা রমণী আসিয়া মেহদী রঞ্জিত হস্তদ্বারা কমলের চক্ষুদ্বয় আবরিল, কমল চমকিয়া উঠিল, যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিল "ভয় পেয়েছ?"

—কমল। তুমি! বেশ ভাই এস আমরা দুজন হলাম।

যুবতীটী কমলের পার্শ্বে দাঁড়াইল। এটীও রঙ্গমহলের একটী বাঁদী।

দেখিতে দেখিতে অসংখ্য অশ্বারোহী, পদাতিক সেনা জয়োল্লাসে রণবাদ্য বাজাইয়া তাহাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে দেখা গেল মহা সমারোহে অশ্ব পৃষ্ঠে একটী সুন্দর যুবক আসিতেছেন।

কমল তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই চিনিল কুমার সিংহ, হৃদয় চমকিয়া উঠিল, চক্ষে যেন পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল।

কমল বাঁদীকে বলিল "এ যুবকটী কে?"

বাঁদী সবিস্ময়ে কহিল "ও মা সে কি, তুমি কি আগ্রার কোন খপরই রাখ না! ইনি বাদসাহ আকবরের পুত্র সাহাজাদা খসরু, আজ্ এক বৎসরের উপর হ'ল কাশ্মীরে লড়াই করতে গেছলেন, লড়াই জিতে দিল্লীতে এসেছিলেন, সেখান থেকে এখানে আস্‌ছেন। ও মা—ও মা—এ কি।"

এই কথা বলিয়া কমলকে ধরিল, দেখিল কমল মূর্চ্ছিতা, বাঁদী নিকটে না থাকিলে কমল সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সেই খানেই পড়িয়া যাইত।

বাঁদী "কমল, কমল" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কমলের সংজ্ঞা হইল। কমল কুমারী সবিস্ময়ে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল। তখন জনতা অল্প দূরে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁদী কহিল "লোকের ভিড় দেখে ভয় হয়েছে?"

কমল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"হাঁ।"

বাঁদী। এখন কোথায় যাবে?

কমল। রঙ্গমহলে যাচ্ছিলাম, তা আর যাব না।

বাঁদী। তবে কোথায় যাবে?

কমল। মার কাছে।

বাঁদী। আমি সঙ্গে যাব কি?

কমল। না।

কমল এই কথা বলিয়া তথা হইতে ধীর পাদবিক্ষেপে হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ সুখ দুঃখকে বহন করিয়া আপন বাসার দিকে গমন করিল।

—:—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

——০:*:০——

মৃত্যুশয্যা।

দিবা অবসান প্রায়,—জগৎ-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। অনন্ত গগনপ্রদেশ স্তিমিতপ্রায় সূর্য্যের তরল কিরণে বিভাসিত, অদূরে তরল কিরণময়ী তরঙ্গিনী তর তর শব্দে প্রধাবিতা। যমুনে তুমি কোথায় ছুটিতেছ, আগ্রার এ বিশ্ববিমোহন শোভা কি তোমায় ভাল লাগিতেছে না?

এই সময়ে একটী সামান্য গৃহে একটী অশীতি বর্ষিয়া বৃদ্ধা রুগ্ন শয্যায় শায়িতা, তাঁহার মুখ ভাব দেখিলে প্রতীতি জন্মে, যে তাঁহার জীবন রবিও অস্তমিত প্রায—আর বিলম্ব নাই, বৃদ্ধার শিয়রদেশে একটী কুসুম-ময়ী বালিকা সজল নেত্রে বসিয়া আছে, তাহার সেই সজল নয়ন বৃদ্ধার বদন প্রতি ন্যস্ত।

বৃদ্ধা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "মা কমল একবার পাশের জানালাটী খুলিয়া দাওনা, আমি জন্মের মত সব দেখিয়া নি।"

কমল শশব্যস্তে গবাক্ষ-দ্বার উন্মোচন করিল। তখন বৃদ্ধার নয়নে সান্ধ্য-গগনের অতুল ছটা অতুল শোভায় পরিদৃশ্যমান হইল। বৃদ্ধা আকুল

নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন আকাশ কত উচ্চ, ঐ খানে—ঐ অনন্ত উচ্চে কি মনুষ্য মরিয়া যায়। তথায় একটী তারা দেখা দিল, বৃদ্ধা ভাবিলেন, ঐ তারা সন্নিধানে কি আমি যাইব? প্রাণ কেমন উদাস হইল, চক্ষু নামিয়া পড়িল। তখন বৃদ্ধা কমলের দিকে ফিরিলেন। কমল গবাক্ষ দ্বার নিঃশব্দে বন্ধ করিল।

বৃদ্ধা কহিলেন "কমল!"

কমল। কেন মা।

বৃদ্ধা। আমার আর বোধ হয় অধিকক্ষণ সময় নাই—আমার দেহ যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, মন বিকৃতি বা উদাস ভাব প্রাপ্ত হইতেছে।"

কমল কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধা। কমল কাঁদিও না, এ পৃথিবীতে কেহ চির দিনের জন্য আসে না। কত মহারথী নিপাত হইতেছে, আমি ত কোন্ ছার—তৃণাদপি তৃণ!—তবে তোমার সুখ দেখিয়া মরিতে পারিলে মরণে সুখ পাইতাম, কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি বড় বাম।

বৃদ্ধার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। সেই কোটরাশ্রয়ী চক্ষের জল চক্ষেই রহিল। কমল আপন বসনাঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল।

তখন বৃদ্ধা আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন "কমল সংসারে সুখ কাহারও নাই,—কেবল তোমার আমার যে দুঃখ তাহা নয়, সকলেরই দুঃখ—দুঃখ বই কথা নাই—কিন্তু——"

বৃদ্ধা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, বোধ হইল যেন কথা কহিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "মনে করিয়াছিলাম কুমার—"

পাঠক! কমল কিরূপ প্রকৃতি সম্পন্না তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং কমল যে কুমারের কথা বৃদ্ধা মাতাকে বলেন নাই, তাহা অসম্ভব। কমল একবার মনে করিয়াছিল যে, এই মরণ সময়ে এ কথা আর মাতাকে বলিয়া কাজ নাই, আবার ভাবিল, আর ত মার দেখা পাইব না, আর ত তাঁহার মধুর উপদেশ শুনিব না, তবে না বলি কেন?

তাঁহার স্বর্গীয় উপদেশ লইনা কেন? তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করি না কেন? এই ভাবিয়াই—সে সকল মর্ম্ম-বিদারী কথা মাতার নিকট বিবৃত করিয়াছিল।

বৃদ্ধা দেখিলেন যে কমল কাঁদিতেছে, সুতরাং সে কথা চাপা দিয়া বলিলেন "আমি মরি, কিন্তু একটী কথা বলি শুন।"

কমল আগ্রহ সহকারে কহিল "বল মা বল।"

বৃদ্ধা। আমার কথাটী রাখিও।

কমল। যত দিন প্রাণ থাকিবে তত দিন রাখিব।

বৃদ্ধা। আমি জানি যে তুমি আমায় ভালবাস, অনেক পুণ্য ব্যতীত তোমার মত কন্যা হয় না। আমার জন্য তুমি কত ক্লেশ না সহ্য করিয়াছ। কেবল আমার পেটের দায় তুমি হিন্দু হইয়া যবন গৃহে দাসী বৃত্তি করিতেছ।

কমল আগ্রহ সহকারে কহিল "মা ও কথা রাখ, কি বলিবে বল?"

বৃদ্ধা। আপন ধর্ম্মচ্যুত হইও না, প্রাণ থাকিতে নয়। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্ম নাই। আমি ত এখনি মরিব, মনে করিও না যে আর আমি তোমায় দেখিতে পাইব না, আমি যেখানেই থাকি তোমার কার্য্য কলাপ দেখিব। দেখিও মা, অভাগিনীর শেষ অনুরোধ রাখিও। এক গণ্ডুস জল যাহাতে পাই তাহা করিও। যে মায়ের অন্ন যোগাইতে তাহার জীবিতাবস্থায় এত করিয়াছ, মরিলে যেন তাহা একেবারে ভুলিওনা—দেখিও মা এ মায়ের অন্ন মারিও না। মুসলমান বিবাহ করিয়া যেন আমার জল গণ্ডুসটী পর্য্যন্ত বন্ধ করিও না।

বৃদ্ধা যেন আরও কত কি বলিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে কমলের সংসারের একমাত্র সহায় সম্বল বৃদ্ধ মাতা অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিতা হইলেন। কমলের আর দুঃখের সীমা রহিল না। এরূপ দারুণশোক, বালিকা এ জীবনে আর কখন পায় নাই, সম্ভবতঃ পাইবেও না। এ শোক, এ যাতনা কমল ইহ জীবনে কখন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

ধর্ম্ম ও উপাসনা।

" Vile intercourse where virtue has no place."

Somerville.

ধর্ম্মই জীবনের একমাত্র আশ্রয়। ধর্ম্ম বিহীন জীবন উপলময় মরুস্থল। স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব ব্যতিরেকে মনের জড়তা যায় না, চরিত্র প্রস্ফুটিত হয় না, জীবনের গতি পরিবর্দ্ধিত হয় না,—অধিক কি, মানুষকে পশু করিয়া তুলে। জগতের যাবতীয় পদার্থেরই ধর্ম্ম পালনের দিকে লক্ষ্য,—জড় অজড় প্রত্যেকেই ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তবে [illegible]বিক, [illegible] পরম্পরা ক্রমে সকলের ধর্ম্ম সমান নহে, খনিজ পদার্থ হইতে মা[illegible]াই ইঁহা—সকলেই ন্যূনাধিক্য ক্রমে ধর্ম্ম-পালনের জন্য কাতর, কিন্তু প্রকৃ[illegible]ংসারে [illegible]তম্য ভেদে প্রত্যেকের ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ উপাদানে সংগঠিত। বালকের মনে যতদিন না ইতর-বিশেষ জ্ঞান জন্মে, সুখ দুঃখের অনুভূতি হয়, কাণ্ডাকাণ্ড বোধ না থাকে, ততদিন সে যেরূপ পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের দ্বারা প্রত্যেক কার্য্যে চালিত ও অনুশাসিত হয়, জড় ও ইতর প্রাণীর সেইরূপ বিবেক ও ইচ্ছা-শক্তি না থাকাতে পরম করুণাময় পূর্ণব্রহ্ম তাহাদিগকে স্বতঃই ধর্ম্মপথে লইয়া চলেন এবং তাহাদের আত্মোন্নতির ক্রমবিকাশ (progression of soul) সংসাধিত করেন। সূর্য্যের প্রচণ্ডতা, চান্দ্রের মধুরিমা, জলের শৈত্য, বায়ুর স্নিগ্ধতা, তরুলতার আতপ-তাপ-নিবারিণী ক্ষমতা, প্রভৃতি জড়ের ধর্ম্ম তাহাদিগের আনুষঙ্গিক কার্য্যের সঙ্গ পর্য্যস্ত রহিয়াছে; সেইরূপ ইতর পশুরা যথাকালে আহারান্বেষণ, শিশু শাবকের লালন-পালন, প্রপীড়ক প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সাধ্যমত আত্মসংরক্ষণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহাদিগের পশু ধর্ম্মের (instinct) পরিচয় দিতেছে। কিন্তু আত্মার ক্রমোন্নতি গুণে মনুষ্যের জ্ঞানোন্মেষ অধিকতর কার্য্যকর; সে স্থলে বিবেক (conscience) তাহার পরিচালক,—ঈশ্বর কেবল তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পুণ্যের গতিতে প্রবণতা বৃদ্ধি করিতেছেন

মাত্র, পাপের গতিতে একেবারে নিশ্চেষ্ট (passive)। অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন, জড ও ইতর প্রাণীর ধর্ম্মের সহিত মনুষ্য সমাজের ধর্ম্ম পালনের তুলনা হইতে পারে না। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতিভেদে প্রত্যেকের ধর্ম্ম-পালন বিভিন্ন উপাদানে সংগঠিত,—একের ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ, অন্যের বহুআয়াসলভ্য, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ * —এই দশবিধ অনুষ্ঠান ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয় না। কিন্তু এই উভয়বিধ ধর্ম্মই যে এক মৌলিক কারণ সম্ভূত, তৎপক্ষে অনুমাত্র সন্দেহের কারণ দেখা যায় না; কেন না, তদ্বিপরীতে জড়জগতের উন্নতির আশা থাকে না, আত্মার ক্রমোন্নতির পথে ব্যাঘাত জন্মে, ঈশ্বরের মহান্ কার্য্যে পক্ষপাতিত্বের আবিলতা সংমিলিত হয়। যাহা [illegible], এ প্রশ্নের মীমাংসা আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের সমালোচ্য নহে।

দেশভেদে, আচারভেদে, [illegible] সমাজভেদে পৃথিবীর নানা স্থানে ধর্ম্ম বিষয়েও নানাবিধ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সকলকে যবন বলিয়া ঘৃণা করে, মুসলমান বিধর্ম্মীকে 'কাফের' জ্ঞানে অভক্তি প্রকাশ করে, খৃষ্টীয়ান নিজ ধর্ম্মকে বিশ্বব্যাপী ভাবিয়া অপরের প্রতি সমূহ তাচ্ছিল্য দেখায়। আবার এই তিন প্রধান ধর্ম্ম বিভাগেও পরস্পরের মধ্যে বিস্তর সম্প্রদায় ভেদ। ধর্ম্ম কি এরূপ মতপার্থক্যের সামগ্রী? ধর্ম্মের বিশ্বজননী ভাবে কি এরূপ সন্দেহের আবিলতা শোভা পায়?—কখনই না। প্রত্যুত, তমোগুণান্বিত মোহাভিভূত ব্যক্তিগণই ধর্ম্মের এইরূপ বাহ্যিক পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া আমার মতভেদে প্রশ্রয় দেয়, তর্কে অবিশ্রান্ত সংগ্রামে উন্মত্ত হইয়া অবশেষে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় বৎ অজ্ঞানতা স্রোতে 'হাবুডুবু' খায়। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্মের মূলভিত্তি একই, যেমন হিন্দুর মধ্যে বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম—অধিক কি, শাক্ত, বৈষ্ণবের মধ্যে মতদ্বৈধ, খৃষ্টীয়ান মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়

---

* "ধৃতি-ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা-সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

——মনু।

তেন, সেইরূপ আদি ও অকৃত্রিম ধর্ম্মালোচনায় হিন্দু—মুসলমান—খৃষ্টান জনিত বাহ্যিক আচার ও মতভেদ; ফলতঃ, প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল সত্য ও চরম উদ্দেশ্য একই—বেদ, কোরাণ, বাইবেল একই কার্য্যে নিযুক্ত, একই বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিপোষিত। সনাতন আর্য্যধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা পুরা কালিক; আর্য্য ঋষিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় ও গবেষণা দ্বারা যে অমূল্য সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, নানারূপ বিঘ্নবিপত্তি, আলোড়ন-বিলোড়ন স্বত্বেও * কালের অসীম আবর্ত্তনে তাহা কিছুমাত্র প্রতিহত বা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অন্যান্য ধর্ম্মও সেই মহান্ আর্য্যধর্ম্মের ভিত্তিগত, কেবল আচারভেদে বাহ্যিক কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত মাত্র। অনেকে এক ধর্ম্ম হইতে অনুরক্ত হইয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় লন, ধর্ম্মের মূলতত্ত্বে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহ্যিক আড়ম্বরেমুগ্ধ হন, বাস্তবিক, ইঁহাদিগের ধর্ম্মানুভূতি নিতান্ত অল্প, অসার 'হুজুগে' উন্মত্ত হওয়াই ইঁহাদিগের কার্য্যের ফল। সৃষ্টির অপূর্ব্ব কৌশলে যিনি যে ধর্ম্মাশ্রিতসংসারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ধর্ম্মেই অনুশাসিত হইয়া স্রষ্টার অদ্ভুত কার্য্যনিপুণতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তন্ময় হইবার চেষ্টা করাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ভারতবাসীমাত্রেই, বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতি, বড় অনুকরণ প্রিয়, পরিণাম চিন্তা না করিয়া, ফলাফলের গতি লক্ষ্য না করিয়া, কোন অভিনব ব্যাপারে উন্মত্ত হওয়া বাঙ্গালির একরূপ স্বভাবসিদ্ধ রোগ, তাই বাঙ্গালির মধ্যে নিজ-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী ও পরধর্ম্মানুপ্রেক্ষীর সংখ্যা এত অধিক। পক্ষান্তরে ভারত বহুদিন হইতে পর-পদ-বিদলিত; বিজাতি-শাসনে বিজাতীয় রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম—সকলই ক্রমশঃ অল্লাধিক পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, প্রকারভেদ সংমিশ্রণে সকল বিষয়েই ব্যভিচার-দোষ জন্মিয়াছে। আর্য্য-ধর্ম্মের গ্রন্থি নিতান্ত অটুট বন্ধনে বদ্ধ বলিয়াই এতাদৃশ ব্যভিচার স্বত্বেও

* আজি কালি, হিন্দুধর্ম্মোপাসকদিগের মধ্যে উন্নতি ও স্থিতিশীল মতের নানাবিধ আন্দোলন, অবস্থাক্রমে শ্লেষের ব্যঙ্গোক্তি পর্য্যন্ত, চলিতেছে। তৎসম্বন্ধে (ক্ষুদ্রপ্রাণী) আমাদিগের দুই এক কথা বক্তব্য ছিল। তবে 'আদরিণী'র কলেবর ক্ষুদ্রজ্ঞানে বাহুল্যভয়ে উপস্থিত বিরত থাকিলাম, বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

আজ পর্য্যন্ত নিরাবিল রহিয়াছে, তাই আজ আবার শিক্ষিত সম্প্রদায় জয়নাদে হিন্দুধর্ম্মের "নবজীবন" গান করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মের এই পুনরুত্থানের দিনে দুটা ধর্ম্ম কথা না বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা ভাল দেখায় না; 'আনন্দিনী' নিতান্ত কোমল প্রাণা বালিকা, তাহার সেই বাল-বুদ্ধিতে যতটুকু ধর্ম্মানুভূতি সম্ভব, আমরা তাহাই এই প্রবন্ধে দুই এক কথায় বলিব।

সকলেই 'ধর্ম্ম, ধর্ম্ম' করিয়া কাতর হন, ধর্ম্মের নাম শুনিলেই উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠেন, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস, যাহার কথা লইয়া আমরা এতক্ষণ বাগাড়ম্বর করিলাম, যাহার জন্য এত আন্দোলন, তাহাই কি প্রকৃত ধর্ম্ম? আমাদিগের পুরাণ শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়, শাস্ত্রবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা যে গুণ বা শক্তি বিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহারই অন্যতম নাম ধর্ম্ম। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে, কর্ম্মই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি;—রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ধ্যান, হর-গৌরীর অভিন্নতা জ্ঞান, বা যীশু-মহম্মদের পার্থক্য কল্পনা ধর্ম্ম নহে; অথবা, একাদশীব্রতপালন, রবিবারে সান্ধ্যালোকে স্তিমিত নেত্রে 'বাইবেল' বিলোড়ন বা পশ্চিমমুখী হইয়া অহোরাত্রে পঞ্চবার 'নেমাজ' করণ ধর্ম্মকার্য্য নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবেকই মনুষ্যের পরিচালক; বিবেকের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অশেষ গবেষণা দ্বারা সাধু পণ্ডিতগণের যাহা সৎজ্ঞান হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনুশাসিত হওয়ার বিধানের নামেই শাস্ত্র এবং সেই বিধানানুসারে কার্য্য করিয়া যে শক্তি সংবর্দ্ধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। আশক্তি শূন্য হইয়া এই কর্ম্ম করা চাই; এই কর্ম্মকাণ্ডের যথার্থ্য ও যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করাই সমস্ত 'গীতা'র দীক্ষামন্ত্র। সকলে এই কর্ম্ম অভ্যাস করুন, ধর্ম্ম অদৃষ্টভাবে স্বতঃই জন্মিবে,—এ ধর্ম্ম হিন্দু, খ্রীষ্টান, যবন, বৌদ্ধ—সকলের সমভাবে উপভোগ্য।

এখন দেখা যাউক, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর (ব্রহ্ম) জ্ঞানে পার্থক্য কি?—একটি কার্য্য, অপর তাহার ফল। জগতের প্রত্যেক কার্য্যই ফলপ্রসূ; এই শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত শক্তির চরম ফল ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্মায় বিলয়। শরীরী মাত্রেই ত্রিগুণান্বিতা প্রকৃতি (matter) ও পরমাত্মার দুর্ভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশরূপী পুরুষের (Spirit) একত্র সমাবেশ সংঘ-

চিত্ত। পূর্ব্বকথিত শাস্ত্রীয় দশবিধ উপায়ের দ্বারা সম্যক্‌রূপে আত্মসংযম পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করার নাম ধর্ম্মপালন; এতদ্দ্বারা যে শক্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহাই প্রকৃতি-বিনাশক, এবং সেই প্রকৃতি বিনাশেই পুরুষের একেশ্বরত্ব। ইহারই অন্য নাম ব্রহ্মলাভ বা মোক্ষ। সত্ত্ব-রজঃ-তম-গুণে জড়িত প্রত্যেক মনুষ্যেরই মোক্ষের হেতুভূত প্রকৃতি-বিনাশের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। একদিনে এ কার্য্য সংসাধিত হয় না; দুর্দম্য স্ব-শক্তির (free-will) উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা ও আত্ম-সংযমের ক্রমিক চেষ্টাই ইহার প্রথম সোপান, এবং সংসারে থাকিয়া সাংসারিক অনিত্যতায় বীতস্পৃহ হইয়া কর্ম্ম করাই ইহার প্রধান উপায়। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন———

"* * * * * * নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বোনিত্য সত্ত্বস্থোনির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥" *

হে অর্জ্জুন! তুমি ত্রিগুণহীন (নিষ্কাম) হও নিষ্কাম হইতে গেলেই 'নির্দ্বন্দ্ব' হওয়া চাই, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব একেবারে কল্পনার দূরে রাখা চাই। সুখে দুঃখে, শীতে, গ্রীষ্মে, আরাম, ব্যারামে সমভাবে থাকিয়া কর্ম্ম কর। একদিনে কি এত শিখিতে পারি?—এত সহ্য হয়?—না, 'নিত্যসত্ত্বস্থ' হও, ধৈর্য্য ধর, ক্রমে সব অভ্যাস হইবে। আর সকল বিষয়েই 'নির্যোগ-ক্ষেম' হওয়া চাই; অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তীচ্ছারূপ যোগ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ করণ রূপ ক্ষেম পরিহার পূর্ব্বক অপ্রমত্ত ভাবে কর্ম্মাভ্যাস কর। যতদিন সুখ-দুঃখের পার্থক্য বোধ থাকিবে, প্রাপ্তি ও ভোগেচ্ছা প্রবলা থাকিবে, ততদিন নিষ্কাম হইতে পারিবে না; সে অবস্থায় সকল কর্ম্মই অপকর্ম্ম।

অনেকে উপাসনাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমাদিগের বিবেচনায় ইহা নিতান্ত অমূলক। সচরাচর যেরূপ উপাসনা পদ্ধতি দেখা যায়, তাহার অধিকাংশ অবস্থাই বাহ্যিক আড়ম্বরে জড়িত, প্রকৃত অন্তর-প্রসূত ধর্ম্মানুভূতির চিহ্ন তাহাতে অল্পই লক্ষিত হয়। এরূপ উপাসনায় ফল কি? দেখা যায়, উপাসনার লক্ষ্য কেবল স্বকৃত দুষ্কৃতের জন্য পরমে-

* গীতা। ২। ৪৫।

শ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও ঐহিক দুঃখ-কষ্ট নিরাকরণ পূর্ব্বক চরম সুখের জন্য ঐকান্তিকী কামনা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এরূপ উপাসনা স্বার্থপরতার অবান্তর অনুষ্ঠান মাত্র। অনন্ত ও অব্যক্ত ক্ষমতাময় নির্ব্বিকার পরম পুরুষ এরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধিতে কখনই প্রশ্রয় দেন না। সহস্র-বিধ অসদনুষ্ঠানের পর একবার ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করিলেই যদি সকল পাপ ক্ষালিত হইয়া পারলৌকিক মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইত, তাহা হইলে জগতে পাপ-পুণ্যের তারতম্য থাকিত না, পুণ্যের পবিত্র স্রোত প্রবাহিত হইতে পারিত না, ভগবানের কার্য্যে পক্ষপাতিতা দোষ মিলিত হইত,—অধিক কি, তিনি চাটু-কারের দাস বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। সুতরাং উপাসনা যে ধর্ম্মানুভূতি-পরিচায়ক নহে, ইহা একরূপ সহজেই বুঝা যায়। তবে বিবেক-সম্মত সমস্ত সদনুষ্ঠান করিয়া নিষ্কাম থাকা ও আত্মমনঃপ্রাণ ভগ-বানে সমর্পণ করিয়া তাঁহার অনন্ত কার্য্যের উদার ভাব ও অপার মহিমা হৃদগত করা পুরুষার্থ; ইহাই মোক্ষলাভের মহৎ উপকরণ। ধর্ম্মের এই সূক্ষ্মতত্ত্ব বিঘোষিত করাই প্রত্যেক সাধু-জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাবে নিবদ্ধ থাকাই শরীরী মাত্রের একমাত্র লক্ষ্য রাখা উচিত। যতদিন না ধর্ম্মের এই পবিত্র সত্য প্রচারিত হয়, ততদিন দেশের উন্নতির আশা অল্প, মনুষ্যের মুক্তির উপায় সুদূর পরাহত।

শ্রীপাঃ———ঘোষ।

নারীমাহাত্ম্য।

—০ঃ০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই কথা বলিয়া নারায়ণ পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে কমলে! নারীগণ অতঃপর যে ভাবে কাল যাপন করিবেন, তাহা শুন। রমণীরা আর পক্ষিণীর ন্যায় গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধা হইবেন না, তাঁহারা এখন হইতে শিকল কাটিতে শিখিবেন। তাঁহারা স্বেচ্ছা বিহারিণী হইয়া দিব্য যানা-

রোহণ পূর্ব্বক যথেচ্ছ বিচরণে সমর্থা হইবেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছামত ভ্রমণ সময়ে আরি পরবাচ্য ভৃত্যটী আবশ্যকমত সঙ্গে স্থান পাইবেন, কদাচিৎ পাইবেনও না। তাঁহারা ধর্ম্মমন্দিরে গমন ব্যপদেশে তত্তৎ স্থলে সঙ্গী-আদি করণেও নিষিদ্ধা হইবেন না। এতদিন বার বিলাসিনী নাম্নী সপত্নী দিগের নিকট তাঁহারা যে যে বিষয়ে পরাস্তা ছিলেন, এক্ষণ হইতে তাঁহারা সে অপমান হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহারা স্বেচ্ছাবিহার, বেশ বিন্যাসাদি যে কোন বিষয়ে বারবিলাসিনী দিগের অসমকক্ষা ছিলেন, এক্ষণে আর তাহা থাকিবেন না। অতঃপর তাঁহাদিগের বেশ ভূষা দেখিয়া বারবিলাসিনীরাও লজ্জাপ্রাপ্ত হইবে। আহার পানাদিতেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উহাদিগকে পরাভূত করিবেন। আমি আর অধিক কি বলিব অতঃপর রমণীগণ যে প্রভাবশালিণী ও সুখিণী হইবেন তাহা দেখিয়া তুমি অথবা ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী ও নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যভূমে গমন করিতে উৎসুকা হইবে।

লক্ষ্মী বলিলেন "নাথ! তোমার নিকট মর্ম্মপীড়ানাশক এইবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলাম। কিন্তু আর একটী কথা শুনিতে নিতান্ত অভিলাষিণী হইয়াছি। যে পুরুষ পত্নী দাসত্বে অবহেলা প্রদর্শন করিবেন, তাহার কি দণ্ড বিহিত হইবে তাহা আমাকে বিস্তারিত করুন।" নারায়ণ কহিলেন "তাহা অবশ্যই বক্তব্য। যে নর এইকর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্র তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন সে তৎক্ষণাৎ মৎস্য জন্ম গ্রহণ করিয়া নারীগণের ভক্ষ্য হইবে। রমণীরা তাহাকে ছাই মাখাইয়া, বঁটী নামক মহাস্ত্রে ছেদন করিয়া, ঝোল রাধিয়া তাহার মস্তক চর্ব্বণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিবেন। অধিক তাচ্ছিল্য করিলে সে পুরুষ পদ্মানদীতে ইলিষ নামক মৎস্য জন্ম পরিগ্রহ করিবে ও কিছুকাল ক্ষত বিক্ষত দেহে লবণাক্ত হইয়া দক্ষিণ বঙ্গে আগমন পূর্ব্বক নারীগণের উপাদেয় খাদ্য হইবে। আর ঐ সকল পুরুষ কদাচিৎ তোমার অনুগ্রহ ভাজন হইবে না। কিন্তু ইহাও স্থিরীকৃত হইতেছে যে পুরুষ এ নিয়ম পালনে দৃঢ়ব্রত হইবে, তোমাকে তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়া নিরন্তর তাহার গৃহে বাস করিতে হইবে।"

দেবী কহিলেন, "দেব। এইবার কিছু কঠিন কথা হইল। আমি আর

মর্ত্ত্যভূমে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বাস কি গমন করিতে ইচ্ছা করিনা। তবে আপনার অজ্ঞায় শ্বেতদ্বীপে নারিভক্ত দিগের গৃহে দৃষ্টি রাখিব, আর ভারতের বঙ্গভূমে আমার প্রিয়সখী বারুণীদেবীকে প্রেরণ করিব। তিনি নারী পূজক দিগের প্রতি সদয়া হইবেন ও সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগের গৃহে বিরাজ করিবেন।”

নারায়ণ বলিলেন“তোমার যেমন অভিরুচি; ফলতঃ সেবকেরা ক্লেশ না পাইলেই হইল।” দেবী কহিলেন, তাহার কোন চিন্তা নাই, বারুণী প্রসাদে ভক্তেরা সততই নিশ্চিন্ত হইবে। কিন্তু আমার আর একটী বড় সন্দেহ যে আপনার এই নিয়ম সকল পালনে সক্ষম পুরুষ ত আমি মনুষ্যলোকে দেখিতে পাইতেছিনা, তবে কিরূপে ও কোন ব্যক্তিদ্বারা একার্য্য প্রতি পালিত হইবে? নারায়ণ কহিলেন, “দেবী তজ্জন্য তোমার চিন্তার আবশ্য-কতা নাই। আমি পূর্ব্বেই তাহার একরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি। রামাব-তারে লঙ্কাসমর সহায় যে সকল মহাপ্রভাব অসীম ক্ষমতাশালী মহাপুরুষগণ আমার সহিত বৈকুণ্ঠে আগমন করিয়াছেন্ তাঁহাদিগকে ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করিয়াছি; তাঁহারা নরদেহ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক বাবু * নামে আখ্যাত হইয়া আমাদিগের এই নিয়ম প্রতি পালন করিবেন। এতদ্ভিন্ন আমি মহাদেবকেও সংবাদ দিব যে, তিনি যেন তাঁহার দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ সহায় পুরুষ গণকেও এই কার্য্য সাধনার্থ অবনীতে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত আদেশ করেন, আর যাহারা এ নিয়ম প্রতিপালনে অনুপযুক্ত, সংহার মূর্ত্তিতে তাহাদিগকে সদ্যই নরক কুণ্ডে প্রেরণ করেন। অতঃপর দেবী সন্তুষ্টা হইয়া দেবসহ পুনর্ব্বার দুই এক বার ক্রীড়া করিলেন। †

---

* এস্থলে বাবু শব্দে বঙ্গদর্শনোক্ত, বৈসম্পায়ন কথিত বাবু গণকে বুঝিতে হইবে।

† সৌতি কহিলেন, “মহাভাগ সকল, আমি ঊনবিংশ পুরাণান্তর্গত-নারীমাহা আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তিত করিলাম। ইহা পাঠ কি শ্রবণে পরম পদ লাভ হইয়া থা আর ভবিষ্যতে যে ব্যক্তি ইহা প্রচারিত করিবেন, তাঁহার প্রতি সতীর আদেশমত বা

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

The Indian Agricultural Gazette এবং কৃষি গেজেট।— কলিকাতা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাঙ্গালা কৃষি প্রধান দেশ, কৃষির উন্নতি ব্যতিরেকে ইহার আভ্যন্তরিক উন্নতি হইবার আশা কম। এতাবৎকাল বাঙ্গালার কৃষকেরা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের চিরায়ত্ত প্রথানুবর্ত্তী হইয়া কৃষিকার্য্য চালাইয়া আসিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর সে কাল নাই, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেশকে থাঁক করিয়া ফেলিতেছে। এ সময় কৃষির উন্নতিপক্ষে সাধারণের দৃষ্টি আবর্ত্তিত হইলে দেশের উন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকের কৃষি বিষয়ে চক্ষু না পড়িলে আর চলে না। অজ্ঞ কৃষকের হস্তে ইহার সমস্ত গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আর থাকা যায় না। সুখের বিষয় যে ক্রমশঃ অনেক ভদ্রলোক আবার নূতন করিয়া কৃষির উন্নতিকল্পে যত্নবান হইয়াছেন, এ সময় এরূপ দেশে-হিতকরী কৃষি বিষয়ক উপদেশ পূর্ণ সাময়িক পত্রিকা যে আগ্রহের সহিত গৃহীত ও পঠিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শুধু বাঙ্গালী নয়, যাহাতে সমগ্র ভারতবাসী কৃষিগেজেট পাঠে উপকৃত হন, এই আশায় ইহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংস্করণ বাহির হইয়াছে। দুইখানিই অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। আজ কাল যাঁহারা

দেবীর কৃপাদৃষ্টি অনবরত অবিচলিত ভাবে থাকিবে। এই কথা বলিয়া সৌতি কথাসমাপন করিলে, ঋষিগণ পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম। এক্ষণে তুমি তোমার গুরুর নিকট গমন কর ও পুনর্ব্বার উনবিংশপুরাণে উপদিষ্ট হইয়া সাবকাশ মত আমাদিগকে শ্রবণ করাইও। সৌতি—"আমি সত্বর আবার আসিব" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মুনি সভা ভঙ্গ হইল।

কৃষি সম্বন্ধে ভারতের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারাই ইহার নিয়মিত লেখক, সম্পাদকীয় গুরুভার কৃষি কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এফ সি এস, এম আর এ সি, র হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং আমরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আশা করিতে পারি—কৃষিগেজেটের গৌরব দিন দিন সমগ্র ভারত ব্যাপ্ত করিবে, এবং বঙ্গবাসী—ভারতবাসী ইহার গম্ভীর গবেষণা পূর্ণ উপদেশে উপকৃত হইয়া স্বদেশের অশেষবিধ উপকার ও উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন। এ দুইখানি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা; আমাদের দেশে যাহার অভাব, বস্তুতঃ তাহারই অপনোদনে ইহার জন্ম—আশা করি, ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট হইতে জমিদার পত্তনীদার পর্য্যন্ত ইহার উৎসাহ দানে যত্নবান হইবেন। প্রত্যেক শিক্ষিত কৃষিজীবী ইহার গ্রাহক হইয়া এই স্বদেশ হিতসাধক উদ্যমশীল সম্প্রদায়কে সমধিক উৎসাহিত করিয়া স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিবেন।

"গরুর মড়ক" "ভারতীয় জমির অনুর্ব্বরতা" "মাছের চাষ" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি অতি পরিপাটি হইয়াছে, বস্তুতঃ যে শুভ উদ্দেশ্যে কৃষিগেজেটের জন্ম, এবং ইহার প্রাণদাতাগণের যেরূপ যত্ন, উদ্যম, ও সাধনা, তাহাতে সিদ্ধিপক্ষে কোন সন্দেহ দেখি না। যাহাতে সকল শ্রেণীর লোক ইহা পাঠে সক্ষম হন সেই জন্য গেজেট দুইখানির মূল্য যতদূর কম করা যাইতে পারে, করা হইয়াছে। বাঙ্গালা কৃষিগেজেটের বাৎসরিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ৩৲ টাকা, ইংরাজি খানির ৪৲ টাকা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এরূপ হিতকরী পত্রিকা সর্ব্বত্র আদরণীয় হইবে।

ভার্গব বিজয়-কাব্য।—শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। আলবার্ট প্রেস—কলিকাতা।

সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুযায়ী এখানিকে "মহাকাব্য" মধ্যে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হওয়া যায় না। গ্রন্থকারের কবিত্ব আছে, কিন্তু প্রভূত অনুপ্রাস ঘটিত শব্দ ব্যবহার ও ভয়ঙ্কর কঠিন শব্দ প্রয়োগে কাব্যের লালিত্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে। আমরা আশা করি গ্রন্থকার ভবিষ্যতে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

ভার্গব বিজয় প্রণেতা মাইকেলের শিষ্য, কিন্তু যে সকল পাঠক অনায়াসে "মেঘনাদ" বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে "ভার্গব বিজয়ে" দন্তস্ফূট করাও দুরূহ। বস্তুতঃ ইহা প্রশংসার কথা নহে। যাহাই হউক গ্রন্থকার যদ্যপি ভবিষ্যতে এই একমাত্র দোষ পরিহার করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে একজন প্রতিভা-সম্পন্ন সুকবি বলিয়া পরিগণিত ও পরিচিত হইবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার মহাত্মা মাইকেলের অকাল মৃত্যুতে দুঃখ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বস্তুতঃ গ্রন্থকারের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে।

"বাল্য হ'তে মনে মনে বহুদিন-পূর্ব্বে
এ' জন কবিত্ব-শিক্ষা-গুরু-পদে তোমা'
বরিয়াছে, মাইকেল! বরণীয় জানি,'
রাতনিক-বিনা রত্ন-মর্য্যাদা যে জানে?
কিন্তু, নিদারুণ কাল থাকিতে না দিল
তোমায় অধিক-দিন এ' ব্রহ্ম-মণ্ডলে,
(অকালে করাল-রাহু গ্রাসিল কি বিধু!)
রুচির-দর্শন তব নাহি বিলভিল
কেবল কুভাগ্য-ফলে; অপিচ, হে গুরো!
প্রিয় কি অপ্রিয় তব শিষ্যগণ-মাঝে
জানিতে পেলেনা কভু এ' জন কেমন!
তোমার উদ্যান-হ'তে সমবচয়িয়া
বিবিধ-প্রসূনরাজী, গুম্ফিয়া মালিকা,
সংগ্রহি' অমূল্য-মণি তব খনি-হ'তে,
গঠিয়া ভূষণ, সাজাইবে মাতৃ-ভাষা,
অভিনব-মূর্ত্তিমতী,—দেহ আজ্ঞা তবে,
বাণীর প্রসাদে যদি লভে, গো শকতি।

গ্রন্থকার বহির্জগৎ বর্ণনায় আপনার ক্ষমতার প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন, ইচ্ছা ছিল তাহার এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিব, কিন্তু

স্থানাভাব বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, আশা করি পাঠক ও গ্রন্থকার উভয়েই ক্ষমা করিবেন। উপসংহারে বক্তব্য, যে, গোপাল বাবুর প্রথম উদ্যমের "ভার্গব-বিজয়" সাহিত্য সংসারের আদরের বস্তু।

বাঙ্গালা সাহিত্য।—শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, কলিকাতা আর্য্যবন্ধু প্রেস। মূল্য ৺০ আনা মাত্র।

এখানিতে প্রণয়ের ছড়াছড়ি, প্রেমিকের হুড়াহুড়ি নাই—বিরহিনীর দীর্ঘ নিশ্বাস বা প্রণয়িনীর বেশ বিন্যাস নাই, তবে আছে কি?—আছে- বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব, আর আছে—গ্রন্থকারের অসীম যত্ন, অটুট অধ্যবসায়, শ্রমসহিষ্ণুতা, বহুদর্শিতা, চিন্তাশীলতা, ও লিপিকুশলতার পরিচয়। কিন্তু এরূপ পুস্তকের আদর হইবে কি? বাঙ্গালি প্রেমের কথা ভুলিয়া, এরূপ নিরস পদার্থের আদর করিতে শিখিবে কি?

আশা করি যাঁহারা অভাগিনী বঙ্গভাষার উন্নতি দর্শনে প্রীত হয়েন, যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল হইতে দেখিলে সুখানুভব করেন, তাঁহারা ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারকে ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশে উৎসাহিত করিতে ত্রুটী করিবেন না। এরূপ গ্রন্থকার প্রকৃতই উৎসাহের উপযুক্ত পাত্র।

প্রকৃতি স্তোত্রম্।—শ্রীগোবীনাথ সেন কবিরঞ্জনেন বিরচিতম্। ওরিএণ্টাল প্রেস, ভবানীপুর।

আমরা এ পুস্তিকা খানি পাঠে পরিতোষ লাভ করিয়াছি, ইহার কবিতাগুলি মধুর ও ভাবময়ী।

———

প্রাচীন-পারসীক।

অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তসময়ে নানাজাতি, নানা ধর্ম্মাবলম্বী, নানা ভাষাভাষী ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে কোন্ জাতি অভ্যন্তরীণ উন্নতি সংসাধনে সমধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিতে গেলে বোম্বাই প্রদেশস্থ সৌম্যাকৃতি পারসীক দিগের প্রতি অগ্রে লক্ষ্য ধাবিত হয়। কোন জাতি বিদ্যা গৌরবে সমধিক গৌরবান্বিত—কোনজাতি শৌর্য্যে অধিকতর গর্ব্বিত—কোন জাতি বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মোহিত—কোন জাতি কেবল আমোদ আহ্লাদেই বিলসিত; কিন্তু আভ্যন্তরীণ উন্নতি, যাহা সকলেরই হৃদয়ের রম্য অভিলাষ হওয়া কর্ত্তব্য, তৎপ্রতি কাহাকেও বিশেষ যত্নবান দেখা যায় না, ভারতে কেবলমাত্র পারসীক জাতিই সেইদিকে শনৈঃশনৈঃ অগ্রসর হইতেছে, দেখিতে পাওয়াযায়; পারসীকগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহে—তাহারা উপনিবেশিক মাত্র—পারস্যদেশ তাহাদের জন্মস্থান; কিন্তু আধুনিক পারস্যবাসীর সহিত ইহাদের ধর্ম্ম ইত্যাদি কোন সম্বন্ধই অনুমাত্র সাদৃশ্য নাই; ইহারা ভারতে বহুদিন বসবাস করিয়া—হিন্দুগণের সহিত মিশিয়া কিয়দংশে হিন্দুর মতনই হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তা বলিয়া হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ইহাদের ধর্ম্মের বিশেষ সামঞ্জস্য নাই। আমরা অদ্য এই শীর্ষোক্ত প্রস্তাবে প্রাচীন পারসীকগণের বৃত্তান্ত যত দূর জানিতে পারা যায় তাহাই দিবার চেষ্টা করিব।

প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, আধুনিক সুসভ্য জাতি সকল পুরাকালে কোন একস্থানে একত্রে বসবাস করিতেন; তখন রোমক-গ্রীক, জর্ম্মন-ইংরাজ, হিন্দু-পারসীক প্রভৃতি আধুনিক মাননীয় জাতিগণ এক কর্ত্তৃত্বাধীনে একস্থানে বাস করিতেন; তখন জাতিভেদ ছিল না। ক্রমে তাহাদের বাস যোগ্য স্থান ও আহারের সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি হইতে লাগিল, সুতরাং দলে দলে তাহারা যে স্থান পরিত্যাগ করিয়া নূতন বাস যোগ্য স্থান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং সকলেই পার্থক্য অবলম্বন করিয়া ভিন্ন

ভিন্ন দেশে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিল ক্রমে তাহারা অপরিচিতের মত হইতে লাগিল, শেষে এমন হইয়া দাড়াইল যে, আর তাহাদিগকে এক মূলীয় বলিয়া সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তত্রাপি পরস্পর ভাষাগত এ প্রকার সৌসাদৃশ্য আছে যে, সামান্য মাত্র অনুধাবনা করিলেই তাহাদের এক জাতীয়ত্ব স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায়। অনেকে বলিয়া থাকেন প্রাচীন পারস্যই আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান, তখন ইহার ইরাণ নাম ছিল; এবং এই ইরাণ শব্দ হইতেই "আর্য্য" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইরাণ আর্য্যগণের আদি বাসস্থান ছিল কিনা বলিতে পারিনা, কিন্তু ইহারই নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে যে ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই; আর্য্যশাস্ত্রে উত্তর কুরুবর্ষ এই আদি বাস স্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে; এই কুরুবর্ষ কোথা তাহা প্রমাণীকৃত হয় না; সংস্কৃত শাস্ত্র পারস্য দেশকে সময় সময়ে পহ্লব, আবার কখন বা পারসীক শব্দেই অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা অদ্য ইরাণ দেশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রাচীন পারস্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায় তাহাই অদ্য আমাদের আলোচনীয়।

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মোশান ফাণ বলেন যে, অতি পূর্ব্বকালে পারস্য দেশে মহাবাদী বংশ রাজত্ব করিতেন; রাজা মহাবাদ সেই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা; তিনি সমুদায় প্রজা চারিভাগে বিভক্ত করেন; এবং এক এক ভাগের উপর কেবল একএক কর্ম্মের ভারার্পণ করেন; কোন দলস্থ একজন অন্য তিন দলের কোন কার্য্যই করিতে পাইতনা; সকলকেই নিজ নিজ কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হইত; ইহা আমাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণাদির ন্যায় ঐ চারি জাতিও ঠিক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিত; রাজা মহাবাদ প্রজা শাসনের জন্য কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করেন; সুতরাং মহাবাদের বন্দোবস্ত ও নিয়ম বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচরুদ্রূপ ছিল। রাজা মহাবাদের কার্য্য প্রণালী আমাদের ভগবান মনুর সহিত কিয়দংশে সাদৃশ্য থাকা জন্য সর উইলিয়ম জোন্স হিন্দু ধর্ম্মকে মহাবাদী ধর্ম্মের রূপান্তর এই কথা এক স্থানে বলিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক একটু অনুধাবনা করিলেই তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করা যায়; তবে তাঁহার এই কথায় ইহাই প্রমাণীকৃত হয় যে, আর্য্যধর্ম্মে ও তদানীন্তন পারস্য

দেশের ধর্ম্মে বিশেষ পার্থক্য ছিলনা; মহাবাদের সময়ে পারস্য ও ভারত বর্ষের অবস্থা কিয়দংশে সমান ছিল।

মহাবাদ বংশের পর আসিরীয় দেশাধিপতি কয়ুমার ইরাণ দেশ জয় করেন; তাঁহার সময়ে রাজ্য মধ্যে এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়; জোন্স সাহেব বলেন এই বিপ্লবের সময়েই কতগুলি ইরাণ বাসী ভারতে প্রবেশ করিয়া তথায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, তাহারাই আর্য্যগণের পিতৃপুরুষ; কিন্তু একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। কেননা বেদ আর্য্যগণের ভারতে বদ্ধমূল হইবার পর রচিত; তিনি বলিয়াছেন মহাবাদ ও ভারতীয় মনুর মত একই, তাঁহার মতে মহাবাদের অনেক পরে মনুর জন্ম, অর্থাৎ কয়ুমারের রাজত্ব কালে মনু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বেদ মহর্ষি মনুর জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত। তাহা হইলেই বেদ সর্ব্ব প্রথমে পারস্যদেশেই স্ফুরিত হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বেদ ভারতীয় আর্য্য ভিন্ন অন্য কোন জাতীর ভাণ্ডারে পাওয়া যায় নাই কেন? পারস্য দেশে বেদ রচিত হইলে অন্ততঃ সে দেশে তাহার কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট চিহ্ন ও লক্ষিত হইত সন্দেহ নাই। জোন্স সাহেব কয়ুমারের রাজ্যারম্ভ খৃষ্টের ৮। ৯ শতাব্দী পূর্ব্বে সংঘটিত হয় বলিয়াছেন; তাঁহার মতে এই সময়ে মনুর জন্ম, বেদ ও মনুর ভাষায় বিস্তর প্রভেদ; তাহা যে উপর্য্যুপরি রচিত হয় নাই, তাহা ভাষার আকার দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার জন্ম গ্রহণের সহস্রবৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত হইয়াছে; এবং তাহা ভারতীয় আর্য্যগণেরই নিজের সম্পত্তি; সুতরাং কয়ুমারের সময়ে ভারতে সর্ব্ব প্রথম আর্য্য উপনিবেশ ইহা শ্রদ্ধেয় কথা নহে। তবে এই সময়ে ভারতীয় আর্য্যগণের সহিত, পারসীকগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি ছিল বলিয়া বোধহয এবং সেই জন্যই প্রাচীন আর্য্যগণের নিকট হইতে প্রাচীন পারসীকগণ অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। মহাবাদের সময়ে পারস্য দেশে নানা দেব দেবী উপসেবিত হইত; অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণ পূজিত হইত, কয়ুমার সিংহাসনারোহন করিয়া, এই ধর্ম্ম সমূলে বিনাশ করিতে কৃত সঙ্কল্প হন; কিন্তু ইহা লোকের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি নানাবিধ

চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, কয়ুমার এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন; তাঁহার মতে সমুদায় পৃথিবীর লোক ভ্রাতৃবৎ, এবং অহিংসা মুক্তি লাভের প্রকৃষ্ট উপায়; যাহাই হউক তাঁহার ধর্ম্মে লোকে বিশেষ আস্থা সম্পন্ন হন নাই; এমন কি তাঁহার পৌত্র হুসঙ্গের সময় মহাবাদী ধর্ম্ম উন্নতির উচ্চ তোরণে অবস্থাপিত হইয়াছিল, এই জন্য লোকে মহাবাদী ধর্ম্মকে হুসন্দী ধর্ম্ম বলিত; ইতি পূর্ব্বে কেহ কেহ বা তাহাকে সূর্য্য ধর্ম্মও বলিত। এখনও পারস্য দেশে এই ধর্ম্ম যাজকগণের গ্রহাদির মন্দির সকল স্থানে স্থানে ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক কয়ুমার যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন তাহার মর্ম্ম লোকে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল; এবং তজ্জন্য কেহ কেহ বা তাঁহার ধর্ম্মকেই প্রকৃতধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তাহারই অধীন হইয়া চলিতেছিল, এই দুই ধর্ম্মের সংঘর্ষণে প্রাচীন পারসীক সমাজে মহা আন্দোলন ঘটিয়া উঠিল; কেহ বা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, কেহ বা নানা দেব দেবীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরে উত্থিত হইল; সুতরাং সমাজের অবস্থা এ সময়ে বড়ই আবর্ত্তময়, তাই একজন সংস্কারকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল, সেই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই জোরাস্তারের জন্ম গ্রহণ; জোরাস্তার যথন জন্মগ্রহণ করেন তথন পারসীক সমাজের অবস্থা অতীব জঘন্য; বিদ্যা চর্চ্চা তথন দূরে প্রস্থান করিয়াছে লোকের চিত্ত পাপ কলুষিত; সুতরাং সেই উপযুক্ত সময়ে একজন সংস্কারক না জন্মিলে পারসীক সমাজ ক্রমে অধিকতর কলুষিত ও পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অধঃপাতের অধঃ প্রান্তে যাইয়া পতিত হইত, সেই পতন শীল সমাজকে উর্দ্ধে তুলিবার জন্যই জোরাস্তারের জন্ম; জোরাস্তারকে কেহ কেহ জরতুষ্ট নামে অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু জোরাস্তার ধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থ জেন্দাবস্তায় তাঁহার নাম জরথস্তর স্পিতম্ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জোরাস্তার পারস্যের রাই নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অধিক জানিবার কোন সদুপায় নাই; তিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার বিশেষ নিদর্শন কিছুই পাওয়া যায় না, এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি পারস্যের রাজা গুষ্টাস্পের রাজত্ব কালে বর্ত্তমান ছিলেন; এ কথা তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই গুষ্টাস্পের বিষয় ইতিহাস

কিছুই বলিতে পারেন না; তবে পারসীকগণ গুষ্টাস্পকে দারা হিষ্টাস্প বলিয়া অনুমান করেন. কিন্তু হিষ্টাস্প খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা হইলে জোরাস্তারের কাল ঐ সময় বলিয়াই জানা যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে জোরাস্তার তাহার অনেক পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যোশান ফানী বলেন গুষ্টাস্পের পুত্র পুষুতেন তাতার দেশে বাস করিয়া তথায় এক নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন; কিন্তু ইতিহাসে এই পুষুতনের বিষয়ও কিছু জানা যায় না। সুতরাং জোরাস্তারের সময় নিরূপণ করা এক প্রকার অসাধ্য তবে যে তিনি খৃষ্টের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তাঁহার ধর্ম্মমতের সহিত বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ পার্থক্য নাই বলিলেও চলে; এমন কি কোন কোন দেবতার নাম উভয় ধর্ম্মেই এক প্রকার। বেদে অসুরগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নানা দেবতার নিকট প্রার্থনা আছে, দেবাসুরে তখন নিয়ত সংগ্রাম চলিত; দিতি ও অদিতি সুতগণ সকলেই এক পিতার সন্তান; দিতি ও অদিতি স্বপত্নী; কশ্যপ উভয়ের স্বামী; তিনই দেব ও অসুরগণের পিতা; দেবগণ অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে কখন দেবতা জয়ী কখন বা অসুর জয়ী হইয়াছে; দেবগণ লোককে পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেন—যাহাতে পৃথিবী সুখ পরিপূর্ণ হয় তাহার চেষ্টা করিতেন—মানবগণ যাহাতে দেবোপম হইতে পাবেন তাহার বিধান করিতেন; কিন্তু অসুরগণ যজ্ঞে বিঘ্ন সম্পাদন করিতেন—লোকের মনকে পাপের দিকে লইয়া যাইতেন—যাহাতে মানব পিশাচেরও ঘৃণ্য হয় তাহারই চেষ্টা করিতেন বেদের এই মতের সহিত জোরাস্তারের মতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই; তিনি বলেন জগদীশ্বর আপন শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুইটি পুরুষ হইলেন—একটীর নাম অহুর মশজাদ ও অন্যটির নাম অহ্রিমন। অহুর মশজাদ সকলের রক্ষাকর্ত্তা তিনি লোককে পুণ্য কর্ম্মের দিকে লইয়া যান কিন্তু অহ্রিমন তাহাদিগকে কুকর্ম্মে রত করান; সুতরাং দুই পুরুষে স্বর্গে বিষম সংগ্রাম হয়; এই সংগ্রামে কখন অহুর মশজাদ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত করিয়া নরক কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন; এই অহুর মশজাদের উপাসনা করাই জোরাস্তারের মত। আধুনিক পারসীকগণ অহুর

মশজাদ ব্যতীত সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি অন্যান্য দেবতারও উপাসনা করিয়া থাকেন।

দেবাসুরের যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের সহিত জোরাস্তারের ঐক্য আছে; এক্ষণে পারসীকগণের অন্য কোন দেবতার সহিত হিন্দু দেবতার নাম সৌসাদৃশ্য আছে কিনা তাহাই দেখা যাইতেছে। দেবরাজ ইন্দ্রের একটি নাম বৃত্রঘ্ন; এইশব্দটী ঐ অর্থে আমরা জেন্দাবস্তায় পাই। জারা অস্ত্র, অহুর মহাজাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন স্বর্গের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান অস্ত্রধারী কে? তিনি উত্তর কবিলেন "বেরেথঘ্ন" (বৃত্রঘ্ন)। এই রূপ নাম সাদৃশ্য আরও বিস্তর আছে, কিন্তু তৎ সকল প্রদান করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জেন্দাবস্তার "ভিন্দিদাদ" সংস্কৃত "হি দেব দৈত্যম" বলিয়া অনেকে সপ্রমান করিয়াছেন; আবস্তাব আজি দহক সংস্কৃত অহি দহক সমান। এইরূপ আরও নানা শব্দ আছে। জোরাস্তার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম পুস্তকের নাম জেন্দাবস্তা, উহা জেন্দ ভাষায় লিখিত; উহার টীকা পহ্লবী ভাষায় বিরচিত; আমাদের শাস্ত্রে এই পহ্লবী ভাষাব বিশেষ উল্লেখ আছে; এবং সে দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ পহ্লবী ভাষা ব্যবহাব করিতেন, কিন্তু তদানীন্তন পারস্যের প্রচলিত ভাষা "দেরি" এই দেরি ভাষা হইতেই আধুনিক পাবসী ভাষার জন্মলাভ। কিন্তু যৎ-কালে পহ্লবী ভাষা পারস্যে প্রচলিত ছিল তখন ঐ দেশের নাম পারস্য ছিলনা।

কয়ুমারের বংশ উচ্ছেদ করিয়া অসভ্য তুরাণগণ ইরানের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন; কিন্তু তাহারই কিছুদিন পরে সাইবস তুরান দিগকে পরাস্ত করিয়া ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার বংশীয় নরপতিগণের অনেক দিন পর্য্যন্ত পারস্যে রাজত্ব কালে ইরাণের নাম পারস্য হয়। পারস্ত ইরানের একটী সামান্য প্রদেশের নাম ছিল; কিন্তু সাইরস বংশীয়গণ সেই প্রদেশটির অন্তর্গত সিরাজনগরে আপনার রাজধানী স্থাপন করায় সেই প্রদেশটির নামানুসারে সমগ্র দেশটির নাম পারস্ত হইয়া গেল।

সাইরস বংশের শেষ ভূপতি দারা বা ডেরায়স; তিনি আলেক জেণ্ডা-রের সময় বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহাব সহিত মহাবীব আলেক

জগ্তারের বিষম যুদ্ধ ইতিহাসে কথিত আছে। তাঁহার পর শশন বংশীয় নরপতিগণের রাজ্য সংস্থাপিত হইল। ঐ বংশের শেষ ভূপতি ইয়াজ-দিজারদ; তাঁহারই রাজত্ব কালে ধর্ম্ম ও শোণিত পিপাসু মুসলমানগণ দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে; তখন বোগ্দাদের অধীশ্বর খলিপ ওমার। মুসল-মানগণ এক হস্তে কোরাণ ও অন্য হস্তে কৃপাণ লইয়া পারস্তভূমে অবতীর্ণ হইল, ইয়াজদিজারদ তাহাদের নবোদ্যম ভঙ্গ করিতে পারিলেন না; সুতরাং মহবন্দ ক্ষেত্রে তাঁহার বংশের ও ইরানের প্রাচীন মান, সম্ভ্রম ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি মহম্মদ অনুচরগণের পদ দেশে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু জনৈক বিশ্বাস ঘাতক অনুচর সেই পলায়নমান রাজার প্রাণ বধ করিয়া পারস্যের আশা একবারে সমূলে বিনষ্ট করিল। এই ঘটনা ৬৫১ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়; তদবধি পারস্য একটি বিস্তীর্ণ মুসলমান রাজ্য।

প্রাথমিক মুসলমানগণ রাজ্য জয়ে যেরূপ লোভ পরতন্ত্র ছিল; তাহাদের ধর্ম্ম সংস্থাপনেও তাহারা সেইরূপ সচেষ্টছিল; কোনদেশ কৃপাণ সাহায্যে পরাজিত হইলে তাহাকে কোরাণের বশীভূত না হইলে সে দেশ উৎসন্ন গেলেও তাহারা ক্ষতিবোধ করিত না; প্রত্যুত কাফের বধ জনিত গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিত। সুতরাং পারস্য দেশজয় করিয়া তথায় তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইল; যাহারা সেই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল তাহারা দেশেই শান্তি পাইল, কিন্তু যাহারা পুরুষ পরম্পরাগত ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইল না, তাহারা অবাধে খড়্গোপরি প্রাণ বিসর্জ্জন দিল; কেহ কেহ বা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া কতকটা নিষ্কৃতি পাইল; যাহারা দেশ পরিত্যাগ করিল তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রথমে অর্ম্মজ বন্দরে যাইয়া কিছুদিন বসবাস করিল; তাহার পর নৌচালন বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পরে সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুজরাটের নিকটবর্ত্তী ডিউদ্বীপে আসিয়া বসবাস নির্দ্দিষ্ট করে; ক্রমে বংশ বৃদ্ধি সহকারে সে স্থান সঙ্কীর্ণ বোধ হওয়ায়; তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইল; সুতরাং গুজরাটে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিল; তখন যদুরাণা গুজরাটের অধিপতি, তিনি তাহাদের প্রতি বেশ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন; এই স্থানে পারসীকগণ নিরাপদ হইয়া উদর

নগরে সর্ব্ব প্রথম আতস বেহারাম বা মন্দনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। এই স্থানে তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া বাস করিয়া ছিলেন, পরে তথা হইতে বোম্বাই প্রদেশে যাইয়া আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া যথা বিধি নিজ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সুখে বাস করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণ নানাদেব দেবী উপাসক পারসীকগণও তাহাই, সুতরাং পরস্পরের সহিত বিসম্বাদ হইবার কোন কারণ ঘটিয়া উঠিলনা; প্রত্যুত পরস্পরে পরস্পরের সহানুভূতি পাইল। তাই পারসীকগণ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবার সুবিধা বুঝিল; ক্রমে দলপুষ্ট হইয়া তাহারা ঐ প্রদেশের প্রধান অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; প্রাচীন পারসীকগণ কেবল অহুর মশজাদের উপাসনা করিতেন; কিন্তু আধুনিক পারসীকগণ তদ্ব্যতীত সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতারও আরাধনা করিয়া থাকেন, পর প্রস্তাবে আধুনিক পারসীকগণের অর্চ্চনা প্রণালী দেখাইবার চেষ্টা করিব।

একটী ফটো-উপলক্ষে।

১

ভুলিলি নিষ্ঠুরে তুই ভুলিলি আমারে
ভুলিলি সে প্রেম কথা—
ভুলিলি বিরহ ব্যথা—
ভুলিলি জীবন তরে এই অভাগারে,
দেখালি রমণী-প্রেম ছায়ার আকারে!

২

আকুল পাগল প্রাণে বেসে ছিনু ভাল
আজি তার প্রতি ফলে
অনুক্ষণ প্রাণ জ্বলে
দেখ প্রিয়ে ভস্ম প্রায় জীবন আমার
শুষ্ক পত্র সম এই প্রণয় আধার।

৩

রমণীর ভালবাসা বুঝিনা কেমন
দুই স্রোত এক হ'ল,
দুই প্রেম ভেসে গেল,
নয়নে নয়নে থাকি ছিল আকিঞ্চন,
ক্ষণিক বিরহে নেত্রে ঝরিত জীবন!

৪

সে দিন ভুলিলি প্রিয়ে জীবনের মত
বলেছিলে যেই দিন
আমি তব প্রেমাধীন
আমি দেহ তুমি প্রাণ জীবন রতন,
রহিলাম প্রেমাধীনী জনম মতন।

৫

জলের লেপনি দিয়ে কে প্রেম শিখালে,
শিখেছিলি এত কথা,
সুধু প্রাণে দি'ত ব্যথা,
মিটিল না ভালবেসে মনের পিপাসা,
দহিছে দহিবে চির আশা ভালবাসা।

৬

মায়াবিনি!
এই দেখ তব চিত্র বৈদ্যুতিক বলে
সেই ভাল বাসা মাখা

সেই সে নয়ন আঁকা
সেই সে মোহিনী হাসি খেলিয়া বেড়ায়,
পাগল আমার প্রাণ দেখিতে যাহায়।

৭

বিজ্ঞান শিখেছ তুমি কত কি সাধিতে,
তুলেছো এ "ফটো," খানি
ঠিক্ অনুরূপ মানি
দিবা নিশি চায় মন হেরিতে যাহারে,
পার না কি পোড়া প্রেম শিখাতে তাহারে?

৮

পার না কি হৃদয়ের দুর্ব্বার যাতনা
আঁকিতে যতন করে
তাহার হৃদয়'পরে
বুঝাইয়া দিতে কত বিরহ তাড়না
বুঝাইতে প্রণয়ের নিরাশ যাতনা।

৯

পারিবে কি হে বিজ্ঞান বল দয়া করি
শুধু কি কৃত্রিম পণা
তোমার এ গুণপনা
ছি ছি ভাই, দূরে যাও চাই না তোমায়,
চাহি না এ ফাটো দাও আদর্শে আমায়।

১০

মেটে কি চাঁদিমা আশা প্রদীপ আলোকে
দর্পণে কি ফল তার
চক্ষু-বত্ন নাহি যার
মিছে ফটো প্রিয়ে তুমি নিদয় যখন,
হায় রে সকলি হ'ল অলিক স্বপন!

শিখধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নানক।

—০:০—

ভারতীয় আর্য্য মহর্ষিগণ যৎকালে হিন্দুকুশের তুষার ধবল শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া সপ্তনদী প্রধাবিত সপ্তসিন্ধু প্রদেশে আগমন পূর্ব্বক আ…
বসবাস দৃঢ় বদ্ধ করিতেছিলেন, তখন বেদ প্রতি…
অবলম্বনীয় ছিল, তাহার বহু শতাব্দী …
…রিত হইয়াছিল

না, তাহারা হৃদয়াভ্যন্তর শূন্য দেখিতেছিলেন, সুতরাং এই সময়ে পূর্ণ চন্দ্রের আবির্ভাব নিতান্তই আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল, সেই অভাব পূরণার্থই বঙ্গদেশে চৈতন্য চন্দ্রের উদয়, আবার সেই জন্যই পঞ্জাবে নানকের জন্ম গ্রহণ, আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে শিখধর্ম্মের সংস্থাপয়িতা নানকের জন্ম বৃত্তান্ত যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে ভট্টি বংশীয় রায় ভুয়া নামক নরপতির অধিকৃত ইরাবতী ...রবর্ত্তী তালবান্দা নামক গ্রামে নানক জন্ম পরিগ্রহ করেন (১), কিন্তু

...শন একখানি হস্ত লিখিত পুস্তকে লিখিত আছে যে,

... গ্রামে বসবাস করিতেন, নানক তথায়

... কনকাচ নামক গ্রা...

কিন্তু ব্যবসা শিক্ষার প্রতি নানকের কিছুমাত্র আস্থা ছিলনা, তিনি বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ এবং অধিকাংশ সময়ই নির্জ্জনে নানাবিধ চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন, সেই বাল্যকালেই তাহার স্বাভাবিক সরল মধুর ও পবিত্র ভাব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় এবং সেই সময়েই তাহার ভবিষ্যৎ মহত্বের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। এইরূপ কিম্বদন্তী যে তিনি পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হন এবং সেই সময়েই বেদ প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্র সকল বীণাপাণি কণ্ঠবৎ অনর্গল উচ্চারণ করিতে সমর্থ হন। (৪) এই বাল্যকালেই তিনি হিন্দু ও মুসলমানগণের যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন এবং পুরাণ ও কোরানের সার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুতাক্ষরী মতে সৈয়দহুসেন নামক কানুবেদীর জনৈক বিদ্বান অপুত্রক ... নকের প্রথম শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই নিকট না... র্ম্মের বহুবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন (৫)। আবার কেহ ... ব্ব নামক ফকির বেশধারী ঈশ্বরদূত সংসারের অ... ম উপদেশ প্রদান করেন (৬)। কিন্তু পঞ্জাব প্র... ইরূপ যে তিনি প্রথমে পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা ক... ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

কথিত আছে নানক সেই শৈশবকালেই পারসী ও আরবী ... প্রথম বর্ণ দৃষ্টেই তাহার ভিতর হইতে ঈশ্বরের স্বরূপতা ও একতা প্রতিপাদ করিয়া তাঁহার বাল-শিক্ষককে অতিশয় চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ... দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বর্ণমালার এই প্রকার অর্থ ক... মোহিত করিতেন (৭)। যাহা হউক বাল্যকালেই নানক ... হইয়া উঠিলেন; এবং এই সময়েই ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণ দর্শনে যেরূপ ব্যথিত—পণ্ডিতগণের মতভিন্নতা প...

(৪) পঞ্জাব রাজ্যের ইতিহাস, বৃত্তখণ্ড, ৬৫ ...

(৫) "Seir-ol Mutakhereen" B...

(৬) Vide Malcolm's "S...

ততোধিক ক্লিষ্ট হইলেন। তিনি এই সময়েই কবির ও গোরক্ষনাথের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত সকল পরিতৃপ্ত হৃদয়ে অনুশীলতা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি আকর্ষিত হইল—তিনি কবির ও গোরক্ষনাথের প্রতি অতিমাত্র প্রীতি সম্পন্ন হইলেন। এইরূপে অল্পকাল হইতেই তাঁহার মন ধর্ম্ম লইয়া বিষম আন্দোলিত হইতে লাগিল—তাঁহার চিত্ত এই গুরুতর চিন্তায় আকৃষ্ট রহিল। তাঁহার মন যখন এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় পরিলিপ্ত তখন তিনি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান প্রাপ্তির আশায় গৃহত্যাগ করিলেন; গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিন্তা-... বিশেষ স্ফূর্ত্তিমতী ও প্রখরা হইল—নানাবিধ শাস্ত্রালোচনার সুন্দর ...হইল এবং নানা প্রকার মনুষ্য চরিত্র সন্দর্শন করিবার সুযোগ ঘটিল। ... ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন, ...র কতকগুলি ফকিরের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা... জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা হন। এই স... ...-মালা তাঁহার কোমল হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া তাঁ... ...ত্রপাত করিয়া দেয় (৮) এইরূপে তিনি বহুবিধ ফকি... ও দরবেশের সহিত নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া ভারতের নানাস্থান ...া বেড়াইলেন; ভারত ভ্রমণ শেষ হইলে তিনি কিছু দিন নির্জ্জন ...স গ্রহণ করেন এবং সেই নির্জ্জন স্থানে—নিঃসহায় অবস্থায় বেদ ও ...ণের মর্ম্ম লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন—মহাদেব ও মহম্মদের উপদেশ ...র শূন্য হৃদয়ে পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই নির্জ্জন ...কালীন ঘটনাক্রমে তথায় কোন হিন্দু সন্ন্যাসী বা মুসলমান ...ল তাঁহাকে ঈশ্বরের যথার্থ আদেশ ও সুখের প্রশস্ত ...তের (৯)। কিছুদিন নির্জ্জন বাসের পর তিনি ...র্গত হন; এবারে আফগানিস্থান, পারস্য, তুরক

...the Sikhs" p 8-13 and Dabiston.

...he Sikhs" p. 38.

প্রভৃতি দেশ সকল পরিভ্রমণ করিয়া বহুক্লেশে বিস্তীর্ণ মরুভূমি পার হইয়া মুসলমানগণের প্রধান তীর্থ—মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা নগরে উপনীত হন(১০) এই বিদেশ ভ্রমণে অনেকগুলি অনুচর তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন; সেই অনুচর বর্গের মধ্যে বীণাবাদক মর্দ্দান, তাঁহার উত্তরাধিকারী লেহনা, জাঠবংশীয় বালা এবং রামদাসই প্রধান।

মক্কায় অবস্থান কালীন নানক সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে; কথিত আছে, এক সময়ে তিনি মক্কার প্রধান মসজিদাভিমুখে পদ-দ্বয় রক্ষা করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন; মসজিদবাসী জনৈক মোল্লা তাহা দেখিতে পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন এবং দ্রুতপদে নানকের নিকট সমুপ
ইয়া তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার ও আল্লার গৃহের প্রতি তাঁহার এ
াদর হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। নানক জাগরিত হইয়া ঈষৎ
হকারে বিনম্র বচনে কহিলেন "ঈশ্বরের গৃহ নহে, পৃথিবীতে এমন
ান আছে কি, যেথানে তিনি পদদ্বয় রক্ষা করিতে পারেন? (
যেখানেই পদ রক্ষা করুক না, তাহাই ঈশ্বরের স্থান; ঈশ্বর শূ
কোথাও নাই (১১)।"

প্লেটো, কেন, ডেকার্টিস, বাস প্রভৃতি মহামহোপাধ
বিধ চেষ্টা করিয়াও যেরূপ কোন নিশ্চিত—সুদৃঢ় মূ
ত সমর্থ হন নাই, যাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া
করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, নানকও সেইরূপ

১০ মুসার কোন স

মনের সুখ কোথাও পাইলেন না; সেইরূপ আবেগপূর্ণ হৃদয়েই তিনি পুনরায় পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই সময়ে নানক দরবেশের পোষাক পরিধান করিতেন; এবং এই বেশেই তিনি মুলতানে নানা দরবেশের সহিত সাক্ষাৎকরেন, ও তাঁহাদের নিকট আপনাকে পবিত্রতা-রূপ মহাসমুদ্রে প্রবেশলাভেচ্ছু গঙ্গা বলিয়া অভিহিত করেন (১২)। এই স্থান হইতে তিনি পিতৃগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং দরবেশের পোষাক পরিত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন। কথিত আছে তাঁহার এইদেশ পরিভ্রমনে পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল (১৩)।

। হউক তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া এক অদৃশ্য ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত াবং লোক সকলকে তাঁহারই অর্চনা করিতে উপদেশ প্রদান করেন চাল হইতেই লোকে তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা ও ধর্মভাব দৃ ত হইতেন ও তাঁহার সুবিন্যস্ত বাক্যাবলী লোকের কর্ণে সু াদিত; সেই সময় হইতেই তিনি দানশীলতার জন্য অতিশয় প্রসি বন। এক্ষণে তিনি যৌবনসীমায় পদার্পন করিয়াছেন নানাদে ন তিনি জ্ঞানী সন্ন্যাসী হইয়াছেন—হিন্দু ও মুসলমানগণের যাবতী না ও গবেষণা করিয়া বহুবিধ জ্ঞান রত্নে বিভূষিত হইয় ত্রই তিনি হিন্দু ও মুসলমানগণের সমান প্রীতিভা ক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী উ শৌকিকতা সম্বন্ধে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মি

আশায়ে শসারারম

নিপতিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি যতই কেন দান করুন না, শস্যের ভাণ্ডার অক্ষয়। তাঁহার ভগিনীপতি ও ভগ্নীপতি-স্বামী দৌলত খাঁন লোদী নানকের এই অমানুষিক দানের কথা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া একদিন অকস্মাৎ তাঁহার শস্য পরিমান করেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রথমে যে পরিমান শস্য সঞ্চিত হইয়াছিল ভাণ্ডারে তাহাই অটুট আছে শস্যের কণিকা মাত্রও অপব্যয়িত হয় নাই, তখন এই অদ্ভুত ব্যাপারে সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং নানককে শত শত ধন্যবাদ দিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। পঞ্জাবাঞ্চলে তৎসম্বন্ধে এইরূপ শত শত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে (১৪)। আর একটি কিম্বদন্তী এই প্রকার ;—কোন সময়ে তদীয় পিতা স্বীয় ব্যবসার নিমিত্ত লবন ক্রয়ার্থ নানককে কতক গুলি মুদ্রা প্রদান করেন ; একটি অরণ্যমধ্য দিয়া লবণ ক্রয় করিতে যাইবার পথ ; নানক তদীয় পিতার একজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত সেই অরণ্য মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে কতক গুলি ক্ষুধিত সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত্ত দর্শনে অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন এবং সেই পিতৃদত্ত ধনে তাঁহাদিগকে উপর্য্যুপরি তিন দিন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। অর্থ এইরূপে নিঃশেষিত হইয়া গেলে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কালুবেদী পুত্রের এবম্বিধ অবৈধ আচরণ দৃষ্টে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তদবধি বিশ্বাস করিয়া নানককে আর কখন অর্থাদি প্রদান করেন নাই। যাহা হউক নানকের এই সমুদায় বাল্য কালের ঘ তাঁহার প্রতি সাধারণ লোকের ভক্তি আকর্ষণ এবং তাঁহার পন্থ প্র রে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

নানক পঞ্চদশ বৎসর নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া গৃহে প্রত্যাগ সংসারাশ্রমে পুনঃপ্রবিষ্ট হইবার পর স্বধর্ম্ম প্রচারে দেহ মন সমর্পন তিনি বাল্যকাল হইতেই কবির ও গোরক্ষনাথের প্রতি প্রীতি সম্প সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদেরই উদার মত সকল গ্রহণ করিলে তাঁহারা যে সকল মহৎ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, নানক যত্ন

(১৪) Vide Malcolm's "Sketch of the Sikhs"

তাহা পরিহার করিলেন। তিনি রামানন্দ বা কবিরের সীমাবদ্ধ ঈশ্বর গ্রহণ করিলেন না এবং তাঁহাদের ন্যায় রাম বা শিবের মত কোন অশেষগুণসম্পন্ন ব্যক্তির উপর ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন না করিয়া একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান—অকালপুরিক—অম্বর—অমর— নিরাকার — স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের উপাসনার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি কেবল একমাত্র সত্যের উপর ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার মতে এই সত্যই পৃথিবীর আদি কারণ—সত্য প্রভাবেই জগৎ চলিতেছে এবং সত্য প্রভাবেই ইহা চিরকাল সমান চলিবে (১৫)। শিখগণ ঈশ্বরকে অকালপুরিক শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন; অকালপুরিক শব্দের অর্থ "সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, যিনি কালে সিদ্ধ নহেন; কাল বা সময় যাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।" কিন্তু নানক এইরূপে কালের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া গেলেও শিখগণের দশমগুরু গোবিন্দ সিংহের পরে এই কালেরই প্রাধান্য খ্যাপন করেন। তাঁহার মতে কালই সৃষ্টির আদিতে বর্ত্তমান ছিল এবং তাহাতেই সমুদায় লয় প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং কালই ঈশ্বর (১৬)।

আমাদের সাংখ্য মতে কাল জগৎ সৃষ্টির সপ্তবিংশতি, পৌরাণীক মতে ত্রিংশৎ ও শৈব বা তান্ত্রিক মতে ষট্‌ত্রিংশৎ মূল ধাতুর মধ্যে একটি। ভারতবর্ষীয় যাবতীয় দার্শনিক পণ্ডিতই এইরূপে কালের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছেন; কিন্তু ইংলণ্ডীয় কবিশ্রেষ্ঠ মিল্টন কালের ক্ষণিকত্ব এবং গুরু সেক্সপীয়র কালের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি স্বীকার করেন (১৭)। যাহা হউক

আদি গ্রন্থ, গৌরিবাগ অধ্যায়।

দ্বিতীয় গ্রন্থ, হাজার শব্দ অধ্যায়।

"For time, though in eternity applied.
notion, measures all things durable.
y present, past and future". Paradise Lost. ch. v.

"But thought's the slave of life, time's fool;
And time that takes survey of all the world.
Must have a stop. Henry IV. Part First.

এইরূপে সত্যের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া নানক মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও সন্ন্যাসী সকলকে সমভাবে, যাঁহার আজ্ঞায় শত শত বিষ্ণু—শত শত মহাদেব—শত শত মহম্মদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনায় আহ্বান করিলেন। তাঁহার মতে নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান বা লৌকিক দানশীলতা, বহুবিধ জ্ঞানোপার্জ্জন বা বীরত্ব এ সকল নিজে কিছুই নহে; ঈশ্বরে যথার্থ ভক্তিই সকলের উপর— সেই ঈশ্বর জ্ঞানের নিকট অন্য কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং নানাবিধ শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া ধর্ম্মকার্য্য করা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র—তাহা কিছুই নহে। তাহার মতে শারীরিক কষ্টকর কোন কার্য্য করিলে লোকে অমর হইতে পারেন না; যিনি বিশুদ্ধ অন্তরে ঈশ্বরের কৃপাকণা আকৃষ্ট করিতে পারেন, তিনিই ধন্য (১৮)। ঈশ্বরের কৃপাকণা লাভের উপায়ও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, লোকে আপনাদের জ্ঞানের সুন্দর ব্যবহার করিলেই ঈশ্বরানুগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন; পরমেশ্বর সৎকর্ম্ম ও সদ্ব্যবহারের উপরেই মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। লোকে ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলে জগদীশ্বর তাঁহাকে তথায় ইহ জগতের কার্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন (১৯); সুতরাং নানক লোককে পরলোক গমনের পূর্ব্বে যথাসাধ্য সৎকর্ম্ম করণের উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, "মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি আপন পাপক্ষালনার্থ অনুতাপ না করিবেন, ঈশ্বরের ক্রোধ তাঁহার উপরেই নিপতিত হইবে।"

নানক তাঁহার নূতন ধর্ম্ম মত প্রচারে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার এরূপ করা স্বাভাবিক; কেন না স্বদেশের পরিপূজিত মতের উন্নতির প্রতি লোকের প্রবৃত্তি যত শীঘ্র আকৃষ্ট হয়, অপর কোন সম্পূর্ণ ভিন্নমতে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি হিন্দুভাব

(১৮) আদি গ্রন্থ, আশারাগ অধ্যায়।

(১৯) আদি গ্রন্থ, প্রভাতী রাগিনী অধ্যায়। And compare Malcolm's "Sketch of the Sikhs" p. 161, and Wilkin's in the "Asiatic Researches" vol. I. p. 289.

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া তিনি হিন্দু ছিলেন না; তাঁহার মত হিন্দুমত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেশীয় সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষণই তাঁহার হিন্দুভাব গ্রহণের কারন; আমরা খৃষ্টের ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ ভাবে তাঁহাকে গ্রীসিয় দার্শনিক মতের সহিত ঐক্যমত্য হইতে দর্শন করি। প্রাথমিক খৃষ্টান প্রচারকগণ বাইবেলের সহিত গ্রীক ইতিহাসের মিলন করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন (২০); অধিক কি ষোড়শ শতাব্দীতেও খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন (২১)।

নানক ভারতীয় দার্শনিক মতানুযায়ী পরলোক গমন করিলে ঈশ্বরে আত্মা ন্যস্ত হওয়াই পরমসুখ বলিয়া প্রচার করিলেন। তাহার মতে, জীবন উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়ার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু আত্মা কুম্ভকার চক্রের ন্যায় নেমি'র চতুর্দ্দিকে সতত ঘূর্ণায়মান (২২)। সাধারণ প্রচলিত ঘটনা হইতে উপদেশ প্রদান করা নানকের অভ্যস্ত ছিল; তিনি অতি সামান্য পদার্থ হইতেই সাধকবর রামপ্রসাদের ঈশ্বরোপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি অঞ্জনের (অন্ধকার) মধ্যে উজ্জ্বল থাকিতে পারেন, তিনিই চরম সুখ প্রাপ্ত হইবার অধিকারী (২৩)। বলা বাহুল্য যে, নানক প্লেটো বা ব্যাসের চক্ষে এই পৃথিবী ও মনুষ্য দর্শন করিয়াছিলেন তিনি পূর্ব্বজন্মবাদ বা মনুষ্যের পাপময় দেহের পৌন পুনিক জন্মগ্রহণ, পাপী মনুষ্যের ক্রমশঃ পাপ ক্ষালন এবং নরকাগ্নির চিরস্থায়ী দাহনে আস্থা প্রকাশ করিতেন। এজন্য তাঁহার উপর দোষারোপ করা অন্যায়; কেন না তিনি ধর্ম্মপ্রকারে ভারত প্রচলিত মতেই অধিকতর আস্থা প্রদ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

(২০) Cheveher Bunsen's "Egypt" vol. I. p. 194.

(২১) Rank's "History of the Popes" p. 125. Fdition of 1843.

(২২) আদি গ্রন্থ, আশাবাগ পর্ব্বাধ্যায়।

(২৩) আদি গ্রন্থ, সহি এবং রামকেলী অধ্যায়।

নারী।

অনন্ত গুণান্বিত, অনন্ত সৌন্দর্য্য ও শান্তিময় পরমপিতা পরমেশ্বর, প্রেম, প্রীতি, দয়া দাক্ষিণ্যের আধার, শান্তির আলয়—পরম পবিত্র নারীজাতিকে বিরলে বসিয়া নীরবে, নিস্তব্ধে, একাগ্রমনে গড়িয়াছেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার চরমোৎকর্ষ নারীজাতিতে সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম নারীজাতিতে বিকাশিত হইয়াছে। যেখানে যাহা শোভাপায—সুন্দর দেখায়, সেখানে তাহা দিয়াই নারীজাতী সাজান হইয়াছে। পদ-নখে পূর্ণচন্দ্র—চরণে মরাল গঞ্জিত গমন—মৃণাল ভুজযুগলে অতুবের সেবাশুশ্রূষা—আধবিকাশিত গোলাপ গঞ্জিত অধর-প্রান্তে ভাবভরা হাসি—নিটোল নিখুঁত আরক্তিম গণ্ডস্থলে সলজ্জ সঙ্কোচ ভাব—সুচারু নয়নে পবিত্র প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি—হৃদয়ে প্রেম, প্রীতি, দয়া, মায়া, সরলতা, মধুরতা। নারী মর্ত্তে স্বর্গীয় জীব। মাতৃরূপে গণেশজননী—অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে গৌরী—কুমারীরূপে জগদ্ধাত্রী। মাতা আপনার সৌন্দর্য্য—আপনার রূপরাশি সন্তানকে প্রদান করিয়া—তাহার লালন পালন করেন। দুঃখবিতাড়িত—শ্রমক্লান্ত—শুষ্ককণ্ঠ সন্তানের মুখ আপন অঞ্চলে মুছাইয়া স্বাদু ফলমূল পানীয়ে ক্ষুৎপিপাসার নিবারণ করেন। স্ত্রী আপনার সুখ দুঃখ ভুলিয়া ছায়ার ন্যায় পতির অনুসারিণী হন। আপনার রূপ যৌবন পতির সেবায় নিয়োজিত করেন। শ্রমক্লান্ত পতির পদ ধৌত করিয়া ধীরে ধীরে ব্যজন করেন—প্রেমপূর্ণ সুমিষ্ট আলাপনে সান্ত্বনা করেন। পতির রোগে আপন পাশরিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া অহর্নিশ পদপ্রান্তে বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন। পবিত্র প্রেম পতির হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া স্বর্গীয় সুখ আনিয়া দেন। কুমারী জগন্মাতা ফুলবাগানের কলি। ইহা পাপকীটে দংশন করেনা—দুঃখ রবিতাপে বিশুষ্ক হয় না—শোকের ঝঞ্ঝাবাতে বিতাড়িত হয় না।

শ্যাম-সুন্দর কচি কচি পাতার আড়ালে থাকিয়া উঁকি মারিয়া সংসারের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে। কখন ভয় পাইয়া ঘন ঘন পাতার মাঝে লুকায়—কখন সাহসে ভর করিয়া বাহিরে আসিয়া হাসিয়া জগতে হাসি ঢালিয়া দেয়, মর্ত্তে স্বর্গীয় হাসির তরঙ্গ ছুটায়। ধীর বাতাসে কখন হেলে, কখন দোলে—কখন বা নাচিয়া নাচিয়া পাতার সহিত খেলা করে। কলিকা সুগন্ধ, সৌন্দর্য্য আপনার পাপ্‌ড়ির মাঝে লুকাইয়া রাখে। ভবিষ্যৎ জীব জগতের জীবন অতি সযতনে—সংগোপনে আপন দেহে চাপিয়া রাখে। কুমারীর প্রেম, প্রীতি, হাসি, খুসিতে জগৎ মোহিত। নারী বসন্তের বাতাস—ধীরে ধীরে ধীরে বহিয়া বন বাগানে গাছে গাছে পাতা নাচায়—রংবিরঙের ফুল ফুটায়—আশেপাশে সৌরভ ছুটায়—অলির মনভুলাইয়া গুণ গুণ রবে ডাকায়—কোকিলকে পাতার মাঝে ঢাকিয়া রাখিয়া আনন্দের কুহু কুহু রব করায়· পরিষ্কার অনন্ত নীল আকাশে তারা ফুটায়—চাঁদ উঠায়—জগতে অনন্ত শান্তি ঢালিয়া দেয়। নারী বর্ষার মেঘ—দুঃখ রবি আপন দেহে আবরিয়া সংসার ঢাকিয়া রাখে। অবিরত শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া গাছ পালা লতা প... বন বাগান্ সাজায়। নদ নদী বর্ষার জলে কানে কানে ভরিয়া, কুমুদ কহ্লার জলজ কুসুম হৃদয়ে ধরিয়া কুলকুল রবে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে প্রবাহিত হয়। বর্ষার মেঘে অঝোরে জল ঝরে, কিন্তু সঘনে চপলা বিকাশ দেখা যায় না। শ্রুতি মধুর গুড় গুড় ধ্বনি কর্ণগোচর হয় কিন্তু বজ্রপাত হয় না। (দুঃখ) রবি-কর আপন হৃদয়ে ধরিয়া নানারঙে সাজিয়া জগৎ হাসায়। কখনও গম্ভীর প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া শান্তিময়ের অনন্ত শান্তি ঢালিয়া দেয়। নারী (বিধবা) শীতের শীতল বাতাস। হৃদয় ভাঙা শোক চা... রাখিতে রাখিতে হুহু করিয়া ছুটে। সে বাতাসে নদ নদী জমাট বাঁধিয়া যায় গাছপালার পাতা ঝরিয়া পড়ে-ফুল বাগানে বনের মাঝে রং বিরঙের সৌখিন ফুল গুলি শুকাইয়া যায়—স্তূপে স্তূপে তুষার উড়িয়া সব ঢাকিয়া ফেলে—জগৎ ধপ্ ধপে শাদা হইয়া আপন বিচিত্রতা—আপন মলিনতা ছাপাইয়া ফেলে। সে বাতাস ধীরে ধীরে ধীরে স্বার্থের উষ্ণতায় উষ্ণ—শান্তিশূন্য—কলহ ময় প্রদেশে প্রবাহিত হইয়া আপনার শৈত্যে উষ্ণভাব লাঘব করিয়া নদী ছুটায়—শিশির ঝরায়—ফুল ফুটায় জগৎ সাজায়। নারী

ছিল সরোবরে কমলিনী। পঙ্কে জন্মিয়া জলের উপর উঠিয়া আপন রূপে-গুণে সৌরভে জগৎ আলোকিত করে—চারিদিক আমোদিত করে। নারী বনলতা। যখন বনে—প্রকৃতির কোলে শোভা পাইত—তখন প্রখর রবি কিরণে—দুরন্ত শীতে—প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আপন জীবন বাঁচাইয়া—আপনার আহার আপনি জুটাইয়া—ফুল ফুটাইয়া—গন্ধ ছুটাইয়া—ফল ভরে অবনত হইয়া—প্রাণের হাসি হাসিয়া জগৎ হাসাইত। জীবনাভিনয় শেষ করিয়া ধীরে ধীরে জগৎ-নেপথ্যে চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেই বন লতা বন ছাড়িয়া, প্রমোদ কাননে মনোহর টবের মাঝে শোভা পাইতেছে। তাহার সেই বনজ কোমলতা—দৃঢ়তা সৌন্দর্য্য—গাম্ভীর্য্য আর নাই। এখন সে একটু বাতাসে হেলিয়া পড়ে—একটু রৌদ্রে ঝলসিয়া যায়—একটু শীতে মর মর হয়। এখন তাহার মনোহর ফুল ফুটে না—গন্ধ ছুটে না—ফল ধরে না। এখন সে প্রাণের হাসি হাসে না—হাসে কাষ্ঠ হাসি, এখন জীবনাভিনয় শেষ না করিয়াই দ্রুত পদে জগৎ-নেপথ্যে চলিয়া যায়। নারী শান্তির প্রতিমা। সারাদিনের পরিশ্রমের পর গৃহে প্রবেশ করিলে মাতার সস্নেহ সম্বোধনে—প্রণয়িনীর প্রীতি মাখান সম্ভাষণে—মেয়েটির ছোট হাতে দুখানি গলা জড়িয়া ধরায়, শ্রম জনিত ক্লেশ দূরে পলায়ন করে, সুখ শান্তিতে হৃদয় ভরিয়া যায়। নারী সংসারে পাতাঢাকা অশ্বত্থ গাছ। মানব সূর্য্যতাপে তাপিত হইয়া ইহার ছায়ায় বিশ্রাম করে—গান গায়—সুখে হাসে। শীতল বাতাসে পাখির গান শুনিতে শুনিতে সুখে নিদ্রা যায়। নারী দেবী, তাহাতে পার্থিব মলিনতা নাই। স্বার্থের নাম গন্ধ নাই। পাপের পূতি গন্ধ নাই। অশান্তির উত্তাপ নাই। আছে অকলঙ্ক রূপ রাশি—অনন্ত গুণ—অপার্থিব পবিত্রতা—অনন্ত শান্তি। হায়! কি পরিতাপের বিষয় আজ সেই দেবী আমাদের আমোদের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আপনার মনের মত নানা অলঙ্কার, বিবিধ বেশ ভূষায় সাজাইয়া পালঙে বসাইয়া নানা রঙ্‌তামাসা করিতেছি। কখনও টপ্পার সুরে—মদের কুপে—নরক কুণ্ডে ডুবাইয়া বীভৎস খেলা খেলিতেছি। আমাদের দোষে তাঁহার সেই রূপ-গুণ-সৌন্দর্য্য-পবিত্রতা আর নাই। পার্থিব মলিনতায় মূর্ত্তিখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে। নারী বিশ্ব সংসারে বন্ধন—মহামায়া। মানব নারীর গুণেই সংসার

নারীর গুণেই মানব ইঁটখানি, কাঠ খানি দিয়া ঘর বাঁধিয়া—আপনপ্রাণের চারিদিকে গাছটি, পালাটি, দিয়া সাজাইয়া সুখে বাস করে। প্রতিবেশিদিগকে ভাল বাসিয়া আপনার প্রেম বাড়াইয়া বিশ্ব সংসার প্রেমে বাঁধিয়া ফেলে। মানব সংসারী হইয়া কর্ত্তব্য পালনে নিরত হয়। নারী অভাবে মানব সংসারে থাকিয়াই সংসার ত্যাগী—সন্ন্যাসী। সুরম্য অট্টালিকা—বিবিধ ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়াই পর্ণ কুটির নিবাসী ভিখারী। নিয়ত আমোদ আহ্লাদের মধ্যে থাকিয়াই নিরানন্দ। সুখ-সংসারে ডুবিয়াই অসুখী। চেতনেই অচেতন—সংসারে থাকিয়াই "নাই" হইয়া যায়। হায়! বলিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়, এখন আমরা সেই কল্যাণী নারীর কতনা যাতনা দিতেছি, কতনা লাঞ্ছনা করিতেছি। তাঁহাকে নিগড় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া কঠিন কারাগারে পুরিয়াছি। দারুণ শোকে দুঃখে যন্ত্রনায় স্বর্ণ প্রতিমা মলিন হইয়া গিয়াছে। নারী (বিধবা) অকূল দুঃখ সাগরে পতিত হইয়া চির জীবন অশ্রু বিসর্জ্জনে ধরণী প্লাবিত করিতেছে। সুখ দুঃখ বিমিশ্র ঝটিকাবর্ত্তসংক্ষোভিত সংসার সাগরে পতিত হইয়া অকর্ণধার নৌকার ন্যায় চারিদিকে প্রবল বেগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতল জলে প্রবেশ করিতেছে। সে দিকে আমাদের দিক পাত নাই। আমরা আপনার সুখে—আপনার আনন্দে আপনি মজিয়া আছি। তাঁহার সেই বিঘোর যন্ত্রণা দেখিয়াও দেখিতেছি না—রক্ষার উপায় থাকিতেও রক্ষার চেষ্টা করিতেছি না। বরঞ্চ ডুবিবার সহায়তাই করিতেছি। শুধু তাহাই নয়, আবার মাঝে মাঝে স্ত্রী জাতির কথা, অলঙ্কারপ্রিয়তা, ঝাঁটা, কুলবালা প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিয়া জ্বালার উপর দ্বিগুণ যন্ত্রণা দিতেছি। ধিক্! আমাদিগকে শত ধিক্! আমরা হৃদয় হীন—পশু। নতুবা কি আমরা আত্ম-সুখে মজিয়া, সুখের সংসার কঠিন কারাগার করিয়া তুলিতাম? চারিদিকে অশান্তির আগুন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আগুনে আমরাও পুড়িয়া মরিতেছি, তথাপিও জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন হইতেছে না। আমরা দারুণ যাতনায় অস্থির হইয়া ঘর ছাড়িয়া শান্তির জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। হায়! যার ঘরে অশান্তি তার বাহিরে শান্তি কথায়? যার ঘরে ক্রন্দন রোল, তার বাহিরে আনন্দ কোথায়? যার গৃহে অন্ন কষ্ট, সে বাহিরে দাতা কবে? হায়! আমাদের কি জ্ঞানের উন্মেষ হইবে না? আমরা কি

নারীর অশ্রুজল মুছাইব না? নারীর শোক দুঃখ প্রপীড়িত হৃদয়ে শান্তি ঢালিয়া দিয়া অনন্ত শান্তি লাভ করিতে পারিব না? কখন কখন ইংরেজ শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া আমরা কত কথাই না বলিয়া থাকি? নূতন নূতন পদ লাভের জন্য কতই না আবদার করিয়া থাকি? সাম্য স্বাধীনতা লইয়া কতই না নাড়াচাড়া করিয়া থাকি? অত্যাচারের বিরুদ্ধে লম্বা চৌড়া আর্টিকেলে সংবাদ পত্রের তিন চারি কলমও না ভরিয়া থাকি? গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিশ্বাস করে না বলিয়া কতই না আকুলি বিকুলি করিয়া থাকি? কিন্তু নারী—দেবী—যাঁহাকে নরক কুণ্ডে ফেলিয়া দারুণ অত্যাচারে অস্থিমজ্জার নিষ্পেশিত করিতেছি তাঁহার অশ্রুজলের প্রতি কি কখনও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকি? কখনও কি তাঁহাকে সাম্য-স্বাধীনতার সুখ ভোগ করিতে দিই? কখনও কি তাঁহাকে নরক কুণ্ড হইতে উঠাইয়া স্বর্গে আনিতে চেষ্টা করি? কখনও কি তাহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকি? ছিছি এরূপ স্বার্থপরতা বড় বিষম, অবলা বিধবা বালিকা হৃদয় জ্বালায় পুড়িবে আর আমি বৃদ্ধ আবার চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করিব, তিনি এতদূর স্বার্থপর যিনি রমণীকে দাসী বলিয়া বিবেচনা করেন, কিছু মাত্র সাম্য স্বাধীনতা দিতে অকুণ্ঠিত, তাঁহার হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিন, তাঁহার হৃদয় অশান্তির আধার, উষর ক্ষেত্র,—যতদিন না আমরা নরক কুণ্ডে পতিত নারীর উদ্ধার সাধন করিব—যত দিন না বিধবা বালার অশ্রুজল মুছাইব—যতদিন না নারীকে বিশ্বাস করিব—যতদিন না নারীকে সাম্য স্বাধীনতার রসাস্বাদন করিতে দিব—যত দিন না তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করিব ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নাই। সুখ শান্তির আশা নাই। ততদিন আমাদিগকে অশান্তির আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। দারুণ অত্যাচারে অস্থিমজ্জার নিষ্পেশিত হইতে হইবে। তবে এস ভ্রাতৃগণ! আমরা মহৎ স্বার্থের অনুরোধে ক্ষুদ্রস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নারী জাতির অবস্থা উন্নত করিতে যত্নবান হই।

শ্রীমোহিনী মোহন লাহিড়ী

চেন কি এখন ?

১

চেন কি এখন প্রিয়ে চিনিতে কি পার,
আছে কি স্মরণে আর
সেই প্রেম সুধাধার
শৈশবের ভালবাসা স্নেহ মায়া যত—
কিম্বা বিস্মৃতির নীরে হয়েছে নিহত।

২

একদিন, বহু দিন, হয়কি স্মরণ
সেই সরোবর তীরে
সেই সারাবর নীরে
দাঁড়ায়ে করিলে কত অশ্রু বরিষণ
মুক্তাবলী যেন ধীরে হইল পতন।

৩

বলিলে কতই,—না না কাজ নাই আর
কাজ নাই জাগাইয়া
সে স্মৃতি কাঁদাতে হিয়া
কাজ নাই পূর্ব্ব কথা নিস্ফল তেমন—
জাগায়ে করিতে তব বিকল জীবন।

৪

না-কাল অশ্রুনীর, না হাসিল মুখ
বিষাদিনী পাগলিনী
হ'লে পর প্রণয়িনী
বলিলে আমারে কত নিষ্ঠুর বচন
কি করিবে হলে তব নিয়তি যেমন।

৫

সে অবধি এক দিন দেখিনি তোমারে,
কতবার কত ছলে
জানি তুমি এসেছিলে
দেখিতে এ অভাগারে আছে লো স্মরণ
কিন্তু দেখা দিই নাই করিয়া মনন।

৬

বিষাদিত হৃদে আহা বিষণ্ণ বদনে
করি ছল ছল আঁখি
ঘরে যেতে বিধুমুখি
তাহে কি এ প্রাণ নাহি করিত রোদন—
সে যাতনা কে জানিবে জানে এই মন।

৭

ক্রমেতে তোমার হৃদি হল প্রবর্ত্তিত
তোমার কোমল মন—
ভুলিল এ অভাজন—
ভুলিলে আমারে বুঝি জন্মের মতন
মনের অস্ফুট সাধ পুরিল তখন।

৮

ক্রমেতে যৌবন—হ'ল তাহাও বিগত,
নবীর পুতলি ছুটী
অপরূপ পরিপাটী—
তোমার নয়ন তারা হয়েছে এখন—
সন্তানের মাতা এবে স্নেহ নিকেতন।

৯

এত দিনে বিধু মুখি বোধ হয় মনে—
হৃদয়ের অনুরাগ
হতাস প্রেমের দাগ
তোমার হৃদয় হ'তে হয়েছে বিগত
ভুলিতে পেরেছ মোরে জনমের মত।

১০

পেরেছ কি প্রিয়তমে পেরেছ কি বল
শুনিলে সে কথা প্রিয়ে
উছলিত হবে হিয়ে,
ভাবিব সে আছে সুখে, শৈশব সবলে
বাসিত যে ভাল মোরে মানস আকুলে।

১১

স্বাধীনতা রমণীর থাকিলে এ দেশে
আজি কত সুখ আসে
যাইতাম তব পাশে
পবিত্র প্রীতির চক্ষে বাসিতাম ভাল
ঘুচিত এ হৃদয়ের দারুণ জঞ্জাল।

বিরজা।

—০৩৩০—

(উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রেম সম্ভাষণ।

শতাব্দি বিগত হইয়াছে,—যখন বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার রত্নময় সিংহাসনে বাদসাহ সিরাজ উদ্দৌলা আধিপত্য করিতেন, যখন সেই ঘোর নির্দ্দয় পাষণ্ডের অত্যাচারে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা রোদন করিত, আমরা সেই সময়ের একটী ঘটনা বিবৃত করিতে অগ্রসর।

গ্রীষ্মকাল, তপন দেব মনের সাধে পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিমাকাশে আপন রক্তিম লোচন বিস্তার করিতেছেন, যেন আশা মিটেনাই, আরও দগ্ধ করিতে ইচ্ছা আছে। বিহঙ্গমগণ যেন বিদায় পর মার্ত্তণ্ডদেবের হৃদয়গত ভয়াবহ ভাব অবগত হইয়াই কাকুলিসহ সভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। ব্রততী মৃদু বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া সহকার তরুকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছে, মনের আশা মিটাইয়া লইতেছে। তরুশিরে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি যেন আপনাপন ক্ষণিক জীবনে পরিতৃপ্ত জানিয়া কাহারও বিষাদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে হাসিতেছে, এমন সময়ে নন্দনপুরের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী তীরে ধীর পাদ বিক্ষেপে একটী যুবক উপস্থিত হইলেন, যুবকটীর বয়ঃক্রম অন্যূন বিংশতি বর্ষ, উন্নত নাসিকা; সুটানা ভ্রূযুগল, দীর্ঘচক্ষু, গঠনলালিত্য ও অঙ্গাবয়বের পরিপাট্য তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ; কিন্তু কে জানে, এ সমস্ত সৌন্দর্য্যেও যেন কিসের অভাব ছিল, সে সুন্দর চক্ষু যুগলে যেন সে পূর্ণ জ্যোতিঃ নাই, যৌবনের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি নাই, বদন বিরস।

গোওস্মিথ বলিয়াছেন যে "লোকেব দরিদ্রতা তাহাব মুখভাবে প্রকাশ পায়, আমরাও এ কথাটী স্বীকাব কবি, যুবকটীব মুখভাব পরীক্ষা কবিলে এ বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম কবা যায়।

যুবকটীব নাম অম্বিকাচবণ, অম্বিকাচবণেব ইহ সংসাবে কেহই নাই, মাতা ছিলেন তিনিও প্রায দুই বৎসব অতীত হইল মৃত্যু হইয়াছেন, অম্বিকার অবস্থা অতি মন্দ, গোপালচন্দ্র গ্রামস্থ জমিদাবেব নায়েব, অম্বিকা তাঁহারই অধীনে চাকুবি কবেন, যাহা কিছু পান তদ্বাবা কায ক্লেশে দিনাতিপাত হয়। অম্বিকাচবণেব বাল্যাবধি লেখাপডায বড় মনোযোগ, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার সফলতাও হইযাছিল। অম্বিকা বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পাবসী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু সহায নাই, সুতবাং লেখাপড়া শিখিয়াও তাহাব কোন ফল দর্শে নাই, অম্বিকা মুর্খ নায়েবেব অধীনে চাকুবি কবিয়া দিনাতিপাত কবেন।

অম্বিকাচবণ কিছুক্ষণ সেই অস্তগামী সূর্য্যকব-দীপ্ত ক্ষুদ্র প্রবাহিণীর বিমল বক্ষপ্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া বহিলেন, পবে নিস্তব্ধভাবে ইতস্ততঃ পবিভ্রমণ কবিতে লাগিলেন, এমত সময়ে তথায একটী বমণী আসিয়া উপস্থিত হইল, বমণীর বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর—দেখিতে পবম রমণীয, বর্ণ পূর্ণোজ্জ্বল, বক্ষেব ভাব অতি সুন্দর, মনোহব নাসিকা, দিব্যচক্ষু, তাহাতে মধুব যৌবনেব সুখময়ী লালিত্য—সুন্দবী গ্রামস্থ জমীদারেব নায়েব গোপালচন্দ্রেব দুহিতা নাম— "বিরজা।"

বমণীটীকে দেখিয়া অম্বিকাচবণ যেন সহসা পূর্ব্বাপেক্ষা হর্ষোৎফুল্ল হইলেন, বমণীটী ধীব পাদ বিক্ষেপে তাঁহাব নিকটে আসিলেন, উভয়ে অনেকক্ষণ—উভয়েব বদন প্রতি তাকাইয়া বহিলেন, পবে বিরজা বলিলেন "তুমি দিন দিনমলিন ও কৃশ হচ্চ কেন?"

অম্বিকা। বিবজা। যে দুঃখী তাহাব কি না সম্ভবে? আমি যদি মলিন ও কৃশ না হব তবে কে হবে?

বিরজা নিস্তব্ধ হইল, তাহাব সেই সুন্দব চক্ষু বহিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু বিনির্গত হইল।

অম্বিকা। বিবজা, তুমি কাঁদচ?

বিরজা অধোবদন হইল, কোন উত্তর দিল না।

অম্বিকা। কেন বিরজা, কেন তুমি কাঁদচ?

বিরজা। তোমার অবস্থা দেখে।

অম্বিকা। দরিদ্রের শোচনীয় অবস্থা দেখে কি তোমার হৃদয় কাঁদে?

বিরজা তাহার কোন উত্তর দিল না, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

"বিরজা কাঁদিতেছ" বলিয়া অম্বিকাচরণ বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন, অম্বিকার প্রাণ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করিল, বিরজা আবার একবার অম্বিকার প্রতি চাহিল, তাহার নয়ন যুগল হইতে আবার প্রবলবেগে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অম্বিকাচরণ সযত্নে বিরজার নয়ন বারি মুছাইয়া দিলেন, বিরজা ধীরে ধীরে আপন মস্তকটী অম্বিকাচরণের চিত্তোদ্বেলিত বক্ষে রক্ষিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন অম্বিকাচরণের দারিদ্র্যনিপীড়িত চিত্তে যে কি অপূর্ব্ব ভাব ক্রীড়া করিতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ ও কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, জগৎ ভুলিলেন, দারিদ্রতা বিস্মৃত হইলেন, জগতের যাবতীয় ক্রুরতা বিস্মৃত হইলেন, হৃদয়াকাশে যে ঘোর ঘনঘটা এতকাল বিরাজ করিয়াছিল তাহা অপনীত হইল, সুখদ শারদীয় পূর্ণ শশাঙ্ক যেন তাহার শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল, সে শোভা অপূর্ব্ব, সে শোভার প্রভাবে দীন সম্রাজ্য পায়,—আজি দৈবানুগ্রহে দরিদ্র অম্বিকাচরণ সেই দেবতা বাঞ্ছিত সম্রাজ্যের অধিকারী। এখন এ কুটিল বিশ্ব সংসারে আর তাহার প্রতিদ্বন্দী কে? আমরা বলি অম্বিকাচরণ তুমি ধন্য, এখন তোমার দারিদ্র্য অনেকের স্পৃহনীয়, যাহার স্বপ্নের সফলতা হয়, তাহার তুল্য সুখী এ সংসারে আর কে আছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আশার অঙ্কুর ।

নন্দনপুরের জমিদার মহাশয়ের নাম উমাচরণ। উমাচরণের পিতার তিনি একমাত্র পুত্র। যৌবনকালে উমাচরণের চরিত্র ভাল না থাকায় তাঁহার সমস্ত বিষয় বিভব তদীয় পৌত্র বিজয় কৃষ্ণের নামে উইল করিয়া যান। উমাচরণ নামে ও কার্য্যে জমিদার বটেন, কিন্তু বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার পুত্র বিজয়কৃষ্ণের। উমাচরণ অত্যন্ত দুর্দান্ত জমিদার ছিলেন, তাঁহার প্রতাপে প্রজাবর্গ ব্যাকুল, কথায় বলে "বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়" বস্তুতঃ ইহার জমিদারিতে তাহাই ছিল। যদিও উমাচরণ রাজ সরকার হইতে রাজ সম্মান সূচক কোন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তথাপি তাঁহাকে লোকে "রাজা বাহাদুর" বলিত। তিনিও মনে মনে আপনাকে রাজা বলিয়া জানিতেন।

জমীদার বা রাজা বাহাদুরের বাটী নন্দনপুরের এক প্রান্তভাগে, বাটিটী সেকেলে ধরণের, কিন্তু বৃহৎ—সদর অন্দর প্রায় একত্রেই—চতুর্দ্দিকে ত্রিতল চক্। বাটীর মধ্যে উমাচরণ বাবুর স্ত্রী তাঁহার ভগ্নী তিনি ও পুত্র—বিজয় কৃষ্ণ এতদ্ব্যতীত আত্ম সম্পর্কীয় আর কেহ ছিলেন না।

মনুষ্য চিরদিন আপনার ভাগ্যলিপির প্রসন্নতা গণিয়া থাকে, অধিক কি তৎসম্বন্ধীয় স্বপ্ন দর্শনেও সুখানুভব করে, এই অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা যখন মানব মাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন গোপাল চন্দ্র যে তাহার বিপর্য্যয় করিবেন, ইহা স্বপ্ন বা ঘোর দুরাশা মাত্র। গোপাল চন্দ্রের সাধের দুহিতা বিরজা অম্বিকাকে ভালবাসে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুষ্কর্ম্ম বা পাপের কার্য্য আর কি হইতে পারে? পণ্ডিতে আত্মসমর্পণ সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু সংসার বলিতেছে পণ্ডিত হইলে কি হইবে. যাহার

অর্থ নাই সে কি মনুষ্য ? সে কি কখন প্রেমিক পদ বাচ্য হইতে পারে ?—আমাদের গোপাল চন্দ্রেরও সেই ধারণা, বিরজার এই অসঙ্গত অলৌকিক আত্মসমর্পণ তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত করিতেছিল, তিনি তাহার প্রদাহনে অস্থির হইতেছিলেন।

গোপাল চন্দ্রের আশা বড় উচ্চ ছিল, তিনি মনে করিতেন বুঝি বিরজার তুল্য সুন্দরী আর দ্বিতীয় নাই, বস্তুতঃ গোপালের ধারণা নিতান্ত অলীক নহে। তাঁহার ধারণা ছিল বিরজা রাজরাণী হইবার উপযুক্ত, তবে একটী রাজা খুঁজিয়া মিলেনা, কিন্তু তথাপি গোপাল তাঁহার আশালতার মূলে অবিরত আশাবারিসিঞ্চন করিতেন।

মনুষ্য একটী সূত্র ধরিয়া আশার অঙ্কপাতকরে। সুতরাং আমাদের বিচক্ষণ নায়েব মহাশয়ের আশা যে সূত্রহীন তাহা কি করিয়া বলিব ?—কিন্তু সে সূত্রটী কি ? নন্দনপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদার যাঁহাকে লোকে রাজা বলিয়া জানিত, তাঁহার বিজয় নামে একটীমাত্র পুত্র, তাহা বোধ হয় পাঠক অবগত আছেন। তিনি অবিবাহিত। কিন্তু উমাচরণ যে তাঁহার একমাত্র পুত্রের সামান্য নায়েবের কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন ইহা কি সম্ভব ? কিন্তু গোপাল ভাবিত সম্পূর্ণ সম্ভব। গোপাল রামচন্দ্র জন্মাইবার পূর্ব্বে রামায়ণ প্রকটনের ন্যায় স্বীয় ভবিষ্যত সফলতার একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তিনি বিজয়ের চরিত্র বেশজানিতেন, অর্থ সম্পন্ন জমীদারের মূর্খ পুত্র যে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভূত বিজয়ও যে সেই রূপ তাহা স্বীকার্য্য। গোপালচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে বিজয় যদ্যাপি কোন প্রকার উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া একবার বিরজার রূপে মুগ্ধ হয় তাহা হইলেই তিনি স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন। বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। তাহার এ বিবাহে উমাচরণ বাবু বিরক্ত হইলেও কোন বিশেষ ক্ষতি নাই, তিনিই তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিবেন, বিজয় সাবালক, মনে করিলেই পিতৃ হস্ত হইতে বিষয় বহির্গত করিয়া লইতে পারিবে। বস্তুতঃ গোপালের এই আশাই দৃঢ়রূপে তাহার হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিল, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। এবং এই আশাতেই বিজয়কে উত্তেজিত করিয়া অনাথ সহায়-

শূন্য আশ্রয় হীন অম্বিকাচরণের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতযত্ন হইয়াছেন।

বেলা প্রায় অবসান সূর্য্যের স্তিমিত কিরণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভূমি হইতে ক্রমশঃ বৃক্ষ শাখা, তথা হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধে এই রূপে ক্রমান্বয়ে আকাশে উঠিতেছে, এমত সময়ে এইরূপ সু-বা-দুশ্চিন্তা সহচরী সমভিব্যাহারে গোপাল চন্দ্র কত প্রকার কত কৌশল চিন্তা করিতে করিতে কার্য্যস্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, বিজয় একাকী সেই পথে মৃদু পাদ বিক্ষেপে বিচরণ করিতেছেন। বিজয়ের বয়ঃক্রম অন্যূন উনবিংশতি বর্ষ—দেখিতে বেশ সুশ্রী,—কিন্তু শীর্ণ, যৌবনের যদৃচ্ছ অপব্যয়ে সাধারণতঃ যুবকের যে রূপ হইয়া থাকে, ইনিও তদ্রূপ হইয়াছেন। গোপাল তাঁহাকে দূর হইতে চিনিলেন, মনে মনে বলিলেন "জগদীশ্বর আমাকে এমন দিন কবে দিবেন যে দিন বিজয়কে জামাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রাণ জুড়াইব," গোপালের চক্ষে প্রকৃতই আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল,—একবারে পশ্চাৎ ফিরিয়া বিজয়ের বাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সুধাধবলিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল, মনে মনে বলিলেন "বিরজে! তুই এই অমরাবতীতে বিরাজ করিবি, নন্দনকাননের প্রস্ফুটিত পারিজাত হইবি, ইহা কি কম ভাগ্যের কথা।" তখনই আবার হত ভাগ্য অম্বিকাচরণের বিষণ্ণ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় পটে স্থান পাইল, হৃদয়ে কে যেন অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইল। এমত সময়ে গোপাল বিজয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, গোপালচন্দ্র বলিলেন "আজ যে এ দিকে।"

বিজয়। তোমার মেয়েকে দেখ্‌তে।

গোপালচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার কুটীরে আপনার পদার্পন হবে।"

উভয়ে চলিলেন, গোপাল বিজয়ের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন ক্রমশ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গোপাল তাঁহার বাটীর সম্মুখে একটি সুন্দর পুষ্প কানন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বিজয়কে দেখাইলেন। বিজয় তাহার পারিপাট্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তথা হইতে তাঁহাকে

বাটীর মধ্যস্থ উপরের ঘর—যে ঘরে বিরজা ও বিজলী বসিয়া ছিল, সেই ঘরে লইয়া গেলেন, তথায় একটী সুন্দর পরিস্কার শয্যা ছিল, গোপালচন্দ্র অতি সমাদরে বিজয়কে তাহাতে উপবেশন করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজয়চন্দ্র।

সহসা কক্ষমধ্যে বিজয়কে দেখিয়া বিরজা লজ্জাবনতমুখী হইয়া গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। বিরজার দাসী তাহার অনুসরণ করিল। বসন্ত যৌবনা স্থিরা সৌদামিনীরূপা বিরাজকে দেখিয়া বিজয়ের মন যে বিচলিত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই, বিজয় বিমূঢের ন্যায় গৃহান্তর গমনপর বিরজার প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। বিরজার অপূর্ব্ব মুখশ্রী একবার মাত্র বিজয়ের কলুসিত নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাহাতেই যেন কি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াবলে তথায় তাহা অঙ্কিত হইয়াগেল। গোপাল চন্দ্র সকল বিষয়েই বিচক্ষণ, তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিজয়ের হৃদয়গত ভাব অবগত হইয়া মনে মনে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা গণনা করিয়া পুলকিত হইলেন।

গোপাল বিরজাকে গৃহান্তরে গমন করিতে দেখিয়া বলিলেন "বিরজা এদিকে এস, ওঁকে লজ্জা কি ?"

বিরজা আসিল না।

বিজয়। তোমার কন্যাটী পরমা সুন্দরী।

গোপাল "আজ্ঞা হঁ" বলিয়া আবার বিরজাকে বলিলেন "এস মা এস, এদিকে এস।"

বিরজা তথাপি আসিল না।

বিজয়। তাইত এযে বড় লজ্জা।

গোপাল। বিরজা! কথা শুন্‌চনা?

বিরজা লজ্জাবনতমুখী হইয়া দ্বার দেশে অধোবদনে দণ্ডায়মানা হইল, আবার বিজয় নির্নিমেষ লোচনে সেই সুধাময়ীর রূপবিভা অবলোকন করিয়া নয়ন পবিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

বিরজাব মুখে কথা নাই, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। গোপাল চন্দ্র এমত সময়ে কোন কার্যেব ভাণ কবিয়া নিচেয় গেলেন, সেই সঙ্গে দাসী বিজলীকেও ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

বিরজাও যাইবাব উপক্রম করিল, কিন্তু গোপালচন্দ্র বাগভরে কহিলেন "উঁনি কি একা থাকিবেন, তুমি একটু থাকৃতে পার না।"

বিরজার চক্ষু সজল হইল, দুই এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুবাবি ধীরে স্খলিত হইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ কবিল। বিরজা দাঁড়াইল।

বিজয় গাত্রোত্থান করিয়া বিরজার হস্ত ধারণ কবিলেন; কিন্তু বিরজার তাহা সহ্য হইলনা, সে সজোরে স্বীয় হস্তাকর্ষণ করিয়া সরোদনে প্রস্থান কবিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় বিজয় কিছু মাত্র অপ্রতিভ হইলেন না, দ্বারের পশ্চাৎভাগে গোপালচন্দ্র গুপ্ত ভাবে তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। বিরজাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া রোষভরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "পাজি মেয়ে, যাঁর খেয়ে এত বড়টা হলি তাঁর কথা শুনিস্ নে। তোর সৌভাগ্য যে উঁনি তোকে বিবাহ করতে চেয়েছেন।" বিজয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন" বিরজা বালিকা, আপনি ওর কথায় কিছু মনে করিবেন না। আপনার প্রস্তাব আমার শিরোধার্য্য।"

বিজয়। তবে আমি এখন আসি?

গোলাপ কুণ্ঠিতভাবে বলিল" বলতে পারিনে, জলখাবার আয়োজন হয়েছে, যদি—"

বিজয় গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন "না না আজ নয়, আর এক দিন হবে।"

গোপাল চন্দ্র আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। বিজয় ধীর পাদ বিক্ষেপে বিরজার অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। গোপাল বাটীর বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রিয় সম্মিলন।

আবার সন্ধ্যা কাল,—যে সময়ে প্রণয়ীর হৃদয়ে প্রেমের প্রফুল্ল মূর্ত্তি সমধিক জাগরিত হয়, যে সময়ে প্রেমের বিলাসক্ষেত্রে নবমল্লিকা প্রস্ফুটিত হয়, সেই সুখদ সময়ে, সেই পূর্ব্বস্থানে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্রণয়ীদ্বয় সম্মিলিত। কিন্তু পাঠক! মনে করিবেন না যে উভয়ে প্রেমের লহরী লীলায় লীন। হায় দরিদ্রতা, তোমার নিকট কি প্রণয়ীরও অব্যাহতি নাই?—প্রণয়ের অনন্তসুখ ইহাও কি তোমার অভাবে অলিক স্বপ্ন?

প্রণয়ীদ্বয় অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিলেন, পরে অম্বিকা বলিলেন "বিরজা! তুমি আমায় ভাল বাসিয়া আপন সুখ নষ্ট করিলে?"

বিরাজা সোৎসুকভাবে কহিল "কেন অম্বিকা?"

অম্বিকা। দেখ বিরজা, আমি এমন অমূল্য নিধি, স্বপ্নের সুখৈশ্বর্য্য হাতে পাইয়াও সুখানুভবে অসমর্থ, একে দরিদ্রতা—মর্ম্মভেদী দরিদ্রতা, তদুপরে নৃশংস অপমানের ভয়ঙ্কর বিষে জর্জ্জরিত। বিরজা এ দরিদ্রের উষর হৃদয়ক্ষেত্রে কি প্রেমাঙ্কুর প্রস্ফুটিত হওয়া বিধাতার অভিপ্রেত হইতে পারে?

অম্বিকার চক্ষে জল আসিল। বিরাজা অম্বিকাব চক্ষেব জল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "অম্বিক্! কাঁদিও না, তোমার এক বিন্দু অশ্রুজল আমার হৃদয়ে উত্তপ্ত তরল লৌহ ঢালিয়া দেয়, আমি সকল সহ্য করিতে পারি কিন্তু তোমাব চক্ষেব জল দেখিতে পাবি না।"

অম্বিকা। বিবজা, প্রাণাধিকে বিবজা! আমি বামন হইযা চন্দ্রস্পর্শ কবিয়াছি, কিন্তু প্রিয়ে। তুমি কি মনে কর যে তুমি আমাব হইবে, ইহা কি সম্ভব,? তোমাব পিতা কি আমার হস্তে তোমার ন্যায় অমূল্য কহিনুর সমর্পণ করিবেন?

বিরজা চক্ষেব জল মুছিয়া বলিল, "প্রাণাধিক। কি জাগ্রতে, কি নিদ্রায়, কি স্বপ্নে, তুমিই আমাব আবাধ্য দেবতা, আমি এ জীবনে আর কাহারও হইব না, ইহাতে আমাব মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়।"

অম্বিকাব চক্ষুদ্বয যেন ঈষৎ উজ্জলতব হইল, বলিলেন "বিবজা। তুমি বমণীকুলেব বত্নভূষণ, প্রণযেব মূর্ত্তিমতী দেবী—বিবজা, প্রাণাধিকে বিবজা—বিবাহেব কথা দূবে থাকুক, তোমাব পিতা হয ত আমাকে নির-পরাধে আমার কার্য্য হইতে অবসৃত কবিবেন। প্রাণাধিকে, তাহা হইলে আমাব দশায় কি হইবে ভাব দেখি? আমি হয়ত উদবপূর্ণ অন্নের জন্য লালায়িত হইব, হয় ত দ্বারে দ্বাবে ভিক্ষা কবিতে বাধ্য হইব।"

বিরজা। কেন তোমাব চাকুরী যাবে?

অম্বিকা। সে অনেক কথা।

অম্বিকাচবণেব চক্ষু ফাটিযা জল পড়িতে লাগিল, প্রেমময়ী বিবজা স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বাবা তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল "তবে কি আমি পিতাকে তোমার নিমিত্ত বলিব?"

অম্বিকা। না বিরজা! একথা তুমি তাঁহাব নিকট প্রকাশ কবিও না। ইহাতে সুফলেব পবিবর্ত্তে কুফল ফলিবে, এই হইবে যে তোমায় মধ্যে মধ্যে দেখিযা যে সুখানুভব কবিতাম, যে অনন্ত আশ্বাসে হৃদয়কে বদ্ধ কবিতাম, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, আমাদের সমস্ত আশা, সমস্ত ভবসা একবারে বিলুপ্ত হইবে।

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ও বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, কাহার

মুখে কথা নাই, কিন্তু উভয়েরই চক্ষু দিয়া নীরবে অশ্রুবারি নিপতিত হইতেছে। এমত সময়ে তথায় সহসা গোপালচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপাল চন্দ্রকে দেখিয়া উভয়ে যে কতদূর ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। উভয়ের তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, পাদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। গোপাল চন্দ্র চক্ষুদ্বয় আরক্তিম করিয়া কহিলেন, "বিরজা এ কি!"

বিরজা নির্ব্বাক নিস্পন্দ।

গোপাল। কোথায় তোমায় রাজরাণী করিতে কৃতসাঙ্কল্প, না তুমি একটা কাঙ্গালের সহিত প্রেমালাপ করিতেছ, তোমারও ধিক্, আর আমার জীবনেও ধিক্; আমার কন্যার যে এরূপ নীচ প্রবৃত্তি হইবে, ইহা স্বপ্নেও জানিতাম না।

কাহারও বাক্‌স্ফূর্ত্তি নাই। উভয়ের চক্ষুই মৃত্তিকা-সংলগ্ন।

গোপাল। অম্বিকে, তোর কি সাহস যে তুই আমার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিস্—তোর আবার বিবাহে সাধ, আপনি খেতে পাস্‌নে স্ত্রীকে খাওয়াবি কি?

অম্বিকা বিনীতভাবে কহিলেন "আপনি অন্যায়—"

গোপাল। রেখে দে তোর অন্যায়, তোর কথা শুন্‌লে আমার হাড় জ্বলে যায়, ফের যদি কথা কবি, তা হলে জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব, পাজি—ছুঁচো।

অম্বিকা কাঁদিতে লাগিলেন।

গোপাল। আজ থেকে তোর চাকরি গেল, কিন্তু তুই একেবারে এ দেশ ছেড়ে যাবি, যদি না যাস, তা হ'লে দেখ্‌বি তোর কি হয়। তোর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে!

অম্বিকা নিস্তব্ধভাবে অশ্রুপূর্ণলোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন। গোপাল বিরজার হস্তধারণ করিয়া সজোরে টানিয়া বলিলেন, "ফের যদি কখন এমন দেখি, তা হ'লে মেরে ফেলব। চল, তোমার বেরুনো বার কর্‌বো, এই বুঝি তোমার নদীতে গা ধুতে আসা?"

গোপাল বিরজাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

অম্বিকা যতক্ষণ বিরজাকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ অনিমেষলোচনে তাহার প্রতি চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ চাহিয়া রহিলেন, ক্রমশঃ বিরজা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তাঁহার হৃদয়ে কে যেন গাঢ় মসি ঢালিয়া দিল। তিনি আকুল নয়নে একাকী নির্জ্জনে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় হইতে দারিদ্রের তামসীমূর্ত্তি অপসৃত হইল, বিরজা যে আর তাঁহার হইবে না তখন ইহাই তাঁহার দুঃখ, এ দুঃখের নিকট সকল দুঃখ পরাস্ত হইল।

অম্বিকাচরণ অনেকক্ষণ তদবস্থভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, আপন ললাটকে শত ধিক্কার দিলেন, পরে চক্ষের জল মুছিয়া বিরস বদনে তথা হইতে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। যেন কত দুর্ব্বল, যেন কত বার দুর্দ্দম পীড়ার অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়াছেন।

শেষের সে দিন।

"Day presses on the heels of day,
And moons increase to their decay,
But you, with thoughtless pride elate,
Unconscious of impending fate,
Commad the pillar'd doom to rise,
When lo ! thy tomd forgotten, lies."—

Francis.

তুমি আমি, ধনী নির্ধন, অন্ধ খঞ্জ, সকলেই এই কর্ম্মভূমি-ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। তবে পৃথক্ এই, কাহার দিন সুখে যাইতেছে, কাহারবা দুঃখে অতিবাহিত হইতেছে। সুরস

ফলমূলাদি ভোজনে, সুমিষ্ট পেযদ্রব্য পানে, দাসদাসীর সেবায় ধনী
দিন সুখে কাটিয়া যাইতেছে; আর সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমে, কা
ভোজনে, কেবলমাত্র অযত্ন লব্ধ স্রোতস্বতী বা কূপ তড়াগাদির জলপা
দীনের দিন কষ্টে কাটিযা যাইতেছে। সুখে হউক, দুঃখে হউক সকলের
দিন এক বা অন্য রকমে কাটিযা যায, কাহারও দিন্ থাকে না। এ
সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইযা তত্ত্ব-জ্ঞানান্ধকারিণী-মাযায বিমুগ্ধ হই
সকলেই সংসার-সুখের অনুসন্ধানে সদাই বিব্রত। ধনীর ধনপিপাস
শান্তি হয না; মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রের ত কথাই নাই। সকলেই আপ
অবস্থার উন্নতি করিতে, পরিবার, আত্মীয, স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, কন
ভাই, ভগ্নীদিগের সুখস্বচ্ছন্দের জন্য মরীচিকামুগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায সাগ্রহমনে
সংসার মরুতে ছুটাছুটী করিতেছে। এই ভাবে যাহাকে দেখি, যে দি
যাই, সংসার বাগুডা-বিজডিত লোক ভিন্ন অন্যকে দেখিতে পাই না
রাজ প্রাসাদে, ধনীর অট্টালিকায, মধ্য বিত্তের ঘরে, নির্ধনের কুটিরে
যেখানে যাই বিষয়কার্য্যের কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা শুনিতে পাই না
বিষয় বৃদ্ধির চেষ্টা ভিন্ন অন্য চেষ্টায কাহাকেও বড় দেখিতে পাই না। রাজ
আপন প্রাসাদ শিখরে রত্নাসনে বসিযা অনুচর বর্গের সেবাতেও আপ
সংসার চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করেন না; ধনী সংসারিক সকল অভা
বিশূন্য হইযাও ধনচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তায মন দেন না; মধ্যবিত্ত ব্যক্তি
ও পরিমিত ধনার্জ্জনে অকষ্টে পরিবার প্রতিপালনক্ষম হইলেও অধিকতর
অর্থাগমের উপায পরিচিন্তনে বিব্রত, এবং দরিদ্র ত সাংসারিক সকল
অভাব স্কন্ধে করিযা অর্থের জন্য পথে পথে ভ্রমণ করিতে ক্ষান্ত নহে। যাহার
তিন কাল গিয়া এক কাল অবশিষ্ট আছে, শরীর নিস্তেজ, মাংস ললিত
শ্রবণ বধির, দৃষ্টি অন্ধ প্রায, এরূপ স্থবিরও আপন পুত্র পৌত্রাদি কি
উপাযে সুখে সংসার ক্ষেত্রে কালাতিপাত করিবে, ইহার উপায় চি
ব্যস্ত, তখনও বিষয় বাসনা পরিশূন্য হইতে পারে না;
যৌবন বলে বলবান্, উদ্ধত স্বভাব; তাহার যৌবন
শীতল হয় নাই; মানসিক বৃত্তি সমুদয়ের উগ্রতা

ই; তল্লাভার্থে প্রবল পণ করিতেছে; সে এখন প্রমত্ত দুর্দ্ধার যুথপতির বনানুসন্ধানে গমনের ন্যায় সোৎসুক মনে সগর্ব্বে সংসারপথে ধাবিত তছে। বালকও সংসারের অদৃষ্ট, কেবল মাত্র কল্পিত, সুতরাং অতুল ই অপরিমিত সুখ অনুমানে তল্লাভের আশায় তাহার জন্য প্রস্তুত হই- ছে। অন্তঃপুর বিহারিণী অবগুণ্ঠনবতী অঙ্গনাও স্বামী, পুত্রের মঙ্গলে াপনার মঙ্গল জানিয়া অনন্য চিন্তা হইয়া তাহারই অনুধ্যান করিতেছে। ই ঘোর সংসারমায়া সমাচ্ছন্ন জগতে আমি কাহাকেও বিষয় বাসনা বিরত খিতেছি না; এই ঐন্দ্রজালিক সংসারে সকলেই বিষয় বিমুগ্ধ। এই সার রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে আসিয়া সকলেই অভিনেতব্য নাটকের প্রত্যেক অংশ অভিনয় কালে সকলই প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত বিবেচনায় আমি জা, আমার রাজ্য, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, এই হে ভুলিয়া আভিনয়িক সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ জ্ঞান করিয়া হাসিতেছে, াদিতেছে, কখন ক্রতভাব প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু যখন তাহাদিগের জীবনাঙ্কের অভিনয় পরি সমাপ্ত হইবে যখন যবনিকার পতন হইবে, খন কে কথায় থাকিবে? তখন কি আর আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের হিত সাক্ষাৎ থাকিবে?

সকলেইত এক সংসার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই ইষ্ট মন্ত্র যপ করিয়া সিদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কিন্তু মনে কর দেখি, তোমার এক দি আছে, যে দিন তোমাকে মহানিদ্রায় মগ্ন হইবার জন্য অনন্ত শয্যায় শয়ন করিতে হইবে। সে দিন তোমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিবে ইন্দ্রিয়গণ বকল হইয়া পড়িবে, যে দেহের স্বাস্থ্যের জন্য সকাল সকাল আহার করিয়া নিদ্রা সুখ ভোগে শান্তি লাভের চেষ্টা কর—সুনিদ্রায় রজনী াপন জন্য সকাল সকাল শয্যায় গমন কর, যাহার সৌষ্ঠব সাধন জন্য সেবন কর, শুভ্র বস্ত্র পরিধান কর; তোমার সেই দেহ জীর্ণ, হইবে। তোমার সেই রুগ্ন দেহ মল মূত্র নিষ্ঠবনাদিতে কি তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র কন্যাদিগেরও ার প্রাণপক্ষী এই পঞ্চ ভৌতিক পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া

কমল কুমারী।

(উপন্যাস)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০—

শেষ সাক্ষাৎ।

কমল চন্দন কাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত করিয়া যমুনা তীরে মাতার সৎকার করিয়া যথা সময়ে তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করিল। শ্রাদ্ধান্তে কমল মতি মহলে বেগমের নিকট হইতে বিদায় হইতে বাদসাহ ভবনে চলিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, বেগম মনোমত বেশ ভূষায় বিভূষিতা হইয়া আপন দাসী মণ্ডলী পরিবৃতা হইয়া বসিয়া আছেন, এমত সময় কমল তথায় উপস্থিত হইল। কমলের মাতৃবিয়োগ সংবাদ বেগম পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, সুতরাং কমলের দুঃখে আপন সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া সকল দাসী [illegible]ঠিয়া গেল, তখন সেই বিশাল বিস্তৃত কক্ষমধ্যে বেগম ও কমল ব্যতীত অপর কেহই নাই—তখন কমল করপুটে কহিল, "বেগম। আপনার আমার প্রতি অসীম দয়া ও অনুগ্রহের জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ।"

বেগম। সে কথা কেন উঠিতেছে কমল?

কমল। আবশ্যক আছে।

বেগম। কি আবশ্যক?

কমল। আমায় বিদায় দিতে হইবে।

বেগম। কত দিনের জন্য।

কমল। চিরদিনের তরে।

বেগম। কেন কমল ?

কমল। আর আমি কাহার জন্য এ সংসারে থাকিব ?

বেগম। কি করিবে ?

কমল। সন্ন্যাসিনী হইব।

বেগম। এ কচি বয়সে কি কেহ সন্ন্যাসিনী হয়।

কমল। আমার মত যাহার দশা, সেই হয়।

বেগম। না কমল, আমি তোমায় ছাড়িব না, তোমায় ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।

কমল। আমাকে ছাড়িতেই হইবে, আমার প্রতি এ অনুগ্রহ দেখাইতেই হইবে।

বেগম কমলকে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি তাহাকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহার কমলকে ছাড়িবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, কিন্তু কমল সন্ন্যাসিনী হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অতএব কি করেন, অগত্যা স্বীকৃতা হইলেন। কমলকে একটী বহু মূল্য মুক্তা মালা উপহার দিলেন, কিন্তু কমল তাহা না লইয়া বেগমকে কহিল, "ইহা লইয়া কি করিব, আমার আর মুক্তার মালায় প্রয়োজন কি ?" তখন বেগম আপন অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া কমলের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এইটী রাখ, ইহার মূল্য অতি সামান্য,—মূল্যবান্ বস্তু বলিয়া দিলাম না, আবশ্যকীয় বস্তু বলিয়া দিলাম। যদি " আমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হয়—যদি কখন যবনাধিকারের মধ্যে কোন বিপদে পড়, তাহা হইলে এই অঙ্গুরী প্রদর্শন করিও, তুমি সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিবে।"

কমল বিনত মস্তকে তাহা চুম্বন করিয়া গ্রহণ করিল, কমল মনে মনে জানিত, তাহার ইহাতে কোন আবশ্যক নাই, তথাপি বেগমকে সন্তুষ্ট করিতে গ্রহণ করিল।

এইরূপ কথা বার্ত্তায় রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইল, তখন কমল কহিল, "আসি।"

বেগম। এখনি !

কমল। আর নয় কল্য প্রত্যূষে আমায় আগ্রা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বেগম মতি মহলের দ্বারদেশে কমলকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন, তিনি যে কমলকে বিদায় দিতে বড়ই শোক পাইলেন, তাহা বলা বাহুল্য, তাঁহার হৃদয় মর্ম্মাহত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাণের কার্য্য।

কমল বেগম মহল হইতে বাহিরে আসিয়াছে মাত্র, এমত সময়ে শুনিল যে বাদসাহ আকবর সাহেব মৃত্যু হইয়াছে,—সহসা নিশীথ সময়ে এরূপ বাদসাহের মৃত্যু সংবাদে আগ্রার অধিবাসীগণ যে কিরূপ শোকে বিহ্বল হইল, তাহা বলা যায় না। কমল দেখিল প্রত্যেক লোক প্রত্যেক দ্বারী প্রত্যেক প্রহরী বিষণ্ণ। পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে খসরু বাদসাহ হইতে সচেষ্ট, আজি শুনিল যে সেলিম খসরুকে বন্দী করিতে স্থির সঙ্কল্প। খসরু আপন শয়ন কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেই বন্দী হইবে। কমল মনে মনে বলিল "হায় খসরু তোমার হৃদয়ে এ কুপ্রবৃত্তি কেন? পিতা থাকিতে সিংহাসনাধিকার বাসনা কেন?"

কমলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, যিনি এক দিন তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আজি তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে কমল উদ্যত। কমল ধীরে ধীরে ফিরিল, যে কক্ষে সাহাজাদা খসরু নিদ্রা যাইতে ছিলেন, সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। খসরু তখনও সে ভীষণ বারতা অবগত নহেন। তিনি অকাতরে কুসুম-সন্নিভ শয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন।

কমল দেখিল কে ধীরে ধীরে শয্যা সন্নিকটে গেল, মৃদু স্বরে সেই নিদ্রিত খসরুকে এই সকল ঘটনার কথা কাণে কাণে কহিল। খসরু সুপ্তোত্থিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন। লোকটী বিদ্যুৎ বেগে কোথায় চলিয়া গেল।

তখন খসরু একবার এদিক ও দিক দেখিয়া দ্রুতবেগে সেই অন্ধকার পথ

দিয়া চলিলেন। মনে মনে বলিতে ছিলেন, "ইহা কি সম্ভব? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইবে? আজ কাল আমার অদৃষ্টে তাহাই হইতেছে বটে, নতুবা কেন কনক-কমল হারাইলাম। যাহা সংসারে নাই—স্বর্গে নাই, আমি তেমন নিধি কেন হারাইলাম।"

কমলের কাণে এ কথা গুলি গেল, কমলের চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইল।

খসরু আবার বলিলেন, "আমি কি স্বপ্নে বিশ্বাস করিতেছি, ইহা কি সম্ভব যে বাদসাহ নাই? কি! আমি বন্দী হইব?

সাহজাদা খসরু আবার দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০—

নিষ্ফল আশা।

সাহাজাদা সেই অন্ধকার দিয়া দ্রুতবেগে যাইতেছেন এমন সময়ে কমল তাঁহার হস্ত ধরিল।

খসরু সবলে হস্তমোচন করিয়া কহিল "পথ ছাড়।"

কমল। সাহাজাদা দাসীর অনুরোধ রাখুন এখন বাহিরে যাইবেন না। সেলিম আপনাকে কারারুদ্ধ করিবেন।

খসরু উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "সে দেখা যাইবে, আমায় যাইতে দেও।"

কমল সেই অন্ধকারে খসরুর পদদ্বয় জড়াইয়া বলিল "আমি যাইতে দিব না, আমি যাইতে দিতে পারিব না।"

খসরু তখন প্রায় জ্ঞান শূন্য, সজোরে পদমুক্ত করিলেন, কমলা সে বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, পতিত হইল, মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিল। কিন্তু কমল তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না, পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আবার খসরুকে ধরিল।

খসরু। আবার বিরক্ত করিতেছ।

কমল। বিরক্ত করিয়া থাকি ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়িব না, আপনি এখন বাহিরে যাইবেন না।

খসরু আবার সজোরে কমলকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "তুমি কে? আমি নিষেধ করিতেছি যে আমায় বিরক্ত করিও না।"

কমল উঠিতে না উঠিতে খসরু কোথায় চলিয়া গেলেন তাহা সে দেখিতে পাইল না। ক্ষণেক পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া খসরুর অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। সেই নৈশান্ধকারে যে খসরু কোথায় গেলেন, কমল তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না।

এদিকে খসরু যেমন গৃহের বাহিরে আসিয়াছেন, অমনি দুই জন সৈনিক আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, বলিল "সাহাজাদা সেলিমের হুকুমে আপনাকে ধৃত করিলাম।"

খসরু আরক্তিম চক্ষে কহিলেন "কি আমাকে ধৃত করিলে?'

সৈনিকদ্বয় অবনতশিরে বলিল "হাঁ"

খসরু। কি অপরাধে বন্দী হইলাম?

সৈনিক। সাহাজাদা, সে কথার উত্তর আমরা দিতে পারিব না।

খসরু। বাদসাহ আকবর সাহ কি আর নাই।

সৈনিকদ্বয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "না।"

এতক্ষণে খসরুর জ্ঞান হইল, তিনি বুঝিলেন যে রমণীর বাক্য অবহেলা করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, বলিলেন "এ পথে কেহ গিয়াছে জান?"

এক জন উত্তর করিল "এপথে কাহাকেও যাইতে দিবার আদেশ ছিল না, কেবল সাহাজাদা সেলিমের বাঁদী ইঙ্গিত সূচক অঙ্গুরী প্রদর্শন করায় যাইতে পাইয়াছে।"

খসরু। কোন্ বাঁদী।

উত্তর। তাহার কি একটা হিন্দু নাম আছে?

খসরু কয়েকবার মনে মনে হিন্দুনামের কথা ভাবিলেন, কিন্তু কাহারও নাম তাঁহার স্মরণ হইল না, তখন বলিলেন "কোথায় লইয়া যাইবে চল।"

সৈনিকেরা তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

কতকদূর যাইয়া খসরু জিজ্ঞাসিলেন "মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি কি?

জনৈক সৈনিক কহিল "সাহাজাদা ক্ষমা করিবেন, আমাদের প্রতি সে আদেশ নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—০%০—

বন্দী।

আজি বাদসাহ আকবর সাহের পৌত্র প্রতাপান্বিত মানসিংহের ভাগিনেয় সাহাজাদা খসরু বন্দী। মানসিংহের বহুদিবসাবধি ইচ্ছা ছিল যে আকবর সাহের মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্রকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। আপনার ভাগিনেয় দিল্লীশ্বর হইবেন ইহা সুখের বিষয় বটে, কিন্তু পুত্রের পক্ষে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা কতদূর সঙ্গত তাহা সহজেই অনুমেয়। মানসিংহের উত্তেজনায় খসরুর যে সিংহাসনাধিকারের সাধ ও আশা বলবতী হইয়াছিল তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখনও খসরু চিন্তা মগ্ন— কোথায় বাদসাহ হইবেন, না বন্দী হইলেন, এ অবস্থায় প্রগাঢ় চিন্তা কি অসম্ভব? কিন্তু পাঠক তুমি কি ভাবিতেছ—আর সাহাজাদা খসরু কি ভাবিতেছেন দেখ। খসরু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এই পথে হিন্দু বাঁদী গিয়াছে,—তবে কি কমল বাঁদী হইয়াছে? নিশ্চয়ই সে কমল, আমারই কমল, কমল না হইলে আর কে আমার জন্য অত করিবে? কমল প্রাণাধিক কমল, আমি হাতে নিধি পাইয়া হারাইলাম। প্রাণেশ্বরী আর কি তোমায় দেখিতে পাইব? হয় ত এই আমার সমাধি স্থান হইবে, তাহা হইলে তোমার সে মুখশশী ত আর দেখিতে পাইব না,'

তোমার সেই অমৃত শ্রাবী বাক্য ত আর আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে না।"

খসরু অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। বিধাতঃ! তোমার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে প্রণয়ের তুল্য আর মধুর কিছুই নাই—কিন্তু তাহাতে নিষ্ঠুরতা কেন? প্রেমিকের পরিতৃপ্তি নাই কেন?

এমত সময়ে সহসা সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠের দ্বারোদ্ঘাটন হইল, একটী বৃদ্ধ দীপ হস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। খসরু চমকিয়া বলিলেন, "আমীর খাঁ।"

আমীর খাঁ সসম্ভ্রমে কহিল, "জনাব।"

খসরু। তুমি এখানে?

আমীর। আপনাকে মুক্ত করিতে।

খসরু। এত দিন কোথায় ছিলে?

আমীর। কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলাম।

খসরু। আমি বন্দী হইয়াছি তোমায় এ কথা কে বলিল?

আমীর। মহারাজ মানসিংহ, তিনিই আমাকে এখানে কৌশলক্রমে পাঠাইয়াছেন, আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিবার সময় নাই—আপনি শীঘ্র প্রস্থান করুন। প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে একটী লোককে দেখিতে পাইবেন, সে আপনাকে অশ্ব দিবে, লোক দিবে, একেবারে জয়পুর পলায়ন করুন। যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, আপনাকে বাদসাহ করিতে মহারাজ মানসিংহ মহাব্যস্ত হইয়াছেন। আপনি তৎপর পলায়ন করুন, নতুবা সমস্তই বৃথা হইবে এবং আপনার ও মহা বিপদ ঘটিবে।

খসরু। একটী কথা।

আমীর। আজ্ঞা করুন।

খসরু। কমল কোথায়?

আমীর। সে কথা পরে বলিব।

খসরু আপন গলদেশ হইতে বহুমূল্যের হীরক হার খুলিয়া আমীরখাঁকে প্রদান করিয়া বলিলেন "এখনি বল।"

আমীর খাঁ কহিলেন "সাহাজাদা, আমি এ সামান্য কার্য্যের জন্য হীরক হার পাইবার অযোগ্য।"

খসরু। আমীর! আমি বন্দী বলিয়া কি একেবারে ফকির হইয়াছি যে আমার প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণেও কুণ্ঠিত হইতেছ?

আমীর। ঈশ্বর সাক্ষী যে আমি সে উদ্দেশ্যে বলি নাই—হীরক হার আমি মস্তকে ধারণ করিলাম, অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

খসরু। আমীর বল আমার কমল কোথায়, আমি কমলের জন্য অধীর হইয়াছি।

আমীর কহিলেন "আমি কমলকে লুৎফল বেগমের বাঁদী করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম তাহার মাতার মৃত্যু হওয়ায় সে বিদায় লইয়াছে।

খসরু। কবে?

আমীর। এই বারে।

খসরু। কোথায় আছে?

আমীর। এখন কোথায় আছে তাহা জানি না, আপনি যেখানে শবসন্ধান শিখিতেন তাহারই নিকটস্থ একটী সামান্য গৃহে বাসা ছিল।

খসরু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমীর কহিলেন "আর কেন বিলম্ব করেন।"

খসরু নিস্তব্ধভাবে প্রস্থান করিলেন।

হায় মানসিংহ! তুমি যাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন দিবে বলিয়া এত করিতেছ, সে একবারও তাহা ভাবিতেছে না, সে বাঁদীর কথা ভাবিতেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

সকলি ফুরাইল।

খসরু কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, জয়পুর গেলেন না, আগ্রার উত্তর প্রান্তরে কমলের অনুসন্ধানে চলিলেন, ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া উঠিল, পূর্ব্ব গগন হইতে শুক্রতারা বিশ্ব সংসারকে সূর্য্যদেবের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া আপনি নিরুদ্দেশ হইলেন। রজনীর অন্ধকার অল্প পরিষ্কার

হইয়া আসিল, এমত সময়ে সাহাজাদা খসরু কমলের দ্বার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তখন কমল গেরুয়া বসন পরিয়া কমণ্ডলু হস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে। কমল খসরুকে দ্বার দেশে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

খসরু কহিলেন "কমল একি ?"

কমল। কুমার! সাহাজাদা! এ পৃথিবী আমার একমাত্র সম্বল ছিলেন মা, তিনিও এ অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তবে আর কাহার আশায় এ পৃথিবীতে থাকিব? তাই আমি সন্ন্যাসিনী হইয়াছি। ধর্ম্ম চিন্তায় এই অসার জীবনের শেষ কাটাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, আমাদিগকে অনাহার হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, আপনি সাহাজাদা, বাদসাহ আমার কি সাধ্য যে আপনার সেই অসীম উপকারের প্রত্যুপকার করি। তবে—

খসরু কমলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"কমল, প্রাণাধিক কমল, [illegible] ...ার সীমা নাই, কিন্তু আমি তোমায়

[illegible] ছ, এখনও রক্ত

কথার আবশ্যকই বা কি? মহারাজ মানসিংহ আমাকে বাদসাহ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারই অনুকম্পায় আমি কারামুক্ত হইয়াছি, কিন্তু একটী কথা, কমল বল যে তুমি আমায় বিবাহ করিবে কি না। যদি বাদসা হই উত্তম, নতুবা আমার ধনের অপ্রতুল নাই, আমার সুদূরস্থ কোন নির্জ্জন স্থানে বাদসাহের মত সুখে থাকিতে পারিব। তোমার উত্তরের উপর আমার অদৃষ্ট আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ভর করিতেছে। তোমাকে হারাইলে আমার ধন, সিংহাসন সকলি বৃথা। বল কমল, বল—বল।"

তখন কমল গম্ভীর অথচ ধীর ভাবে কহিল "বালিকা বয়স হইতে অনেক কষ্ট পাইয়াছি, ক্লেশ আমার অঙ্গের আভরণ, কুমার ধন মানে সুখী হইব।—তোমায় পাইব ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিক প্রলোভন ইহ জগতে আর নাই, কিন্তু কুমার আমার অদৃষ্টে দুঃখ, তুমি কি করিবে ভাই। মা মৃত্যুকালে আমাকে বিধর্ম্মী হইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তুমি কি আমার মাকে অনাহারে রাখিতে বল? তোমাকে বিবাহ করিলে মাকে আমার জল-গণ্ডূষটুকু দিবার অধি[illegible]
আমার মাকে অনাহারে রাখি[illegible]

খসরু কমলের [illegible]
বসিলেন। জগৎ[illegible]
আজি এক[illegible]

আর দেখা গেল না তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "সব ফুরাইল,—এতদিনে সকলি ফুরাইল!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

সকলের শেষ।

খসরু বিমর্ষভাবে কতকদূর যাইয়া এক স্থানে উপবেশন করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিলেন, মনে মনে বলিলেন "আর কেন, এ পাপ পৃথিবীতে থাকিবার আর স্পৃহা কেন? ধন মান যশ গৌরবে আর হতভাগ্য খসরুর বিন্দুমাত্র সুখ নাই। আর কাহার আশায় এ পৃথিবীতে থাকিব আর কাহার সুখের জন্য পিতৃপদে ঋণী হইব" খসরু আর কোন কহিয়া চক্ষু মুছিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আর জয়পুরে যাইয়া নূতন বাদসাহের নিকট আত্মসমর্পন করিলেন, খ ছিলেন, তাঁহাকে প্রকৃতই গোয়ালিয়রের কারাগারে বন্দী।

এদিকে কমল আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ত পরিত্যাগ করিলেন, কমল-সখা কালে জটাজুটধারিণী সন্ন হরিদ্বার, গয়া, কাশী, প্রভৃ ... স্থানে কমল ভ্রমণ করি লাগিলেন।

এক দিন সন্ধ্যাকালে গোয়ালিয়রের কারাগার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দ্বারী কহিল "মা—আপ

দ্বারীদিগের নিকট সন্ন্যাসিনী পরিচিতা, সন্ন কারাগার দেখিব।'

দ্বারী। কারাগারে ত কাহারও প্রবেশ

সন্ন্যাসিনী। যাহার প্রবেশে তোম তাহারই প্রবেশ অনুমতি না থাকিতে

দ্বারী। কি করিব মা, বাদসাহে

তখন সন্ন্যাসিনী আপন অঙ্গুলী

সেই সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া অবনত শিরে কহিল "আপনার প্রবেশে কোন আপত্তি নাই।"

সন্ন্যাসিনী কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে এমত সময়ে কারাগারের একটী অন্ধকার গৃহে একটী জীর্ণ শীর্ণ ব্যক্তিকে লইয়া যাওয়া হইল। পাঠক ইনিই আপনাদের সেই সাহাজাদা খসরু। বহুদিন কারাবাসে ও অনিয়মিত আহার ও অনাহারে তাঁহার সে দেহ, সে লাবণ্য কিছুই নাই। যে গৃহ মধ্যে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল তন্মধ্যে একটী সামান্য দীপ ধিকি ধিকি জ্বলিতে ছিল। সম্মুখে দুই জন কৃতান্ত সম লোক অসি হস্তে দণ্ডায়মান। হায় খসরু তোমারও জীবনদীপ কি ঐরূপ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে?

খসরু কহিলেন "কি বলিবে বল।"

বাদসাহের আদেশ আপনার মুণ্ডচ্ছেদন করা।

...শুষ্ক বদনে একটু মৃদু হাসি প্রতিভাত হইল, বলিলেন ... আজ্ঞা কেন পূর্ব্বে প্রদত্ত হয় নাই?"

...ন উর্দ্ধে উঠিল দেখিয়া খসরু চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, এমত ...বেগে তথায় আসিয়া সেই অসিমুখে আপন বক্ষ পাতিয়া ... ধরাতল প্লাবিত হইল।

...ন্মিলন করিয়া আহতাকে রু... ধারায় প্লাবিতা দেখিয়া ...আপনি কে?

...রিণী সন্ন্যাসিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কুমার আজ...

...ন চীৎকার করিয়া উঠিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু ...র উপরে নিপতিত হইল, সেই বিস্ময় সূচক ... কথাটী মাত্র উচ্চারিত হইল।

ঐ দেখ অপ্সরাগণ তোমায় আবাহন ... যাও।

... মর্ত্তে শোভা পায় না, স্বর্গে যাও।

...নীয় অক্ষয় প্রেমের ফল!

শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নানক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মুসলমানগণ ভারতবর্ষীয় পুনর্জন্মবাদ বিরুদ্ধে বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করিয়া ইহ জগৎহইতে অন্তর্হিত হন, পরজন্মে তাঁহার আর পূর্ব্ব স্মৃতি থাকে না, সুতরাং তাহা স্মরণ করিয়া শাস্তি ভয়ে সে ব্যক্তি পবিত্র কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় না, কাজেই এরূপ পুনর্জন্মে লোকের পাপ ক্রমশঃ ক্ষালিত হইতে পারে না। আমরা এস্থলে এসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখি না, তবে এই মাত্র বলি যে বিদ্বেষ পরিশূন্য পণ্ডিতগণ খৃষ্টান বা মুসলমানগণের মানব পিতা আদমের পাপ-জনিত মনুষ্যমাত্রই পাপে লিপ্ত হইবেন, এরূপ মত অপেক্ষা ভারতীয় মত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ একথা স্বীকার করিবেন। হিন্দুমতে পাপী ব্যক্তির পাপ-যত দিন পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ রূপে প্রক্ষালিত হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে; পাপক্ষালিত হইয়া গেলেই তিনি অক্ষয় স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিবার অধিকারী।

অধ্যাপক উইলসন্ এবং মিল সাহেব বলেন যে, নানকের মত বৈদান্তিক মতের ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে (২৪)। কিন্তু তাহাতে আমরা বলি কোন্‌সর্ব্বসম্মত মতের প্রতি বিশেষ আস্থা প্রকাশ না করিয়া কোন সম্পূর্ণ নূতন মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে বা মনুষ্যের পারলৌকিক আশার বিষয়ে সকলের মনে ধারণা করাইয়া দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। ইহ জগতে মনুষ্য নানা-বিধ সৎকর্ম্ম করিলে পরিশেষে পরলোকে সেই মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হন, এই মত প্রচার না করিলে লোকের মনোরঞ্জন হয় কই? সকল ধর্ম্ম-প্রচারকেই প্রায় এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, প্রায় সকলেই বলিয়াছেন যে, এই নশ্বর পরিদৃশ্যমান মনুষ্যদেহ, অবিনশ্বর অদৃশ্য দেহ প্রাপ্তির জন্য ইহ জগতেই নানাবিধ কার্য্য করে। রাজনীতিজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ মিল্‌টনও এই কথা

---

(২৪) *Asiatic Researches* Vol. XVM· P. 238, and James Mills' "*History of India,*" Vol X11 P. 101—102.

বলিয়াছেন (২৫), কিন্তু তিনি কবি, সুতরাং তাঁহার বাক্য যদি কবিকল্পনা বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রধান ও প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারক ধর্ম্ম-সন্ন্যাসী সেণ্ট পল্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "এই দেহ নশ্বর হইয়া রোপিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ক্রমশঃ অবিনশ্বর অদৃশ্য দেহে সমুত্থিত হইবে (২৬)।" যাহা হউক নানক বৈদান্তিক মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার প্রতি কিছু মাত্র দোষারোপ করিতে পারি না।

নানক হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই সমান চক্ষে দর্শন করিতেন; তাঁহার মতে মহম্মদ বা হিন্দুগণের অবতার সকল প্রবঞ্চক (imposter) নহেন; তাঁহারা বাস্তবিকই ঈশ্বর-প্রেরিত ও মনুষ্য কুলকে উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্তই সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এতাধিক অবতার জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণকে সহস্র সহস্র উপদেশ প্রদান করিয়া গেলেও মনুষ্য-সমাজে এখনও পাপের কিছুমাত্র শমতা হয় নাই, ইহা তাঁহার মতে অতীব দুঃখের বিষয়। তাই নানক পুনরায় উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কখনই আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া অভিহিত করেন নাই; নানক বলিতেন "তিনি ঈশ্বরের ভক্ত মাত্র; সত্যই তাঁহার এক মাত্র অস্ত্র।" তিনি সকল পদার্থই ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেন এবং সুখ পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আপনার আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা লাভ করা কর্ত্তব্য ইহাই উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি আরও বলিতেন, "পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণের মতানুযায়ী কার্য্য করিবার সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—এক্ষণে নূতন কাল উপস্থিত—সুতরাং নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।" এই সকল বলিয়া তিনি আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কখন আপনাকে অবতার বলেন নাই। তিনি সাধারণ মনুষ্য সমাজে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় বসবাস করিতেন; তাঁহার কোনপ্রকার অলৌকিক কার্য্য ছিল না। তিনি সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতেন এবং সকলকে

(২৫) " Body working up to spirit. " *Paradise Lost Ch.*, V.

(২৬) " It is sown a natural body and is raised a spiritual body. " Corinthian's XV. 44.

পবিত্র ভাবে বাস করিতে পরামর্শ দিতেন (২৭)। নানকের রচিত গ্রন্থ নানাবিধ সুন্দর উপদেশে পূর্ণ হইলেও তিনি তাহা কখন মহম্মদের ন্যায় ঈশ্বর-প্রণীত বলেন নাই এবং তিনি কখন অলৌকিক কার্য্য (miracle) দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই। অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ তাঁহার মনে অতিশয় নিষিদ্ধ। তিনি কেবল বলিতেন, "ঈশ্বরের বাক্যরূপ অস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র গ্রহণীয় নহে; কোন গুরুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই (২৮)।" তাঁহার মতে সন্ন্যাসাশ্রম অপ্রয়োজনীয়; ঈশ্বরের নিকট ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী ও পবিত্র গৃহস্থ দুই সমান। নানক বল্লভস্বামীর ন্যায় বিবাহিত গুরুর প্রতি অধিকতর আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার মতে সকলেই আপনাপন ইচ্ছানুসারে এ বিষয়ে কার্য্য করিতে পারেন (২৯)। হিন্দু ও মুসলমানগণের খাদ্য সম্বন্ধে প্রধান প্রভেদ একের গোমাংস, ও অপরের শূকরমাংস ভক্ষণ অতি নিষিদ্ধ। নানক তদীয় শিষ্যগণকে এই উভয় মাংস গ্রহণেই নিষেধ করিয়া ইহাদের সামঞ্জস্য বিধান করেন (৩০)। মোহমন কালী বলেন নানক কেবল মদ্য ও বরাহমাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কোন মাংসই ভক্ষণ করিতেন না (৩১)। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে অনেক প্রতিবাদী মত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ওয়ার্ড সাহেব বলেন "যাঁহারা মাংস ভক্ষণ করিতেন নানক তাঁহাদেরই পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনার্থে বলিতেন, লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতৃদুগ্ধে প্রতিপালিত হইয়া থাকে; তাহা মাংস ব্যতীত আর কিছুই নহে (৩২)।" যাহা হউক এসম্বন্ধে নানা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তবে দেখিতে পাওয়া যায় অধুনাতন নানক শিষ্যগণের মাংসের প্রতি তত বিদ্বেষভাব নাই।

(২৭) Compare Mohsun Fanees *Dabistan* Vol II. P.249, 250, 253, and *As. Res.* XVII. 234.

(২৮) Vide Malcolm's "*Sketch of the Sikhs*" P. P 20, 21, 165

(২৯) আদিগ্রন্থ আশারাগিণী এবং রামকেলী রাগিণী অধ্যায়।

(৩০) আদি গ্রন্থ মাঝ অধ্যায়।

(৩১) *Dabistan* Vol II. 248

(৩২) Ward's "*On the Hindoos*". Vol. III P. 466.

এবম্বিধ নানা উপায়ে নানক তদীয় শিষ্যগণকে নানাবিধ ভ্রম হইতে রক্ষা করিতেন, এবং আপনার আভ্যন্তরিক পবিত্রতা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য তাহা সকলের মনে বিশেষ করিয়া গাঁথিয়া দিলেন। তিনি তদীয় শিষ্যগণকে কোন নূতন বিধি ব্যবস্থার অধীন করিয়া দিলেন না, কেননা দেশীয় রীতি-নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তিনি কখনই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। তিনি শিষ্যগণকে অন্য কোন নিয়মের অধীন না করিয়া, তাঁহা-দিগকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে দিলেন; কিন্তু তাঁহার সময়ে সেই উন্নতি কেবল ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে। তিনি শিষ্য-গণকে সামাজিক উন্নয়ন বা রাজনৈতিক উন্নতির কোন পথ খুলিয়া দেন নাই, কেবল তাঁহাদিগকে সময়-স্রোতের অধীন করিয়া দিলেন। যাহাতে তাঁহার শিষ্যগণ কোনরূপ সঙ্কীর্ণ দলে পরিণত না হয় ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা। তিনি সমুদায়ই উদারভাবে পরিদর্শন করিতেন। এই জন্যই নানক মৃত্যুকালে তদীয় পুত্রকে উত্তরাধিকারী নির্ণয় না করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারি নির্ণয় সম্বন্ধে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে তদীয় আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে তিনি তাঁহার শিষ্যগণের গুণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সশিষ্য নানক নগরমধ্যে বেড়াইতেছেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে তাঁহারা একটি মৃত দেহ দেখিতে পাইলেন। নানক ত্বরিত গমনে তাহার নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি আমাকে অতিশয় বিশ্বাস করেন, তিনি এই সম্মুখবর্ত্তী খাদ্য গ্রহণ করুন।" এই কথায় সকলেই স্তম্ভিত হইল—সকলেই অচলভাবে দণ্ডায়মান হইল, এমন সময়ে লেহনা নামক তদীয় বিশ্বস্ত অনুচর যিনি নানকের সহিত পঞ্চদশ বৎসর ব্যাপিয়া দেশ পর্য্যটনে গমন করিয়া ছিলেন—অগ্রসর হইলেন—সেই শবের নিকটস্থ হইয়া তাহার আবরণ-বস্ত্র উন্মোচন করিলেন—এবং আহারের নিমিত্ত তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় স্পর্শমাত্র মৃতদেহ অন্তর্হিত হইল, এবং সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন মৃতদেহের পরিবর্ত্তে নানকই সেই স্থানে শয়ান রহিয়াছে (৩৩)

(৩৩) Cunningham's *Sketch of the Shiks.*

সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলেন। এমন সময় নানক সুপ্তোত্থিতবৎ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং লেহনাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "তুমিই আমার অনুরূপ; আমার আত্মা চিরকাল তোমার অন্তরে বিদ্যমান থাকিবে (৩৪)।" সেই ক্ষণ হইতেই লেহনার নাম পরিবর্ত্তিত হইল।— সেই দণ্ডেই তাঁহার "অঙ্গ-ই খুদ" বা অঙ্গদ অর্থাৎ "আপনার অঙ্গ" এই নাম-করণ হইল (৩৫)। এই গল্পটী কত দূর সত্য তাহা জানিবার তত প্রয়োজন নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী প্রত্যেক শিখ-গুরুর আত্মায় যে নানকের আত্মা আবির্ভূত হইয়াছিল, একথায় শিখগণ অত্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী শিখগুরু হরগোবিন্দ আপনাকে নানক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। (৩৬) যাহা হউক লেহনাকে ভবিষ্যৎ গুরু নির্ণয় করিবার পর নানকের অন্তিম দশা উপস্থিত হইল। তিনি ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়ঃ-ক্রম কালে ইরাবতী নদী তীরবর্ত্তী কর্ত্তারপুর গ্রামে বহু শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। কথিত আছে, নানক নানাদেশ পর্য্যটনের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সাত বৎসর, পাঁচ মাস, সাত দিন মাত্র আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তী, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ লইয়া তদীয় হিন্দু ও মুসলমান শিষ্য মধ্যে তুমুল বিবাদ হয়। হিন্দু শিষ্যগণ তাঁহার দেহ দাহ করিবার জন্য উদ্যত ও যবন শিষ্যগণ তাহা সমাধি করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিল। যখন উভয় পক্ষে এইরূপ বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে এমন সময়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তি সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া সকলকে নিরস্ত করিলেন এবং অগ্রে বিবাদীভূত মৃত দেহটি দর্শন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথানুসারে মৃতদেহের আবরণটি উন্মোচিত হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শব তথায় নাই, সেই আবরণ বস্ত্রখানি মাত্র পতিত রহিয়াছে। মধ্যস্থ ব্যক্তি সেই বস্ত্রখানি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দাহ করিবার নিমিত্ত এক খণ্ড হিন্দু ও অপর খণ্ড সমাধির নিমিত্ত যবন শিষ্যগণকে অর্পণ করিয়া অন্তর্হিত

(৩৪) Dr Macgregor's *History of the Sikhs* Vol. I. P 25.

(৩৫) Compare Malcolm's *Sketch of the Sikhs* P 24 Note.

(৩৬) *Dabistan* Vol. II P. 253–281

হইলেন (৩৭) এই কর্ত্তাবিপুর বা ধারকীর্ত্তি নগরে অদ্যাপি নানকের সমাজ গৃহ বর্ত্তমান আছে এবং তথায় বর্ষে বর্ষে একটি মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় বহুজনের সমাগম হয়।

নানকের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীচাঁদ ও কনিষ্ঠ লক্ষ্মীদাস। কিন্তু কেহই নানকের উত্তরাধিকারী হইলেন না। জ্যেষ্ঠ শ্রীচাঁদ বাল্যকাল হইতেই সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী; নানকের মৃত্যুর পর তিনি "উদাসী" নামক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এই সম্প্রদায় কেবল পারলৌকিক কার্য্যের জন্য তৎপর। ইহারা এক্ষণে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্প্রদায় শিখগণের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে এবং শিখগণের অনেক আচার ব্যবহারে বিশেষ আস্থা প্রকাশ ও নানকের আদিগ্রন্থ বিশেষ মান্য করিয়া থাকে (৩৮) শিখেরাও নানকের পুত্রগণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে নানকপুত্র, কখন বা সাহেব জাদা অর্থাৎ গুরুপুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এই সম্প্রদায় অনেক দিন পর্য্যন্ত শিখগণের অংশস্বরূপ বলিয়া কথিত হইত, কিন্তু তৃতীয় গুরু অমরদাস ইহাদিগকে শিখ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া দেন (৩৯)।

সকল জাতিই সমান হইয়া যায় ইহা নানকের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে একাল পর্য্যন্ত শিখগণ নানা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রায় সকেলরই বিশ্বাস একপ্রকার। তবে নানা বিভিন্ন জাতি হইতে লোকে শিখদলে প্রবিষ্ট হইবার জন্য এইরূপ পৃথকত্ব হইয়াছে। এক্ষণে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম যথাক্রমে প্রদান করা যাইতেছে;—

১ম। উদাসী-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় নানকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে এই সম্প্রদায় শিখগণেরই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। গুরু অমর দাসের সময়ে ইহারা পৃথক হয়।

(৩৭) রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত "পঞ্জাবরাজ্যের ইতিহাস" বৃত্তখণ্ড ৬৬পৃষ্ঠা।

(৩৮) *Asiatic Researches* Vol XVII. P. 232.

(৩৯) Malcolm's *Sketch of the Sikhs* P. 27 and Cuningham's *History of the Sikhs* P. 47.

২য়। বেদী-সম্প্রদায়। ইহা নানকের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীদাস কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

৩য়। তিহন সম্প্রদায়। ইহা দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ কর্ত্তৃক স্থাপিত।

৪র্থ। ভুলা সম্প্রদায়। ইহা তৃতীয় গুরু অমর দাস দ্বারা সংস্থাপিত।

৫ম। সোধি সম্প্রদায়। ইহা চতুর্থ গুরু রামদাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু বেদী, তিহন, ভুলা ও সোধি সম্প্রদায় ইহারা সকলেই প্রকৃত শিখ-ধর্ম্মাবলম্বী, তবে উপযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন গুরু যে যে ক্ষত্রিয়বংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সেই সেই বংশের নামানুসারে যে কিছু সামান্য পার্থক্য হইয়াছে মাত্র।

৬ষ্ঠ। রামরায়ী-সম্প্রদায়। গুরু তেগ বাহাদুরের সময় যে সকল লোক তেগ বাহাদুরকে পরিত্যাগ করিয়া রাম রায়ের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহারাই রামরায়ী-সম্প্রদায় বলিয়া উক্ত হয়। হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি ইহাদের প্রাদুর্ভাব পরিদৃষ্ট হয়।

৭ম। বন্দাপন্থী। গুরুগোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর বন্দানামক যে বৈরগী শিখগণের নেতা হন, তাঁহারাই শিষ্যগণ এই দলের অন্তভূ ত।

৮ম। মসন্দী সম্প্রদায়। মসন্দ, ক্ষত্রিয়জাতির একটি অংশবিশেষের নাম। কেহ কেহ বলেন ইহাঁরা যুদ্ধের সময় গুরুগোবিন্দের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অন্য কেহ বলেন, ইহারা গুরুর পুত্রগণকে পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র হইয়াছে; কিন্তু সাধারণ মত এই যে মসান্দগণ পূর্ব্বে গুরুগণের গৃহকার্য্যের সমুদায় বন্দোবস্ত করিতেন, এই জন্য তাঁহারা অপরাপর শিখের উপর আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। এতদ্দর্শনে গুরুগোবিন্দ তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন। তদবধি তাঁহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছেন।

৯ম। রঙ্গরেথ সম্প্রদায়। চুরা-নামক নীচজাতীয় কতকগুলী লোক দিল্লী হইতে গোপনে তেগবাহাদুরের মৃতদেহ আনয়ন করে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারাই রঙ্গরেথ বলিয়া অভিহিত।

১০ম। রামদাসী বা রুইদাসী সম্প্রদায়। চামার বংশীয় শিখগণ এই নামে অভিহিত হয়।

১১ শ। মক্করী সম্প্রদায়। মুসলমানের মধ্যে যাঁহারা শিখধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে মক্করী বলা হয়।

১২শ। অকালী সম্প্রদায়। ইহারা অকাল বা ঈশ্বরের উপাসক ও সন্ন্যাসব্রতাবলম্বী।

১৩ শ। নিহঙ্গ সম্প্রদায়। ইহারা অতিপবিত্র ভাবে বাস করে এবং উলঙ্গ থাকে।

১৪ শ। নির্ম্মল সম্প্রদায়। যে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যগুণে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তিনিই এই সম্প্রদায়ভুক্ত ও উপদেশক হন।

১৫ শ। জ্ঞানী সম্প্রদায়। শিখগণের মধ্যে জ্ঞানী বা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এই নামে অভিহিত হন।

১৬ শ। সুত্রসহী সম্প্রদায়। ইহারা অতিশয় সত্যবাদী ও পবিত্র। সুচ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। লাহোর নগরে ইহাদের একটি ডেরা বা স্থান আছে (৪০)।

১৭ শ। সচিদারী সম্প্রদায়। ইহার প্রতিষ্ঠার নির্ণয় নাই। ইহারা শুদ্ধাচারী ও পবিত্র।

১৮ শ। ভাই সম্প্রদায়। ইহাকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে না; কেননা শিখগণের মধ্যে যাঁহারা পবিত্রভাবে বাস করেন, তাঁহারাই ভাই বলিয়া অভিহিত হন। শিখগণ এই অষ্টাদশ সামান্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত; কিন্তু ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ইহাদের পরস্পরে কোন বিভেদ নাই।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

---

(৪০) *Asiatic Researches* Vol XVII. P 362.

একটী আত্মীয়ার বিবাহোপলক্ষে।

১

বাজ্‌রে মধুর বীণা বাজ্‌ একবার,
বাজ সুখে সপ্তসরা
তুই মনো দুখ হরা
এসেছে সুখের দিন এসেছে আবার,
সুখেতে পূরিত হৃদি আজি সবাকার।

২

এক সূত্রে দুটী ফুল গাঁথিল জীবনে,
এক প্রাণ, এক মন,
ভিন্ন দেহ দরশন,
একটী জীবন স্রোতে বহিবে এখন,
দুইটী কোমল প্রাণ সুখ নিকেতন।

৩

তুষ্ট হও প্রজাপতি কর আশীর্ব্বাদ,
নত জানু দুই জনে
তব আশীর্ব্বাদ দানে
কর সুখী, হোগ্‌ সুখী, জাবত জীবন,
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বালা না সহে কখন।

৪

হে অখিল নাথ—
তোমার অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি,
তোমার লীলার সার,
সুখ দুখ বুঝা ভার
কভু হাসি, কভু কাঁদি, তোমার নিয়মে
কভু সুখী, কভু দুখী, মরমে মরমে।

৫

তাই বলি কর দয়া অখিলের পতি,
দিওনা দুখের ভর।
ওটীরে নয়ন তারা,
স্নেহের প্রতিমা মরি হৃদয়ের ধন,
পবিত্র কোমল প্রাণ স্নেহ নিকেতন।

৬

অভাগিনী মাতা তার স্বধু ভাগ্য ধরি,
সেই ভাগ্য লিপিকর
তুমি হে বিশ্ব-ঈশ্বর,
তাই করি জোড় পাণি মাগি এই বর,
আশীর্ব্বাদ কর দেব দম্পতী উপর।

৭

দুখ পরে সুখ আসে তোমার নিয়মে,
তাই বলি মনোহরা,
বাজ সুখে সপ্তস্বরা
বাজরে মধুর বীণা বাজ একবার,
এসেছে সুখের দিন এসেছে আবার।

৮

(শাখা)

হৃদি আবরণ তামসী বরণ
ধীরে ধীরে সরে গেল,
হৃদয় গগনে হাসিয়া হাসিয়া
সুখ শশী দেখা দিল।
বেষ্টিত তারকা তাহে অগণন
মরি কি মোহিনী শোভা,
মোহিল জীবন মোহিল এ মন
সবই আজি মনোলোভা।

৯

(বেহাগ)

নাচ নটী ভবে প্রাণ মনখুলে
বাজা বাদ্য মনোহর,
অগুরু চন্দন কুসুম রতনে
সুখে সাজা কলেবর।
সোনার ময়না তুলি পাতি পাতি
সাজাবে বহু তায়
দেখি আঁখি ভরি সেরূপ মাধুরী
সুধার জলদ হায়।
বর আশীর্বাদ সুখে থাক তুমি
চির সুখে হব কাল,
মধুর মিলনে মধুর জীবনে
মধুময় হবে ভাল।

(পূর্ণ কোরস)

১০

গাও আও সখি সবে গীত চারু সাজে,
সাথে এই তুহুঁ সাথি, বিবাহ সমাজ।
তুহুঁ মিলি দুঁহুজনে রহত সোহাগে,
সুখ বহত আজি মঙ্গল জোগাবে।
বহ বহ সবে মিলি জোড় করি পাণি
আশীষ ভগবান যুগল পরাণি।
হলাহল উহি জানে, দুসমন মোহ
দমা কি আবে তব পদাজ দোহ।

(শাম)

১১

(আর) ফুলের ডালা ফুল বাগানে
ফুলের ছড়া বিছিয়ে দিবি,

(আন) সুখের ডালা বরণ ডালা,
সুখে দোঁহে বরণ করি।
(যত) কুলের নারি সারি সারি,
মোহন বেশে মোহন কায়,
দাড়াও গিয়ে উদাস করে
হুলুধ্বনি দিয়ে হায়।
দু-জনেরই দুটী করে
বাঁধ দিয়ে ফুলের হার,
(সেই) ফুলের হারে ফুল বিহারে
দেখি শোভা অতুল তার।
(শাখা।)

১২

লও কোলে বরি, লওগো যতনে
দুহিতা জামাতা ধনে,
দোঁহার বদনে করিয়া চুম্বন
আশীষ দুইটী ধনে।
বেঁচে থাক্ দোঁহে কর আশীর্ব্বাদ
তোমার প্রাণের ধন,
সুখের সাগরে ভাসুক দুজনে
দেখে সুখী হবে মন।
স্নেহভরে আমি করি আশীর্ব্বাদ
আশীষ করুন তিনি,
নিয়তি বিধাতা অখিলের পতি
এভব ভুবনে যিনি।
নবীন দম্পতি মনে রেখো ভাই,
আছি বটে দূর দেশে,
মনে রাখি স্নেহ রেখ সেই স্নেহ,
জগতই স্নেহের আশে।

বিরজা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অপকারের শেষ।

উক্ত ঘটনার পরদিবস আবার বিজয়চন্দ্র আসিলেন, কিন্তু সে দিনও বিরজা তাঁহার সহিত কোন কথা কহিলেন না, বস্তুতঃ এ সকল তাহার পিতার সহ্য হইতে ছিল না। বিজয়চন্দ্র প্রস্থান করিলে, গোপাল আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া, সেই ভগ্নহৃদয়া একমাত্র দুহিতাকে অন্যায় তিরস্কার করিতে ক্রটী করিলেন না। গোপালচন্দ্র স্ত্রীলোককে সংসারের জীব মধ্যেই গণ্য করিতেন না, স্ত্রীলোকের মতামত নাই, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। স্ত্রীতে কেহ অধিক অনুরক্ত হইলে, তাঁহাকে স্ত্রৈণ্য বলিয়া বিদ্রুপ করিতেন, স্ত্রী না থাকায় গোপালচন্দ্রের এই ধারণা ও সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু স্ত্রীলোক জগতের কেহই নহে, ইহাই তাঁহার সূক্ষ্মবুদ্ধির সুক্ষফল!

স্ত্রীলোক বুঝে না, সুতরাং বিরজা বুঝিবে কি প্রকারে? বিরজা যে আপনার সুখ দুঃখ বুঝে না, ইহা গোপালচন্দ্রের বড় দুঃখ। কোথায় রাজরাণী হইবে, তিনি রাজশ্বশুর হইবেন, ইহাতে তাহার অনিচ্ছা, অথচ আশ্রয়হীন, সহায়, সম্পত্তিশূন্য অম্বিকাচরণকে ভালবাসিতে, বিবাহ করিতে, বিনামূল্যে তাঁহার চরণে ইহ জন্মের তরে বিকাইতে প্রস্তুত। কিন্তু একথা কি কেহ শুনে? স্বার্থে পরিবর্দ্ধিত আশালতার মূলে, কে এমন অন্ধ আছে যে কুঠারাঘাত করে? যদি করে—সে সংসারী নয়,—নররূপী দেবতা! কিন্তু ভূতে কখন মানুষ হয়? মানুষ ভূত হইতে পারে। গোপাল আমাদের সেই কিম্ভূত কিমাকার ভূত, সে স্বার্থান্ধ। গোপাল দেখিলেন যে অমানিশাকাশে প্রকৃতই পূর্ণ শশধর সমুদিত, তাঁহার সাধের চারাগাছে সত্যই কুঁড়ি ধরিয়াছে। বিজয়ের মন যে ভিজিয়াছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু উপায়! হতভাগিনী বিরজা ত বিজয়কে চায় না, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটিরে বাস তাঁহার অভিপ্রেত, রাজার পুত্র বিজয়কে উপেক্ষা করিয়া পথের ভিখারি অম্বিকাচরণে আশক্ত।

গোপালচন্দ্র ভাবিলেন স্ত্রীলোকের হৃদয় দর্পণবৎ, যাহা সম্মুখে থাকে, তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং ঘনিষ্ঠতা কমিলে তাহা আর থাকে না। চাকুরিটী না থাকায় অম্বিকার স্বাধীনবৃত্তিটুকু গিয়াছে, বা দু দিনে যাইবে, কিন্তু বিরজার ত তাহাতে মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই এখন কর্ত্তব্য কি? অম্বিকাকে বিরজার নয়নান্তরাল করা আবশ্যক, তাহার উপায় কি? সহসা অম্বিকাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে। গোপাল কয়েক দিন এই উপায় চিন্তায় গাঢনিরত রহিলেন। বিজয়চন্দ্রের সহিত সেই অবধি বেশ মাখামাখি হইয়াছে, গোপাল যাহা বলেন বিজয় এখন তাহাই শুনেন। অতি অল্প দিন মধ্যেই গোপাল বুদ্ধি পাকাইয়া তুলিলেন, অম্বিকার উপর কোন গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ অর্পিত করাই স্থির হইল। সে অভিযোগ কি? এ সম্বন্ধে বিজয়ের পরামর্শ লওয়া হইল শেষ রটনা করা হইল যে "অম্বিকা রাজকুমার বিজয়ের পরম শত্রু, তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় আছে" এই রটনা মুহূর্ত্ত মধ্যে দেশময় রাষ্ট্র হইল, বিজয়ের পিতার কাণে গেল, তিনি তখনি অম্বিকাকে বাঁধিয়া আনিতে অনুমতি দিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বিবৃত করিতেছি, সে সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবই সকল রাজা বা জমীদারের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বিজয়ের পিতা উমাচরণের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় না থাকিলেও নবাব বাহাদুরের নিকট যে উমাচরণের প্রতিপত্তি ছিল তাহা স্বীকার্য্য। গোপালচন্দ্রের প্রখর যুক্তিতে স্থির হইল যে অম্বিকাকে মুর্শিদাবাদে পাঠান হউক, নবাব বাহাদুর যেরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন তাহাই সকলের নিঃসন্দেহ অনুমোদনীয় হইবে। সকলে একমত হইয়া তদ্দণ্ডেই হতভাগ্য অম্বিকাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তখনবেলা দুই প্রহর অতীত প্রায়, কিন্তু সেখানে এমন কেহ ছিল না, যে অম্বিকার আহারাদি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করে। আমরা নিশ্চয় জানি অম্বিকার তখনও আহারাদি হয় নাই। ভাগ্যহীন

নির্দ্দোষী অম্বিকা সুনির্ম্মল হৃদয়ে দুর্নিবার্য্য হৃদয়গত উত্তেজনার বশীভূত হইয়া বিরজাকে ভালবাসিয়া মহাপাপ করিয়াছে, আজি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে, অনশনে, বন্দীভাবে, মুর্শিদাবাদাভিমুখে রক্ষি সমভিব্যাহারে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুঃখে সুখ।

অম্বিকাচরণ প্রস্থান করিলে গোলাপচন্দ্র বলিলেন, "এ মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে আমার মুর্শিদাবাদ যাওয়া বিধেয়।"

উমাচরণ বলিলেন "তাহাতে সন্দেহ কি? কল্য প্রত্যূষে রওনা হইবে, বেহারাদিগকে বলিয়া রাখ যেন তাহারা প্রস্তুত থাকে।"

গোপাল। যে আজ্ঞা।

উমা। যাহাতে ও পাজি আর এ দেশে না আসিতে পারে তাহা যেন করা হয়।

গোপাল। তাহাত করা চাই-ই।

উমা। অর্থ ব্যয়ের জন্য কুণ্ঠিত হইও না, প্রধান কাজিকে হাত করিবে, নবাবত কিছুই দেখেন না।

পাঠক! আসুন আপনাকে ঠিক এই সময়ের আর একটী ঘটনার কথা বলি, এখানে গোপালচন্দ্রের রাজার সহিত যে সময়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, সেই সময় তাঁহার বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পথে একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে।

রক্ষীগণ অম্বিকাচরণকে মুর্শিদাবাদ লইয়া যাইবার সময় গোপালচন্দ্রের বাটীর পার্শ্ব দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথ দিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা যদ্যপি ভিতরের কথা জানিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পথ দিয়া লইয়া যাইত না, কিন্তু দৈব ঘটনা প্রযুক্ত এ কথা কেহ জানে না।

পাঠক ! বোধ হয় অবগত আছেন যে গ্রামের এক প্রান্তভাগে গোপাল চন্দ্রের বাটী. গোপালের বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পথটী অতি নির্জ্জন, প্রায়ই সে পথ দিয়া লোকের যাতায়াত নাই, আজি সেই পথ দিয়া রক্ষীগণ অম্বিকাকে লইয়া যাইতেছে। অম্বিকার বদন বিশুষ্ক, মুখ ভাব মলিন ও বিষাদ সূচক, অম্বিকাচরণ বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহার যে একটা কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অম্বিকা গোপালের বাটীর নিকটস্থ হইয়া যেন তাঁহার সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন, মনে করিলেন "হে ভগবান, এ সময়ে যদ্যপি একবার বিরজাকে দেখাও তাহা হইলে বোধহয় আমার সকল দুঃখ নিবারণ হয়, আমি সকল কথা ভুলিয়া যাই।" কিন্তু ঈশ্বর কি দুর্ব্বিত্ত অম্বিকার কথা শুনিবেন ?

অম্বিকা বিষণ্ণ অন্তরে, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে এক দৃষ্টে গোপালের বাটীর নিকট গেলেন, বাটী শেষ হয়, যে আশার দামিনী ছটা মধ্যে মধ্যে অম্বিকার বিষাদরূপ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, তাহা বুঝি স্থির হয়,—অম্বিকার হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় বিরজাকে হয়ত আর দেখিবেন না, তাহার সমস্ত আশার মূল, মূর্ত্তিমতী প্রেমরূপিণী বিরজাকে আর দেখিবেন না, এদুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে, অম্বিকার চক্ষু এতক্ষণ শুষ্ক ছিল, এখন সজল হইল, যে হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে আশার তরঙ্গে উদ্বেলিত হইতে ছিল, তাহা যেন মন্দিভূত হইয়া আসিতে লাগিল। এমত সময়ে সহসা খিড়কীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, একটী অপরূপ রূপময়ী স্থিরযৌবনা রমণী আলুলায়িত কেশে, বিগলিত বেশে, দৃষ্টিহীন নয়নে উন্মাদিনীর ন্যায় অম্বিকাকে আলিঙ্গন করিয়া সরোদনে বলিল "প্রাণেশ্বর। অম্বিকা, কোথায়যাও, আমায় কোথায় ফেলিয়া যাও।"

দূরে প্রতিধ্বনি যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিল "আর কোথায় যাও।"

অম্বিকাচরণ জ্ঞান শূন্য স্তম্ভিতের ন্যায় বিরজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "বিরজা!"

চক্ষু জলে উছলিল, কণ্ঠরোধ হইল।

বিরজা একদৃষ্টে অম্বিকার প্রতি চাহিয়া সরোদনে কহিল "অম্বিকু।"

অম্বিকা। কেন বিরজা ?

বিরজা। তুমি কোথায় যাও, আমায় লইয়া চল।

অম্বিকা। তুমি কোথায় যাইবে বিরজা?

বিরজা। তুমি যেখানে যাইবে।

অম্বিকা। আমি কোথায় যাইব, তাহার স্থির কি, হয়ত যমালয় আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান।

বিরজা সদস্তে কহিল "না হয় আমারও তাহাই হইবে।"

অম্বিকা সস্নেহে বিরজার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন "এখন আসি, যদি বাঁচিয়া থাকি, যদি কখন ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চান, তবে দেখা হইবে, নতুবা এই শেষ। তোমার পিতা যদ্যপি এখন আসিয়া পড়েন তাহা হইলে আরও অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।"

রক্ষীগণ এতক্ষণ চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদের হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, "গোলাপচন্দ্র যদি আসে।" এই ভাবিয়া তাহাদের সে জ্ঞান তীরোহিত হইল, বলিল "আর নয়-চল।"

অম্বিকা। বিরজা তবে আসি।

বিরজা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, তরল হৃদয়ের সে প্রবল শোকের বিষয় বর্ণনা করা দুষ্কর, বলিল "হায় এই হতভাগিনীই তোমার সমস্ত দুঃখের কারণ।"

অম্বিকা। না বিরজা ওকথা বলনা, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমি আমার স্বপ্ন, তুমি আমার জ্ঞান।

অম্বিকা আমার রক্ষীপরিবৃত হইয়া চলিল, বিরজা নির্নিমেষলোচনে অম্বিকার প্রতি চাহিয়া রহিল, কিন্তু অশ্রুনীরে চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িল। ক্রমে অম্বিকা প্রকৃতই দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। বিরজা তখন স্বীয় হৃদয় মন্দিরে সেই দেবচিত্র অঙ্কিত করিয়া অশ্রুনীরে বক্ষস্থল বিধৌত করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কল্পনার বিকাশ।

যথা সময়ে গোপালচন্দ্রবিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে মুর্শিদাবাদে চলিলেন—সকলেরই মুর্শিদাবাদ যাইবার উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু বিরজা যে কেন যাইতেছে তাহা সে জানে না, না যাইবার জন্য কত নির্ব্বন্ধতা প্রকাশ করিল, কিন্তু গোপালচন্দ্র ছাড়িলেন না, তিনি বলিলেন "বিরজা তোমার যেরূপ মানসিক বিকৃতি জন্মিয়াছে তাহাতে দেশ ভ্রমণ ব্যতিরেকে তাহার উপশম হইবে না।" কিন্তু বিরজা মনে মনে বলিল "দেশ ভ্রমণে তাহার উপশম হইবে না, তবে পরলোকে যাইলে হইতে পারে।" যাহাই হউক বিরজা আজি মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিল। যাহার হৃদয় বিষণ্ণ, যাহার মনে সুখ নাই, তাহকে নন্দনকাননে লইয়া যাও সে সুস্থ হইবেন না, সুতরাং মুর্শিদাবাদের রমণীয়তা যে বিরজার প্রাণে কিছুমাত্র সুখ বৃদ্ধি করিতে পারিল না, অথবা সেই বিকৃত ভাবাপন্ন হৃদয়ের কিছুমাত্র উপশম সাধন করিতে সক্ষম হইল না তাহা নিশ্চয়। আমরা বলি বরংতাহার বৃদ্ধি হইয়াছে। আজি বিরজা বিজয়চন্দ্রের বাটীতে রহিয়াছে, সেই পাষণ্ড, যাহার নৃশংস ব্যবহারের জন্য তাহার ইহ জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট হইয়াছে.যাহার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য একটী হতভাগ্যের ইহজীবনের সমস্ত আশালতা শুষ্ক হইয়াছে, আজি বিরজাকে শত অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও সেই পাষণ্ডের মুখাবলোকন করিতে হইতেছে! সুযোগ পাইলে বিজয় বিরজার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিরজা দুঃখে রাগে ম্লান বদনে তথা হইতে চলিয়া যায়। ইহ জগতের একমাত্র সহায় গোপালচন্দ্রকে বলিলে তিনি তাহার কোন প্রতিউত্তর দেন না। বিরজার আর উপায় নাই, বিরজার ইহ জগতে অন্য সহায় নাই, দুঃখ জানাইবার স্থান নাই, — কিন্তু বিরজা জানিত যে শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, সকলের বিধাতা, অনাথ সহায় একজন আছেনই আছেন. বিরজা অবিরত সজল নয়নে দীনভাবে তাঁহারই নিকট আপন দুঃখের কান্না কাঁদিত। কিন্তু লোকেত তাঁহার কার্য্য দেখিতে পায় না, অনু,

ভব করে, কিন্তু আজিও হতভাগিনী বিরজার সে অনুভবের সময়ও উপস্থিত হয় নাই।

গ্রীষ্মকাল, দিবা দ্বিপ্রহর অতীত, বিরজা আপন শয়ন কক্ষের একটী খট্টোপরি শয়ন করিয়া রোদন করিতেছে। বিরজা রোদন করিলে বিজলী নিশ্চিন্ত থাকিত না, নানা উপায়ে নানা কৌশলে নানা প্রকারে শান্তনা করিত, কিন্তু এ সময়ে বিজলী অন্য কার্য্যে ব্যস্ত, সুতরাং বিরজা আপন মনে অঝোরে কাঁদিয়া আপন মনোভাব লাঘব করিতেছে, এমত সময়ে তথায় গোপালচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিরজাকে রোদন পরায়ণা দেখিয়া ক্ষণেক নির্নিমেষ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, বিরজার অপরূপ রূপ মাধুরী একে একে তাঁহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইতে লাগিল, তাহার অসীম গুণগ্রাম একে একে তাঁহার হৃদয়পটে সমুদিত হইতে লাগিল, তিনি মনে মনে বলিলেন "মা আমার রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—এ রূপ কি পামর অম্বিকার পর্ণকুটীরে শোভা পায়? ইহা রাজার ঘরে শোভা পাইবে।"

বিরজা এখনও তাহার পিতাকে দেখে নাই সে এখনও এক মনে কাঁদিতেছে, গোপাল চন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না বলিলেন "বিরজা, মা কাঁদ্‌চ কেন?"

বিরজা চমকিয়া উঠিল, দেখিল সম্মুখে পিতা দণ্ডায়মান, শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিল, সেই গোলাপী অধরে সহসা রক্তের সঞ্চার হইল, সেই অতুল রূপের ক্ষণিক পরিবর্ত্তন যে কত মধুর, তাহা বর্ণনা করা দুরূহ।

বিরাজা গোপালচন্দ্রকে দেখিয়া অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, বরং অশ্রুধারা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

গোপালচন্দ্র পুনরপি বলিলেন "বিরজা কাঁদ্‌চ কেন মা?"

বিরজা সে কথার কোন প্রতিউত্তর দিতে পারিল না, বস্তুতঃ তাহার সেই নয়ন বারি তাহার যে উত্তর দিতে ছিল তাহা নির্জ্জীব ভাষায় ব্যক্ত হয় না, কিন্তু গোপাল পাষণ্ড আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেই পাগল, সে কেন এক জন অনাথিনী অভাগিনীর নয়ন জল দেখিয়া বিকলচিত্ত হইবে!

গোপাল কহিলেন" ছি মা কেঁদনা কান্না কেন ?"

বিরজার মুখে কথা আসে আসে আসেনা, মুখ ফুটে ফুটে ফুটে না। বিরজা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা সরিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

তখন গোপালচন্দ্র বলিলেন "বিরজা তুমি বালিকা, আমি যে তোমার সুখ সৌভাগ্যের জন্য কত চেষ্টা করি ত তুমি কি জানিবে, যখন বয়স হইবে জ্ঞান হইবে, ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখিবে, তখন বলো যে আমি বিজয়ের, সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে ভাল কর্‌ছি কি না।"

বিরজা চমকিয়া উঠিল, তাহার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, শরীর কণ্টকিত ও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। বিরজা কোন কথা কহিতে পারিল না।

"মৌনং সম্মতি লক্ষণং" বুঝিয়া গোপালচন্দ্র বিরজার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন " কাল দিন ভাল আছে, কালই বিবাহ দিব।"

কবে বিবাহ হইবে না হইবে তাহা না জানিয়া বিরজা যে উৎকণ্ঠারূপ আশ্বাসের ভ্রূকুটী ভঙ্গি সহ্য করিতে ছিল তাহা এতক্ষণে তীরোহিত হইয়া ততোধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। যে দেশে বিচার নাই, প্রণয়ের পাত্রা-পাত্র নাই, পরের হস্তে বল পূর্ব্বক সমর্পণ করিলেই বিবাহ হয়, সে স্থলে গোপালচন্দ্র বিরজাকে বিজয়ের হস্তে সমর্পণ করিলে আর উপায় কি ? বিরজা কি বলিবে ? অশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে হয়ত বিজয়কে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, বিরজা এইরূপ নানাবিধ ভাবি অমঙ্গল স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিতে লাগিল।

বিরজার হৃদয় এখন স্তম্ভিত, যে বিরজা এতক্ষণ আকুল নয়নে রোদন করিতে ছিল, সে বিরজার চক্ষে এখন আর জল নাই, বিরজা নির্ব্বাক নিস্পন্দ কিন্তু তাহার হৃদয়ে চিন্তা ও আতঙ্কের যে উত্তাল তরঙ্গ ক্রীড়া করিতে ছিল তাহার নিকট ঘোর ঝটিকাকালিন তরঙ্গমালা সমাকুল পারাবার বক্ষও পরাস্থ হয়।

গোপাল বিরজার রোদন ভঙ্গের কারণ তাঁহার প্রদত্ত সুসংবাদকেই নির্দ্দেশ করিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যে প্রবল

শোকোচ্ছ্বাস মুহূর্ত্তমাত্র স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে যেন নূতন বেগে বলীয়ান হইয়া সহস্রধারে উছলিয়া উঠিল যে বোধ প্রবল স্রোতে ভাঙ্গ ভঙ্গ হইয়া ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল, বিরজা আবার অঝোরে কাঁদিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শান্তি।

বিরজা একাকিনী অঝোরে কাঁদিতেছে এমত সময় তথায় বিরজার প্রিয় সখি বিজলী আসিয়া উপস্থিত হইল, বিজলী ক্ষণেক নিশ্চেষ্ট ভাবে বিরজার পার্শ্বে বসিয়া রহিল। তখন বিরজা একবার স্থির দৃষ্টে বিজলীর প্রতি তাকাইল, বিজলীকে দেখিয়া বিরজার শোক যেন দ্বিগুণিত হইল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিরজা বলিল "সই।"

বিজলী। কেন সই, কাঁদচ কেন?

বিরজা কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

বিজলী ক্ষণেক স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল পরে বিরজাকে নানা প্রকারে শান্তনা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। বিরজা উন্মাদিনীর ন্যায় জ্ঞানশূন্যা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বিজলীর বড়ই দুঃখ হইল, কিন্তু উপায় কি? এ সংসারে বিরজার কাঁদিবার— দুঃখ জানাইবার, একমাত্র স্থান বিজলী—বিজলী বিরজার শান্তি, বুদ্ধি ও উপায়, আজি সেই বিজলী তাহার উদ্ধারের কোন উপায়ই স্থির করিতে পরিতেছে না।

অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর বিরজা বলিল "সই কি হবে?"

বিজলী। উপায় ত দেখিনা।

বিরজা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "কি উপায় নাই, তবে কি আমায় ঐ পিশাচের পত্নী হইতে হইবে?

বিজলী নিস্তব্ধ।

বিরজা সকরুণে আবার কহিল " সই আর কিছু না পার মৃত্যুতেও কি সহায়তা করিতে পারিবেন না ?"

বিজলী বিস্মিত হইয়া কহিল "সই তুমি মরিবে ?"

বিরজা। তাহাতে কি সন্দেহ আছে ?

বিজলী কাঁদিয়া বলিল "এমন কপালও করিয়াছিলে ? কিন্তু না সই তোমায় আমি এ কচি বয়সে মরিতে দিবনা, ইহার উপায় করিব।"

বিরজা। কি উপায় সই—

বিজলী। সে কথায় এখন কাজ কি, পরে জানিতে পারিবে।

এই বলিয়া বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিরজা। কোথায় যাইবে ?

বিজলী। এখন কোন কথাই নয়।

বিজলী চলিয়া গেল। বিরজা সোৎসুক চিত্তে অবাক্ হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় বিজলী ফিরিয়া আসিল। বিরজা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না, ভয়, পাছে বিজলী কোন মন্দ সংবাদ দেয়।

বিজলী একবার তাহার সেই সুদীর্ঘ চক্ষু দুইটী দিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে বিরজাকে দেখিয়া বলিল "বিরজা, সই—"

বিরজা বিজলীর দিকে তাকাইল।

বিজলী। আমি তোমায় উদ্ধার করিব!

বিরজা। পারিবে ?

বিজলী। নিশ্চয়।

বিরজা। কি করিতে হইবে।

বিজলী। কিছু না, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও।

বিরজা কিছুই বুঝিল না, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইল।

যথা সময়ে সকলে আহারাদি করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। রজনী ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়া আসিল। যখন নিদ্রা দেবীর শান্তিময়ী সুখদ অঙ্কে সকলেই সুষুপ্ত, কোথাও কোন শব্দ নাই, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, পৃথিবী বুঝি অচেতন—যাবতীয় জীব মৃত; এমত সময় বিজলী ধীরে ধীরে বিরজার

সয্যায যাইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল, দেখিল বিরজা জাগরিতা, চমকিয়া বলিল "সই।"

বিজলী মৃদুস্বরে বলিল "সয্যা হইতে উঠ, আমার সহিত আইস।"

বিরজা একটী কথাও না কহিয়া তাহাই করিল। উভযে নিঃশব্দে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সাধারণ পথে উপস্থিত হইল।

তখন বিজলী বলিল "কোন কথা কহিও না, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।

বিরজা তাহাই করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইহা কি স্বপ্ন?

উভযে এই রূপ নিস্তব্ধ ভাবে অনেক দূর যাইয়া বিরজা আর থাকিতে পারিল না, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আমরা কোথায় যাইতেছি?"

বিজলী। যে দিকে চক্ষু যায়।

বিরজা। আমরাত চলিলাম, কিন্তু এসময়ে একবার অম্বিককে কি দেখিতে পাই না?

বিজলী। সে পরের কথা, এখনত বিজয়কে বিবাহ করিতে এড়াও।

বিরজা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল. বিজলী দেখিল বিরজা কাঁদিতেছে, বলিল "সই কাঁদিতেছ!"

বিরজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া, নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

বিজলী। সই কাঁদিওনা, কাঁদিলে আমি তোমার সহিত যাইব না।

বিরজা অবাক্ হইল, কিন্তু কোন কথাই কহিল না।

আরও কতক দূর যাইয়া উভযে একটী প্রকাণ্ড মাঠে পড়িল। বিজলী বলিল "সই দেখ দেখি চন্দ্র কিরণে ইহার কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে।"

বিরজা একবার আকাশ পানে চাহিল, কিন্তু তাহার তাহা ভাল না লাগায় আর কোন কথা কহিল না।

উভয়ে ক্রমশঃ একটী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল।

বিজলী ভীতি বিহ্বল স্বরে কহিল "সই, গাছ তলায় কে দেখেছ ?"

বিরজা। মানুষ।

বিজলী। কি জানি মানুষ কি ভূত।

বিরজা। এত রাত্রে এখানে মানুষ কেন ?

বিজলী। বলিতে পারিনা, আর এই ভিন্ন ত পথ নাই- কি করিবে কর।

বিরজা। চল যাই।

বিজলী। আমি যাইব না, তুমি যাইয়া দেখিয়া আইস।

বিরজা একবার বিজলীর বদন প্রতি চাহিল, বলিল "সই তুমি এত নিষ্ঠুর হইলে কেন ?"

বিজলী। কেন তুমি'ত ভাই মরিতে স্বীকৃত ছিলে, এখন ঐ বৃক্ষ তলে একাকিনী যাইতে ভীত হইতেছ কেন ?

বিরজা আর একটী কথা'ও না কহিয়া সেই দিকে ধাবিতা হইল।

বিরজা বৃক্ষের নিকটবর্ত্তিনী হইলে মানবটী তাহার নিকটে আসিল, চন্দ্রকিরণের সাহায্যে বিরজা তাহার আপাদ মস্তক বেশ দেখিতে পাইল। বিরজার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, তাহার জ্ঞান অপনোদনের উপক্রম হইয়া উঠিল। মানবটী বিরজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "বিরজা, বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা।"

বিরজা কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার নয়ন দিয়া অঝোরে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল এবং মনে মনে ভাবিল "ইহা কি স্বপ্ন ?"

দশম পরিচ্ছেদ।

নবজীবন।

বিরজা অম্বিকার বদনপ্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

অম্বিকাচরণ বিরজার মুখ চুম্বণ করিয়া কহিলেন "কি বিরজা।"

বিরজা। অম্বিক্, আবার যে এ জীবনে তোমার দেখা পাইব সে আশা ছিল না, ভাই তুমি বস, আমি তোমার কোলে শুই, শুয়ে শুয়ে তোমার মুখ দেখি।

অম্বিকাচরণ তাহাই করিলেন।

এমত সময়ে বিজলী তথায় উপস্থিত হইল, বলিল "একি এ যুগল মিলন কি রূপে হইল।"

বিরজা উঠিযা বসিল, বিজলীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল "তোমারই কৃপায়।"

বিজলী মৃদু হাসিয়া সে কথায় আর কোন উত্তর না দিয়া বলিল রাত্রি আর অধিক নাই, আমাদের এখনি যাত্রা করা কর্ত্তব্য।"

অম্বিকা। চল—নৌকা প্রস্তুত।

বিরজা। গঙ্গা এখান হইতে কতদূর?

অম্বিকা। অতি নিকট।

সকলে ভাগিরথী দিকে চলিলেন, বিরজার মনে তখন যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা বলা যায় না। তাহার হৃদয় আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত হইতেছিল, আবার থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতে ছিল " অম্বিকা আমার হইবে এমন কপাল কি করিয়াছি" কখন কখন মনে মনে ঈশ্বর সমীপে কত কাকুতি, কত মিনতি, কত প্রার্থনা করিতেছিল এমত সময়ে তাহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল, তথায় একটী নৌকা ছিল, তিন

জনে নৌকায় আরোহণ করিল,—একটানায় নৌকা সবেগে ছুটিতে লাগিল।

দুই দিবস পরে সকলে কাল্‌নায় উপস্থিত হইলেন।

অম্বিকাচরণ দুই চারি দিবস কাল্‌নায় অবস্থিতি করিলেন, তথায় যথা রীতি তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বিরজার আহ্লাদের পরিসীমা নাই—বিজলীরই বা কত আনন্দ, তাহারা যেন নূতন পৃথিবীতে আসিল।

কাল্‌নায় কোন প্রকার সুবিধা না দেখিয়া তাঁহারা তথা হইতে কৃষ্ণনগরে যাত্রা করিলেন। অম্বিকাচরণ ক্রমে কৃষ্ণনগরাধিপতির সহিত পরিচিত হইলেন।

মহারাজ বিশেষ গুণগ্রাহি লোক ছিলেন, অম্বিকাচরণের গুণগ্রাম দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আপন পারিষদ রূপে নিযুক্ত করিলেন, অম্বিকা রাজ প্রসাদে সপরিবারে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বিরজার আর সুখের সীমা নাই!

বিরজাও নানা প্রকার কারুকার্য্য জানিত। মহারাণী সেই জন্য তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। ক্রমে তাহারা স্ত্রীপুরুষে রাজা ও রাণীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাহাদের তমসাচ্ছাদিত আকাশ পটে সুখসূর্য্য সমুদিত হইল।

বিবাহের দুই বৎসর পরে বিরজার একটী সন্তান জন্মিল। মহারাজ এই উপলক্ষে অম্বিকাকে নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন, এবং স্বয়ং সন্তানটীর নাম বিভূতি ভূষণ রাখিলেন। বিভূতি দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপন অপরূপ রূপ লাবন্য ও সৌন্দর্য্যে সকলের বড়ই ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠিল।

এতদিনে অম্বিকা বিরজা ও বিজলী পূর্ব্ব দুঃখ সকল বিস্মৃত হইল!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মজার কথা।

বিরজা ও বিজলীর নিরুদ্দেশের পর দিন প্রাতঃকালে গোপালচন্দ্র দেখিলেন যে বিরজাও নাই বিজলীও নাই, নানা স্থানে অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। গোপালচন্দ্র হতাশ হইলেন, তাঁহার আশালতা দলিত হইল।

যথা সময়ে সংবাদ আসিল যে অম্বিকাচরণও নিরুদ্দেশ—তখন আর কাহারও প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বাকি রহিল না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবার ন্যায় গোপালচন্দ্রের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি বিজয়-চন্দ্রের সহিত তৎক্ষণাৎ মহামান্য কাজির নিকট গেলেন, কাজি বলিলেন "অনুসন্ধান না পাইলে কি করিব।" অনুসন্ধান হইতে লাগিল, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না।

বিজয়চন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া নন্দনপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, গোপাল-চন্দ্রও তাঁহার সহিত আসিলেন। বিজয়ের সহিত গোপালচন্দ্র যে সম্বন্ধের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সহসা তাহা ছিন্ন হইল।

গোলাপচন্দ্রের মনে বড় ধিক্কার হইল। তিনি শপথ করিলেন যে বিরজাকে আর কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। সেই দিবসই তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও বিরজা না পায় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই অভিপ্রায়েই তিনি বিবাহ করিলেন।

গোপাল চন্দ্র একটী চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া যুবতীর পাণি গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নব বিবাহিতা পত্নী দেখিতে মন্দ নয়, মধ্যাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ উন্নতনাসিকা, চক্ষু দুটী বড় কিন্তু কিঞ্চিৎ গোলাকৃতি, ওষ্ঠ বড় মনোহর, তাহাদের সংযম আরও মনোহর—ললাট কিঞ্চিৎ প্রশস্ত, বিশেষতঃ ভ্রূসংযমের

ঠিক উপরিভাগটী। রমণীর নাম মোক্ষদা সুন্দরী। মোক্ষদার সহিত গোপাল চন্দ্রের প্রণয় হওয়া অসম্ভব, বৃদ্ধে ও যুবতীতে প্রণয় প্রায়ই হয় না, কিন্তু গোপাল তাহা মানিতেন না। তিনি তাহাকে কত সোহাগ করিতেন, কত প্রকারে ভালবাসা দেখাইতেন, ইচ্ছা যে মোক্ষদা তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত হউক ? কিন্তু যাচিয়া প্রেম ও ঘসিয়া রূপ কি হয় ?

* * * *

আজি প্রায় ছয় বৎসর হইল বিরজা নিরুদ্দেশ এবং ছয় বৎসর গোপাল চন্দ্র বিবাহিত হইয়াছেন। গোপালের পত্নীর বয়ক্রম এখন বিংশতি বৎসর, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই, হয়ত মোক্ষদার আর সন্তানাদি হইবে না। বস্তুতঃ মোক্ষদার যত বয়স বাড়িতেছে গোপাল চন্দ্র ততই উদ্বিগ্ন হইতেছেন। এই ছয় বৎসর মধ্যে গোপালচন্দ্র এক দিবস ভ্রমেও বিরজার নাম মুখে আনেন নাই, গোপাল চন্দ্র মধ্যে মধ্যে কাজির নিকট হইতে অম্বিকাচরণের প্রেপ্তারের সংবাদ লয়েন কিন্তু কোন সময়েই সন্তোষ জনক সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন না।

বিজয়চন্দ্রের সহিত গোপালচন্দ্র যে সম্বন্ধের আশা করিয়া ছিলেন অনেক দিন হইল যে আশা গিয়াছে কিন্তু বিজয় এখনও ঘনিষ্ঠতা ছাড়ে না। বিজয় প্রায়ই গোপালের বাটীতে বেড়াইতে আসেন এবং পান খাইয়া যান, কিন্তু এ ঘনিষ্ঠতা গোপালচন্দ্রের ভাল লাগে না, অথচ বলিতেও পারেন না। বাটীতে যুবতী ভার্য্যা, গোপাল কখন থাকে কখন না থাকে, এ অবস্থায় আত্মীয়তা দেখাইতে বিজয়ের তাহার বাটীতে যাওয়া অন্যায়, কিন্তু বিজয় তাহা বুঝেনা, গোপালচন্দ্রের ইহাই দুঃখ !

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নবসূত্র।

আজি প্রায় বৎসরাবধি হইল বিজা পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়াছেন। চিকিৎসকের মত যে তিনি কিছু দিবস নৌকা করিয়া জল পথে ভ্রমণ করেন। বলা বাহুল্য যে সেই রূপই করা হইল। বিজয়চন্দ্র আজ সপ্তাহাবধি জল পথে ভ্রমণ করিতেছেন।

কৃষ্ণনগরাধিপতিও ঠিক এই সময়ে নৌ [illegible] তীর্থ যাত্রায় যাইতে ছিলেন, সঙ্গে স্বতন্ত্র নৌকায় সপরিবারে অম্বিকাচরণও যাইতেছিলেন। মুর্শিদাবাদ পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে অম্বিকাচরণ বিশেষ সতর্ক হইলেন, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আর নৌকার বাহিরে আইসেন না, সতত ভিতরেই থাকেন। পাছে কেহ কিছু মনে করেন—সেই জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই সকলের নিকট আপন শারীরিক অসুস্থ জানাইয়া ছিলেন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে অম্বিকার ঘোর শত্রু [illegible] ঘটনাক্রমে সেই দিকে জল পথে ভ্রমণ করিতেছি[illegible] অম্বিকাচরণকে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ গামী হইল।

যদিও অম্বিকা চরণ জানিতেন যে নৌকা [illegible] হইবে না, তথাপি তিনি তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতে [illegible] নৌকা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চাতে রাখিলেন। তিনি [illegible] করিলেন, মহারাজা মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে হয়ত নবাব সরকার হইতে কেহ না কেহ তাঁহার সম্মান রক্ষাকরিতে আসিবে, অতএব সে সময় নিকটে থাকিলে কি জানি যদ্যপি তাহারা জানিতে পারে, কি জানি যদ্যপি সেই সময় মহারাজা কোন কার্য্য বশতঃ তাঁহাকে ডাকেন।

অম্বিকা এ পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্ব কাহিনীর বিন্দুমাত্র মহারাজাকে বলেন নাই, কেন বলেন নাই তাহা আমরা বলিতে পারিনা। অম্বিকা মনে করিয়া

ছিলেন কি জানি একথা শুনিলে মহারাজ যদ্যপি তাঁহাকে নবাবের ভয়ে আশ্রয় না দেন।

নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া অম্বিকা আপন নৌকা মহারাজের নৌকা হইতে অনেক দূরে রাখিল, এবং স্বয়ং তন্মধ্যে গুপ্ত ভাবে রহিলেন; তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে এ রূপ গুপ্ত ভাবে যাইলে কেহই তাঁহার বিষয় জানিতে পারিবে না। বস্তুত। তিনি যে রূপ সতর্ক ভাবে যাইতে ছিলেন তাহাতে যে কেহ তাঁহাকে চিনিবে বা তিনি যে নৌকায় যাইতেছেন এ বিষয় কেহ জানিবে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয়, গ্রহবৈগুণ্য থাকিলে কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে,—তোমার সতর্কতা প্রভৃতি সকলই তাহার নিকট পরাস্ত হয়, কথায় বলে "মাটি ফুড়ে কাটে সাপ আয়ুহীন নরে।"

যথা সময়ে মহারাজের তরণী সমূহ মুর্শিদাবাদ অতিক্রম করিয়া গেল, কেবলমাত্র অম্বিকার নৌকা যাইবে। তাহার মুর্শিদাবাদ পৌঁছিতে অল্প বিলম্ব আছে এমত সময়ে গঙ্গাবক্ষ বিদারণ করিয়া কতিপয় নৌকা সবেগে অম্বিকাচরণের নৌকার দিকে আসিতে লাগিল। বিজলী তদ্দৃষ্টে তদ-সংবাদ অম্বিকাচরণকে দিলেন, অম্বিকা কম্পিত হৃদয়ে ত্রস্ত ভাবে নৌকার গবাক্ষ দিয়া গুপ্ত ভাবে দেখিলেন; কোন ভাবি অমঙ্গল সম্পাত যে হইবে তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন। বিরজার সরোজ বদন শুকাইল, সেই ইন্দিবর তুল্য নয়ন যুগল সজল হইল, অম্বিকা বিরজার বদন প্রতি তাকাইলেন, তাহার মুখ ভাব দেখিয়া তাঁহার বড় ক্লেশ হইল, হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, মৌখিক সাহস সহকারে বলিলেন "ভয় কি বিরজা।"

বিরজার চক্ষু দিয়া জল পড়িল, বিরজা কেবল সজল চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রায় বিংশতি জন সিপাহী আসিয়া তাহাদিগকে নৌকা সমেত ধরিয়া লইয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনা দর্শনে অভাগিনী বিরজার মূর্চ্ছা হইল, প্রিয় সহচরী বিজলীর শুশ্রূষায় মোহপনোদন হইলে দেখিল অম্বিকা তথায় নাই, বিভূতি ভূষণ মাতার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বদনের নিকট স্বীয় বদন খানি লইয়া যাইয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিতেছে ও অঝোরে কাঁদিতেছে।

ষষ্ঠ বর্ষায় বালকের জ্ঞান আছে কি? কিন্তু বালককে দেখিলে তাহার যে সে সমস্ত বুঝিবার বেশ ক্ষমতা আছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বালকের আকুল নেত্রের জল দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। বালক কি কেবল মাতার ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিতেছে? না, তাহা নহে, তাহা হইলে কেবল "মা মা" বলিয়াই কাঁদিত, কিন্তু বিভূতি একবার বা "মা ওঠ, মা!" বলিয়া নয়নজলে ভাসিতেছে, আবার কখন "বাবা, বাবা কোথায় গেল মা, কে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল মা, আমি যে বাবার কোলে যাব।" আবার কখন কখন বলিতেছে "বড মা" বিভূতি বিজলীকে "বড মা" বলিত "বড় মা আমার বাবা কোথা গেল? আমার বাবা কই বড় মা!"

বিরজা চক্ষুউন্মীলন করিয়া একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া বলিল "অম্বিক, অম্বিক, অম্বিক কই! বিজল, সই আমার অম্বিক কোথায়? বল আমার প্রাণ বাঁচাও।"

বিজলী তাহার কোন উত্তর দিল না, কেবল রোদন করিতে লাগিল। তাহার নয়ন বারিই তাহার সকল কথা প্রকাশ করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

বিজয়চন্দ্র মুর্শিদাবাদ পোঁছিবার পূর্ব্বে অম্বিকার চরণকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ বা উপদেশ যে কৌশল ক্রমে পূর্ব্ব হইতে পাঠাইয়া ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ দিকে মহারাজ বাহাদুর যথা সময়ে অম্বিকাচরণকে না দেখিতে পাইয়া মনে করিলেন অম্বিকাচরণের তীর্থ যাত্রায়

বাসনা ছিলনা, তাহাই আসেন নাই, কেননা আসিবার পূর্ব্বেও সে একবার ঐ রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। যাহাই হউক যদি এই রূপে পলাইবার ইচ্ছাই ছিল, তবে আসিবার প্রয়োজন কি ছিল? বলা বাহুল্য যে মহারাণী অম্বিকাচরণের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। মহারাণী বিরক্ত না হইয়া দুঃখিত হইলেন। বিরজাকে না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না, আজি সেই বিরজা তাঁহার সঙ্গে নাই, যে বিরজাকে তিনি আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন ভালবাসেন, সেই বিরজা আসিলনা, ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। তাহাও না হয় হইল, মহারাণী বিভূতি ভূষণকে ছাড়িয়া কি করিয়া থাকিবেন, বিভূতিকে তিনি প্রাণ তুল্য ভাল বাসিতেন। সে বিভূতিকে না দেখিয়া থাকিতে যে তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইবে, তাহা বলা বাহুল্য—যখনই তাহার মনে সেই বালকের সুন্দর প্রফুল্ল পবিত্রতামর বদন খানি মনে পড়িত, তখনই তাঁহার চক্ষে জল আসিত, তিনি তাহা নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেও তাহা স্খলিত হইতে থাকিত।

* * * *

এদিকে রক্ষীগণ নৌকায় উঠিয়াই অম্বিকাচরণকে উত্তম রূপে বাঁধিয়া লইয়া গেল। যাহার দয়া হইল, তিনি দুই চারিটা উত্তম মধ্যম দিতেও ত্রুটী করিলেন না। এ সময়ে হত ভাগিনী বিরজা মূর্চ্ছিতা, বিজলী বালক বিভূতীকে লইয়া শশব্যস্ত, সিপাহীগণ বিশেষ সুবিধা পাইয়া যে যাহা পাইল আত্মসাৎ করিল।

অম্বিকা যাইবার কালে সিপাহী দিগের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, বলিলেন যে "তোমরা একটু অপেক্ষা কর বিরজার জ্ঞান হইলেই যাইব।" কিন্তু তাহারা সেকথা শুনিলনা, অম্বিকার চক্ষে জল আসিল, তিনি আবার বিনয় সহকারে বলিলেন যে "তবে একবার আমার বিভূতিরে কোলে করিতে দাও, আমি বিদায় কালে তাহাকে একবার জন্মের মত কোলে করি, একবার তাহার মুখ চুম্বন করি" কিন্তু পাষণ্ডরা তাহাও শুনিল না তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। বিজলীর প্রাণ ফাটিয়া গেল, চক্ষু দিয়া সবেগে জল আসিল, বিভূতির মুখ চুম্বণ করিয়া মনে মনে বলিল, "বিরজা তুমি ভাগ্যবতী, তোমায় এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে হইবে না বলিয়াই কি মোহ হইল।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নিদারুণ ঘটনা।

বিরজার মোহ ভঙ্গ হইলে বিজলী এ সকল কথা আর তাহাকে বলিল না, কেবল মাত্র বলিল যে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। অম্বিকাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে এক জন সিপাহী আসিয়া বলিল যে "অম্বিকা এখন বন্দী, হয়ত যাবজ্জীবন তাহাকে বন্দী ভাবে থাকিতে হইবে, সুতরাং তোমরা ইচ্ছামত যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। আর সে যে রাজ আজ্ঞা অবহেলা করিয়া পলাইয়া ছিল তজ্জন্য তাহার কাজি সাহেবের নিকট বিচার হইবে।"

সিপাহী এই নিদারুণ সংবাদ দিয়া চলিয়া গেলে,বিরজা ও বিজলী উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

বিরজা অগত্যা নৌকা ছাড়িয়া একটী বাসা ভাড়া করিলেন। অম্বিকার অপরাধের কি বিচার হয় তাহা জানিবার জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত। অম্বিকাকে যে আর দেখিতে পাইবে সে আশাও নাই। তবে বিচারপতি যদি সদয় হইয়া এই সামান্য অপরাধের জন্য তাহার প্রাণ দণ্ড না করেন তাহা হইলেই মঙ্গল। কাজির অসাধ্য বিচার নাই, অসাধ্য কাজও নাই।

বিরজা নিদ্রাহার ত্যাগ করিয়াছে, একমাত্র বিভূতি ভূষণই এখন তাহার শান্তিও সন্তোষের স্থান. যখনই মন অত্যন্ত খারাপ হয়, অম্বিকার সেই বদন মাধুরী, সেই অকৃত্রিম প্রেম হৃদয় পটে উদিত হয়, তখনই বিভূতিকে কোলে করিয়া আকুল নয়নে কাঁদে ও তাহার বদন প্রতি শূন্য নয়নে চাহিয়া থাকে।

এক দিন বালক বলিল "মা কাঁদ কেন?'

বিরজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা কেন কাঁদি তা যে তুমি জাননা।"

বিভূতি। আর কেঁদনা।

বিরজা বালকের বিশুষ্ক বদন দেখিয়া ক্ষণেক রোদন সম্বরণ করিতে

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। চক্ষু মানিল না। বালক উপায় না দেখিয়া মাতৃ গলদেশ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাতা পুত্রে রোদন পরবশ হইলেন।

বালক বিভূতি আবার মধ্যে মধ্যে "বাবা বাবা" করিয়া কাঁদিয়া বিরজা ও বিজলীকে নেত্রাসারে ভাসাইয়া দেয়। তাহার অম্বিকাকে একবার স্মরণ হইলে আর রক্ষা নাই—বালক আর্ত্তস্বরে কেবল পিতাকে দেখিবার জন্য কাঁদে। মা'তাকে, মাতৃস্থানিয়া বিজলীকে, তাহার পিতাকে দেখাইতে বলে। সে সময়ে কেহই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সক্ষম হয় না। বালক কাহারও সান্ত্বনা মানে না, কাহারও কথায় ভুলে না। আহা, কখন আপনি মাতাকে, তাহার বড় মাকে, সান্ত্বনা করিতেছে, আবার কখন তাহারা উভয়ে সেই দুগ্ধপোষ্য বালককে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছে না। বিভূতি পিতার জন্য কাঁদিলে তাহাকে সান্ত্বনা করা দায়, ক্রন্দন থামিলেও, কত দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, কতবার ফুঁপাইয়া উঠে। পাছে বিভূতি কাঁদে সেই জন্য বিজলী অনেক কষ্টে আপন যাতনা দমন করে, অনেক কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করে। কিন্তু বিরজা চেষ্টা করিয়াও তাহা পারে না, তাহার চক্ষু মানে না।

নিরপরাধির এই সামান্য বিচার হইতে দুইমাস কাটিয়া গেল, শেষ হুকুম হইল যে অম্বিকাচরণকে যাবজ্জীবন বন্দীভাবে জীবন কাটাইতে হইবে। সমস্ত দিন রাজ সরকারে কার্য্য করিবে, মাসে ৩৲ টাকা মাত্র পারিশ্রমিক পাইবে। মুর্শিদাবাদ ছাড়িতে পাইবে না, পক্ষান্তে এক দিন মাত্র অবকাশ। তাহাও তিন ঘণ্টার জন্য!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মেঘেতে বিজলী।

অম্বিকাচরণকে স্বকার্য্যে প্রবত্ত হইতে হইল। একমাস অস্থিভেদি পরিশ্রম করিয়া ৩৲ টাকা মাত্র বেতন. আর ৩৲ টাকায় একটী লোকের

কি ভরণ পোষণ হয়? তবে তৎকাল সকল দ্রব্যই সুলভ ছিল, তাই এরূপে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত হইত।

কিন্তু অম্বিকাচরণ একা নহেন, এখন তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও আর একটী ভরণীয়া আছেন, ইহাদের দশায় কি হইবে? ইহাদের ভরণ পোষণের চিন্তা করা না করা সমান, কেননা তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই—তাঁহার ইহজীবন এইরূপ বিষাদেই কাটাইতে হইবে। দুর্দ্দণ্ড জমিদারের কোপে পড়িয়া একটী নীরিহ নিরপরাধির ইহ জীবন কি ভয়াবহ হইল তাহা দেখ।

বিরজার চলে কি প্রকারে, বালক বিভূতি খায় কি? ঈশ্বর তোমার মহিমা অপার, তুমি যে কি অপূর্ব্ব কৌশলে এই বিশ্বসংসার পরিচালিত করিতেছ তাহা বুঝিয়া উঠে এমন লোক সংসারে নাই—কিন্তু আমরা তোমার কার্য্যের কূটতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল বৃথা আর্ত্তনাদ করি। কোন প্রকার শিক্ষা বিষয়ে তাচ্ছিল্য করিতে নাই, কোন্ বিষয়ের দ্বারা যে কোন সময়ে উপকার দর্শিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। বিরজা বাল্য কালে পিতৃভবনে তাহার মাতার নিকট মকমলের উপর জরির কাজ করিতে শিক্ষা করে। বিরজা সুন্দর কারুকার্য্য বড় ভাল বাসিত, সুতরাং তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়া ছিল এবং ক্রমশ পরিচালনা দ্বারা তাহার সমধিক উৎকর্ষ লাভ হয়, আজি সেই শিক্ষাই বিরজার ভরণ পোষণের উপায় হইল। মুসলমানেরা জরির কাজ কিছু পছন্দ করে, তৎকালে মুর্শিদাবাদে অনেক ধনী মুসলমানের বাস ছিল সুতরাং সে সময়ে জরির কাজের বিশেষ আদর ও কাট্‌তি ছিল।

বিরজা মকমলে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর সুচারু কার্য্য করিয়া দিত আর বিজলী তাহা একজন মহাজনকে নগদ মূল্যে বেচিয়া আসিত। একশত টাকার দ্রব্য মহাজন পঞ্চাশ টাকায় কিনিত, তথাপি বিরজার তাহাতে বেশ লাভ থাকিত। মকমল ও জরি কিনিবার টাকায় বিরজা প্রাণান্তেও হস্তক্ষেপ করিত না। এইরূপে তাহাদের সংসার চলিতে লাগিল। কোন আর্থিক বিশেষ কষ্ট নাই—কিন্তু মানসিক বড়কষ্ট, যে বিরজা অম্বিকাকে একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, আজি সেই বিরজা অম্বিকাকে পক্ষান্তে

একবার মাত্র দেখিতে পায়, একষ্ট, এ যাতনা কি অবলার কোমল প্রাণে সহ্য হয়? কিন্তু বিরজার ভালবাসা অনন্ত অক্ষয়, তাহার আদি নাই—অন্ত নাই, অম্বিকার ইহাই সেই তাপ দগ্ধ হৃদয়ের এক মাত্র শান্তি। বিরজা! তোমার ন্যায় যাহার পত্নী, তাহার কি কোন দুঃখ আছে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মন্দের ভাল।

আজি অম্বিকার আসিবার দিন, অভাগিনী বিরজা কত সাধে কত আহ্লাদে কত প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার প্রাণের প্রাণ. জীবনের জীবন অম্বিকাকে খাওয়াইবে। তাহার হৃদয় অদ্য আহ্লাদে স্ফীত হইতেছে, একটী পক্ষ অতীত হইয়াছে, সেই প্রেম পূর্ণ স্নেহময় বদন কমল অবলোকন করিতে পায় নাই, আজি তাহা দেখিয়া হৃদয় প্রাণ পরিতৃপ্ত করিবে। বিভূতি ভূষণ "বাবা আস্‌বে, বাবা আস্‌বে" বলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়া বিজলীর মুখ ধরিয়া কত কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আনন্দে কথা বাহির হইতেছে না। বিজলী তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিতেছে না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মাতার নিকট আসিয়া তাহার বদন ধরিয়া আবার কত কথা কহিতেছে, বিজলীকে কত ভৎসনা করিতেছে।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই, পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিতেছেন. পূর্ব্বদিকে ম্লান বদনে নিশানাথ সমুদিত হইতেছেন। সান্ধ্য সমীরণ মৃদু মন্দ বাহিয়া যেন প্রকৃতিকে সন্ধ্যাসমাগম সংবাদ পরিজ্ঞাত করিতেছে, কলিকা সকল যেন এই সংবাদে চক্ষু উন্মিলন করিয়া একবার নিশাপতি একবার বা দিননাথের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি-

পাত করিতেছে। মৃদু সূর্য্যরশ্মি ... চুম্বন করিতেছে। কুসুমচ... পড়িতেছে—কুমুদিনী নায়ক ইহা দেখিয়াই কি ভুলি...!

সমস্ত দিবসের দারুণ পরিশ্রমের পর বিরজার সাধের ধন, দরিদ্রের অমূল্য বিভব, সতীর সর্ব্বস্ব, অম্বিকাচরণ আসিলেন, বিভূতি ভূষণ "বাবা বাবা" বলিয়া নাচিতে নাচিতে পিতৃসন্নিধানে গমন করিল। অম্বিকাচরণ স্নেহভরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। অনেক দিন পরে পুত্রমুখ চুম্বনে যে কি সুখ তাহা যাহার সন্তান আছে তিনিই জানেন। অনেকক্ষণ পুত্রের নানাবিধ প্রশ্নের ইচ্ছামত উত্তর প্রতি উত্তর দিয়া বলিলেন "বিরজা ভাল আছ?"

বিরজা। হাঁ ভাল আছি—তোমার শরীর ভাল।

অম্বিকা। বড় ভাল নয় বিরজা, কএক দিন অবধি সন্ধ্যার সময় যেন একটু অসুখ করে।

বিরজা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, মনে হইল "হায় আমি এমনি মন্দ ভাগিনী যে স্বামী সেবা করিতে পাইলাম না, যে স্বামী সেবা সতীর সর্ব্বস্ব, সতীর অক্ষয় স্বর্গ, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল না।" বিরজার সেই ইন্দিবর তুল্য নয়ন যুগল সলিল পূর্ণ হইল। অম্বিকাচরণ স্নেহ ভরে বিরজার মুখ চুম্বণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, সে আলিঙ্গনে অম্বিকা যে কত অনুপম সুখলাভ করিলেন তাহা বলা যায় না। হৃদয়ে কি যেন শূন্য ছিল তাহা পূর্ণ হইল। প্রেমের অঙ্কুর যেন শুষ্ক হইয়াছিল, তাহা সরস হইল!

অম্বিকা বিরজার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বিরজার সেই কোমল সুন্দর কর ধারণ করিয়া বলিলেন "দেখ বিরাজ এক পক্ষের এক একটী দিন যেন আমার এক একটী দীর্ঘ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আমি যে কষ্টে যে যাতনায় সে সময় অতিবাহিত করি তাহা ঈশ্বর জানেন, বিরজা! এ যাতনা যে আর সহ্য হয় না, তাই আর কতকাল এ যম যাতনা ভোগ করিব? আমি জানি যে যতকাল বাঁচিব তত কাল ভোগ করিতে বাধ্য—তাই তবে আমার বাঁচিয়া সুখ কি? আহা যখন বিভুর চাঁদ মুখ খানি মনে পড়ে, তখন চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, ঈশ্বরকে বলি যে হে ঈশ্বর

আমার কপালে কি এত দুঃখ লিখিতে হয়, কিন্তু কই আমার কাতরোক্তি ত তাঁহার চরণ কমল স্পর্শ করিতে পারে না।”

[illegible] ক্ষু বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু সম্পাত হইতে লাগিল। [illegible] কাঁদিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না, কিন্তু তাহার হৃদ[illegible] কাস্ছ্বাস হইতেছিল তাহা পাষাণ হৃদয় মানব কি বুঝিবে? [illegible] অন্তর্য্যামী তিনি ব্যতীত আর কাহারও তাহা অনুভব করিবারও ক্ষমতা নাই।

অম্বিকা আবার বলিলেন “আমি সপ্তাহে একবার করিয়াও যাহাতে তোমাদিগকে দেখিতে পাই সেই জন্য কাজির নিকট আবেদন করিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহা না মঞ্জুর হইয়াছে—তবে পূর্ব্বে তিনঘণ্টা ব্যতীত থাকিতে পাইতাম না, এখন সমস্ত রাত্রি থাকিতে পাইব।”

বিরজার প্রাণ পুলকিত হইল, অপেক্ষাকৃত অধিক সময় অম্বিকাকে দেখিতে পাইবে, ইহাই তাহার আনন্দ।

অম্বিকা বিভূতি ভূষণের সহিত নানাপ্রকার ক্রিড়া ও গল্প করিতে লাগিলেন, পতিব্রতা বিরজা তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে গেল। আর এক কার্য্য—একটী সুখের কথা বিজলীকে বলিতে—অম্বিকা রাত্রি যাপন করিবে, প্রাতে আবার সে বিধুবদন দেখিতে পাইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অত্যাচার।

এই রূপে দুঃখের জীবনে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। এখন বিভূতির বয়ঃক্রম আট বৎসর, বিভূতি পাঠশালায় যায়, পাঠশালার বালকেরা তাহার পিতার কথা উল্লেখ করিয়া হাস্য পরিহাস করে, বালক ছল ছল নেত্রে গৃহে আসিয়া মাতাকে বলে ও ক্রন্দন

করে। এখন বালকের একটু জ্ঞান হইয়াছে মাত্র। অজ্ঞান অবস্থায় তাহার যে জীবনটী সুখের ছিল, তাহা ক্রমশঃ দুঃখের হইতে আরম্ভ হইতেছে। যাহাতে নন্দনের পূতঃ সৌরভ বিকীর্ণ হইতে ছিল, তাহাতে সংসার নরকের পূতি গন্ধ উদ্গম হইবার সূত্রপাত হইতেছে।

বিভূতি পাঠশালায় গিয়াছে, বিরজার প্রিয়সখী সহোদরা স্থানীয়া বিজলী মহাজনের নিকট একটী মক্‌মলে জরির কাজ করা টুপী বিক্রয় করিতে গিয়াছে, বিরজা গৃহকার্য্য সমাপনান্তে নির্জ্জনে বসিয়া আপন সূচী কর্ম্ম করিতেছে, এমত সময়ে কে দ্বার দেশে মৃদু আঘাত করিল, বিরজা বিজলী আসিয়াছে ভাবিয়া শশব্যস্তে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল, কিন্তু দেখিল—বিজলী নয়—অপর ব্যক্তি!

বিরজার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, বাটীতে কেহ নাই, কিন্তু গৃহ মধ্যে নররূপী রাক্ষস উপস্থিত। আগন্তুক সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বিরজার যেন সহসা বাক্‌শক্তি বিলোপ হইল।

আগন্তুক বিজয়।

বিজয় বলিলেন "বিরজা, আমি রাক্ষস নহি, আমাকে ভয় কি, আমি এক কালে তোমার প্রতিবাসী ছিলাম, তোমায় প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে ভাল বাসিতাম, ভাল বাসিতাম না বিরজা, এখনও সেই রূপ কি তদপেক্ষা অধিক ভাল বাসি—কিন্তু তুমি আমাকে দেখিলে অমন ভীত হও কেন?"

বিরজা নিরুত্তর।

বিজয়। বিরজা আইস।

বিজয় বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন।

বিরজা সবেগে হস্তোন্মোচন করিয়া বলিলেন "আপনি আমার গৃহে কেন আসিলেন?"

বিজয়। কেন, বিরক্ত হইলে?

বিরজা। আমার এত অনিষ্ট করিয়াও আপনার আশা মিটেনাই, রাক্ষসী ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয় নাই?

বিজয়। আমার সকল দোষ ক্ষমা কর।

বিরজা দেখিল বিজয় মাদক সেবন করিয়াছে, আরও ভীত হইয়া বলিল "আপনি যান, আপনার এখানে আসা অতি অন্যায়।"

বিজয়। কি করিব বিরজা মন যে বুঝেনা।

বিরজার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত প্রবাহ হইল, অস্থিতে অস্থিতে শিরায় শিরায় যেন অগ্নি স্রোত প্রবাহিত হইল, হৃদয় অনন্ত শোকে উচ্ছ্বাসিত হইল, মনে মনে বলিল "হে ভগবান আমায় এমনি করিলে যে এ পৃথিবীতে আমার সহায় কেহই নাই।"—বিরজা দেখিল ভয় করায় কোন ফল নাই বরং অনিষ্ট আছে, সুতরাং হৃদয়ে দ্বিগুণ সাহস করিয়া বলিল "আপনি এখনি যান।"

বিজয়। এ চাঁদ মুখ দেখিয়া কি যাইতে পারি—বিরজা সে ভিখারী-টাকে বিস্মৃত হও, একবার সখের প্রাণ কর।

বিরজা। সাবধান হইয়া কথা কহিবেন, আপনি এখনি এখান হইতে যান, নতুবা আমি চীৎকার করিব।

বিজয়। বিরজা আমায় একবার আলিঙ্গন দাও, নতুবা আমি যাব না। আমার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনার জন্য যদি আমার প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, আমি অম্লান বদনে তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি।

বিরজা সজল চক্ষে বলিল "অনাথিনী দরিদ্রার উপর এত অত্যাচার করিবেন না, ঈশ্বর কখনই এত সহিবেন না।"

বিজয় উচ্চহাস্য সহকারে কহিল "বিরজা, ঈশ্বর আবার কে?"

বিরজা। পরে জানিতে পারিবেন, তাঁহার চক্ষে ধূলা দেওয়া যায় না, তাহার বিচারে পক্ষপাত নাই।

বিজয়। ও সকল বাজে কথা যাক, এখন আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, তোমার দারিদ্র্য ঘুচাও, আমি এখনি তোমাকে রাজরাণী করিতে পারি।

বিরজা সক্রোধে কহিলেন "সয়তান, তুমি আমার অর্থলোভ দেখাইতেছ, এখনি দূর হও।"

বিজয়, "হইতেছি" বলিয়া বিরজাকে আক্রমন করিল। বিরজা কত চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার দৃঢ় বন্ধন হইতে বিচ্যুত হইতে পারিল না, উভয়ে অনেক ক্ষণ পরস্পরে বল প্রকাশ করিল কিন্তু ক্রমশঃ বিরজার বল হ্রাস হইতে লাগিল। বিরজা নিরুপায়, গৃহে কেহ নাই—বাটী পল্লী পার্শ্বে, সেখানে

অধিক লোকের বসতীও নাই, চীৎকার করিলে কেহ শুনিতে পায় কি না সন্দেহ, বিজয় উন্মত্ত, বিরজা নিরুপায়, তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বক্ষ সবেগে ঢুব্ ঢুব্ করিতে লাগিল, চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিল "দয়াময়! ঈশ্বর, অধিনীর তোমা বই আর সহায় নাই, বিপদভঞ্জন এ বিপদের সময় উদ্ধার কর দেব।"

বিজয় আবার সবেগে বিরজাকে টানিল, বিরজা ভূমিতে পড়িয়া গেল, সে প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, পামর তাহার বদন চাপিয়া ধরিয়া বল প্রকাশ করিতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই, বুঝি বা সতীর সর্ব্বনাশ হয়। বিরজা সবেগে সবলে বিজয়কে পদাঘাত করিতেছে, তথাপি তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই, সে আপন চেষ্টায় রত। এমত সময়ে সহসা দ্রুত বেগে কে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, বিরজার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইল, সে তখনি মূর্চ্ছিতা হইল।

আগন্তুক সবলে বিজয়কে টানিয়া আনিয়া প্রহার করিতে লাগিল, বিজয় সে দারুণ প্রহারে মৃত প্রায় হইয়া উঠিল! নিদারুণ প্রহার করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবা মাত্র সে সাধ্য মত দ্রুত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

তখনও বিরজার মোহ ভঙ্গ হয় নাই, আগন্তুক বিরজার চখে মুখে জল দিলেন, থাকিয়া থাকিয়া সেই বদন কমল চুম্বন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে বিরজার জ্ঞান হইল, বিরজা চক্ষু উন্মীলন করিয়া সভয়ে ডাকিল "নাথ, অম্বিক্!"

অম্বিকা। কেন বিরজা।

অম্বিকা আবার বিরজার মুখ চুম্বন করিলেন। বিরজা দেখিলেন, অম্বিকার চক্ষু রক্তবর্ণ, বদন মণ্ডল রক্তাভ, বুঝিলেন যে ভয়ানক রাগ বশতই এরূপ হইয়াছে। বিরজা স্বামীর উরসে আপন মস্তকটী রক্ষিত করিয়া তাঁহার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। বিরজা যেন স্বর্গ সুখ আস্বাদন করিল, তাহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হইতে লাগিল।

ভারত-রহস্য। *

পুস্তকের নাম শুনিয়া অনেক পাঠক হয়ত এই পুস্তক মধ্যে কত বেলগুী স্রোত, কোথাও ভরা গঙ্গার একটানার মত কোথাও বা ফাল্গুর ন্যায় অন্তঃসলিলা প্রবাহিত হইতেছে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এখানি তাঁহাদের জন্য রচিত হয় নাই। যাঁহারা অধঃপতিত ভারতের পূর্ব্ব মহিমা অনুসন্ধান করিতে উৎসুক, যাঁহারা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের অনন্ত মহিমার কথা মাত্রও জানিতে পারিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হন, যাঁহারা লুপ্তপ্রায় যাগযজ্ঞ ও ধর্ম্মকার্য্য ইত্যাদির ইতিবৃত্ত ও ইতিকর্ত্তব্যতা জানিতে উৎসুক তাঁহাদের পক্ষে এ পুস্তক খানি অমূল্য নিধি।

গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামদাস সেন সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, তাঁহার আর নূতন করিয়া কোন শিক্ষিতের নিকট পরিচয় দিতে হইবে না। আর এক কথা—রামদাস বাবু একখানি নূতন পুস্তক লিখিয়াছেন, একথা বলিলে অনেকেই বলিবেন যে উহা ভালই হইয়াছে, তিনি বাজে কথা লিখিতে জানেন না, বস্তুতঃ ইহা সাধারণ গৌরবের কথা নহে। সুতরাং পুস্তকখানি যে ভালই হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

এই পুস্তকখানি সংকলন করিতে যে রামদাস বাবুকে, যথেষ্ট ব্যয়, যথেষ্ট পরিশ্রম, এবং প্রচুর অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া নানাবিধ পুরাতন পুস্তকাদি হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে তাহা পুস্তক খানি হাতে পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। শুদ্ধ এই খানি নয়, তাঁহার সকল পুস্তক গুলিই এইরূপ।

পুস্তকখানিতে সোমযাগ, আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, অসি, দেবযান, রাজসূয়যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, পুরুষমেধযজ্ঞ, রাজাভিষেক, যুদ্ধরহস্য

---

* প্রথম ভাগ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামদাস সেন কর্ত্তৃক প্রণীত। বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত এবং শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বহরমপুরে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

এবং যুদ্ধ ধর্ম্ম প্রভৃতি কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, সকল গুলিতেই গ্রন্থকারের অসীম বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

আজকাল এই সাহিত্য সংসারে রামদাস বাবু ব্যতীত লুপ্ত প্রায় পূর্ব্ব পুরুষগণের সুকীর্ত্তি ও ভস্মাচ্ছাদিত ঐতিহাসিক রত্ন বাছিয়া বাছিয়া আর কেহ ভারত সন্তানকে সযত্নে দেখাইয়া তাহার হৃদয়ে সন্তোষের মধুর ক্রীড়ার মোহন ছটা দেখাইতে শিখেন নাই। অটুট যত্নে বিপুল পরিশ্রমে আর কেহ কর্কশ শাস্ত্রানুশীলনে আপন মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিতে প্রয়াসী হননা, বস্তুত রামদাস বাবু যাহা করিয়াছেন অনেকে অনেক পরিশ্রম, অনেক যত্নে তাহা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। আমরা গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি এবং মনে মনে গ্রন্থকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়াছি। পুস্তকের পত্রে পত্রে প্রচুর মাহার্ঘ প্রবালাদি মনিমাণিক্যের সমবেশে গ্রন্থকার যে বিদ্যারত্নে, পুরাবৃত্তানুসন্ধানে কিরূপ ধনী তাহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ধনীর কৃপণতা বড় দোষ, আশা করি রামদাস বাবু চির দয়ালু রহিলেন, এবং আমরা সত্বর ইহার দ্বিতীয় ভাগ দেখিয়া সুখী হইব।

পুস্তক খানির অতি বিস্তৃত সমালোচনা করা অপেক্ষা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলে পাঠকগণের পরিতোষ হইবে বলিয়া আমরা "আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র" ইত্যভিধেয় প্রবন্ধটী তাঁহাদিগকে উপহার দিলাম। স্থানাভাব বশতঃ সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইল না, কেবল ব্যাখ্যা দেওয়া গেল। কিন্তু যাহারা গ্রন্থখানির সুপরিচয় গ্রহণ করিতে উৎসুক, যাঁহাদের প্রাণ বঙ্গ ভাষায় কোন উৎকৃষ্ট উপাদেয় পুস্তক দেখিলে পুলকে পূর্ণ হয়, তাঁহারা যেন এখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে বিস্মৃত না হন।

আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র।

আর্য্যেরা যখন ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের যে সমূহ উন্নতি হইয়াছিল এবং, কি শিল্প, কি, কি বাণিজ্যক্ষমা

সকল বিষয়েই যে তাঁহারা পারদর্শী ছিলেন, তাহা আর্য্য শাস্ত্র দেখিলেই অনুভূত হয়। তাঁহারা সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞ জপ হোমাদি পারলৌকিক কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু সংগ্রাম উপস্থিত হইলেই অমনি লৌহময় কবচে আবৃত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রু জয়ার্থ বহির্গত হইতেন। সৈন্য, সেনাপতি, ইষু, ধনু, অস্ত্র, শস্ত্র, রথ, সারথি, ইত্যাদি বহু সংগ্রামিক শব্দ ঋগ্বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। সুতরাং তৎকালেও যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষ ছিল ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারতাদির সময়ে এই বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। রামায়ণাদি গ্রন্থে যে সকল যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা এক্ষণে কাল-কবলে কবলিত হইয়াছে। সে সকল যে কি রূপ ছিল, তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। ধনুর্ব্বেদ শুক্রনীতি, বৈশম্পায়ন-নীতি, অগ্নিপুরাণ, কামন্দক প্রভৃতি প্রাচীন রাজনৈতিক গ্রন্থের দ্বারা এক্ষণে কতিপয়মাত্র অস্ত্রের স্বরূপ জানা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ আমোদ আছে বলিয়া অদ্য আমরা সেই লুপ্ত যুদ্ধাস্ত্রের স্বরূপাদি বর্ণন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

ধনু, ইষু ভিন্দিপাল, শক্তি, দ্রুঘণ, তোমার, নলিকা, (নাল, নালিক, এই দুই নামও আছে,) লগুড়, পাশ, চক্র, দন্তকণ্টক, ভুসুণ্ডী, পরশু, গোশীর্ষ, অসি, কুন্ত, লবিত্র, স্থূণ, প্রাস, পিণাক, গদা, মুদ্গর, সীর মুসল পট্টিশ, পরিঘ, ময়ূখী, শতঘ্নী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র কালচক্র, ঐন্দ্র-চক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণপাস, বায়ু-অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শির, বিদ্যা, অবিদ্যা, গান্ধর্ব্ব, নন্দন, বর্ষণ, শোষণ, প্রস্বাপন, প্রশমন, সন্তাপন, বিলাপন, নাগাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নারাচ, জম্ভণ, প্রভৃতি শত শত অস্ত্রের নাম শুনা যায়, কিন্তু তত্তাবতের আকার প্রকার ও ব্যবহার প্রণালী কিছুই জানা যায় না। যাহা জানা যায়, তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

ধনু,—এটী অস্ত্র নহে, ইহা অস্ত্রক্ষেপক যন্ত্র। ইহার বৃত্তান্ত ধনুর্ব্বেদ নামক স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বলা যাইবে।

ইষু—ইহা একটি ধনুঃক্ষেপ্য অস্ত্রের সাধারণ নাম। যাহা তীর বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাই ইষু। ইহার বাণ, শর, খগ ও সায়ক প্রভৃতি অনেক নাম আছে। পূর্ব্বকার লেখা দেখিলে জানা যায় যে, ইহা ৪০০ হস্ত পরিমাণ দূরে

সবেগে যাইত। বাণের ৪০০হাত গতি হওয়া বড় সহজ নহে, অনেক বন্দুকের গতিও ৬০০ হাত হয় কি না সন্দেহ। শার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন যে, শিক্ষার সময় ৬০ ধনু, ৪০ ধনু, অথবা ২০ ধনু পরিমিত দূরে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা বিদ্ধ করিতে শিখিবেক।

ভিন্দিপাল—ইহা এক প্রকার হস্তক্ষেপ্য অস্ত্র। ইহার আকার কিরূপ? তাহা এক্ষণে বোধগম্য হইবার নহে। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে ইহার গঠন প্রণালী সম্বন্ধে যে একটি কবিতা আছে, তাহা এই—

ভিণ্ডিপাল, ভিন্দিবাল, ভিন্দিখাল, এই তিন পাঠই দৃষ্ট হয়। ভিণ্ডিপাল বা ভিন্দিপাল নামক শস্ত্রের শরীরটী বাঁকা, মাথাটী নোয়ান, মস্তকটী যেমন নম্র তেমনি শরীর অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার উচ্চতা এক হস্ত অর্থাৎ হস্ত পরিমিত লম্বা, এবং করপরিমিত অর্থাৎ মুঠা করিয়া ধরা যায় এরূপ ভাবের গোল গঠন। বর্ণনা দ্বারা অনুমান হয় যে, ভিন্দিপাল অস্ত্রটী আধুনিক সোঁটার ন্যায় হওয়াও হইতে পারে। এই শক্রনাশী আয়ুধকে পদাতি সৈন্যেরাই ব্যবহার করিত, অন্যূন তিন বার ঘুরাইয়া ইহাকে ছুড়িয়া ফেলিতে হয়।

অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদে ভিন্দিপাল ব্যবহারের প্রণালী ইহা অপেক্ষা অন্য রূপ লিখিত হইয়াছে।

* * * *

শক্তি—এই অস্ত্রের আকার সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহাও লিখিতেছি।

এ বর্ণনা দেখিয়া শক্তির প্রকৃত গঠন বা আকার স্থির করা যায় না। এক্ষণে আমরা যেরূপ ভাবের সংস্কৃত অবগত আছি, তদনুরূপ প্রথায় ইহার বঙ্গানুবাদ করিলাম, যদি কেহ পারেন ত বুঝিয়া লইবেন।

শক্তি অনধিক দুই হাত লম্বা। সিংহের ন্যায় মুখ। জিহ্বা আছে, তাহা অতি তীক্ষ্ণ। নখর আছে, তাহও তীক্ষ্ণ। ধরিবার মুট্ বা স্থানটী বৃহৎ। দেখিতে অতি ভীষণ, ঘণ্টানাদের দ্বারা ভয়জনক, শক্রদের রঞ্জিতাঙ্গ, অস্ত্রজালে বিজড়িত, গাঢ় নীলবর্ণ, অত্যন্ত দূরগামিনী, তির্য্যক্ গতি যুক্ত, এবং পর্ব্বতেন্দ্র হিমগিরিকেও বিদীর্ণ করিতে সক্ষম, যুদ্ধে জয়দায়িনী, এতদ্রূপিণী শক্তিকে দুই হস্তে উঠাই প্রেরণ করিতে হয়।

এই ঘোররূপিণী শক্তি ছয় প্রকার মার্গ অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রিত। প্রথম ক্রিয়া উত্তোলন, দ্বিতীয় ভ্রমণ, অর্থাৎ ঘূরণ, তৃতীয় বলগন অর্থাৎ আস্ফালন চতুর্থ নামন অর্থাৎ উর্দ্ধে আস্ফালিত করিয়া নীচুবাগে ধরা, পঞ্চম মোচন অর্থাৎ লক্ষ্যোপরি নিক্ষেপ, ষষ্ঠ ভেদন অর্থাৎ লক্ষ্যের অঙ্গ ভেদ, এই ছয় প্রকার শক্তিকার্য্য বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদেও লিখিত আছে।

ক্রুঘণ—এই অস্ত্রটী দুই প্রকার। ক্রুঘণ বলিলে সাধারণতঃ মুদ্গর বিশেষ বুঝায়, কিন্তু বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদের বচন পর্য্যালোচনা করিলে ইহা এক প্রকার পরশু অর্থাৎ টাঙ্গী বা কুঠারাস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হয়।

ক্রুঘণ অস্ত্রটী লৌহময়, ইহার গ্রীবাস্থানটী বাঁকা, শীর্ষ স্থান প্রশস্ত, ৫০ অঙ্গুল উচ্চ অর্থাৎ লম্বা, এবং মুষ্টিপরিমিত মণ্ডল অর্থাৎ গোল। এই ক্রুঘণ অস্ত্রের চারি প্রকার ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

উর্দ্ধে উঠান, প্রপাতন (ফেলিয়া মারা), স্ফোটন অর্থাৎ ফুটান, এবং দারণ অর্থাৎ বিদীর্ণীকরণ। এই চারি প্রকার কার্য্য ক্রুঘণের-আশ্রিত।

তোমর—এই তোমরাস্ত্র সম্বন্ধে তিন প্রকার উল্লেখ দেখা যায়। বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্ব্বেদ অনুসারে ইহা এক প্রকার লৌহফলক ও কাষ্ঠ-দণ্ডযুক্ত তীর। শার্ঙ্গধর সংগ্রহীত ধনুর্ব্বেদের মতে ফলবিশিষ্ট শলাকাকার লৌহতীর এবং অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদের মতে সরলপক্ষযুক্ত তীর। ফল সকল মতেই ইহা ধনুঃক্ষেপ্য তীরই হইতেছে। ইহার আকার সম্বন্ধে প্রথমোক্ত ধনুর্ব্বেদে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই—

তোমরের শরীরটি কাষ্ঠনির্ম্মিত, তাহার শীর্ষক অর্থাৎ ফলা লৌহময়, হস্তত্রয়পরিমাণ লম্বা, রক্তবর্ণ ও পুঙ্খধারী। ইহার গতি অবক্র অর্থাৎ সরল। এই মর্ম্ম বাজায় রাখিয়া শার্ঙ্গধর একটা অতিরিক্ত কথা বলিয়াছেন।

অর্থাৎ ফণিফণাকার ফলাযুক্ত লৌহতীরের নাম তোমর, অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদে ইহার আকার বা গঠন ভঙ্গী লিখিত হয় নাই, কিন্তু ক্রিয়াগুলি সমস্তই লিখিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন মুনির লিখিত তোমরাস্ত্রের কার্য্যও তিন প্রকার।

শস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ রাজারা বলেন যে, তোমরের তিন প্রকার কার্য্য। প্রথমে

উদ্ধান (ঊর্দ্ধীকরণ), দ্বিতীয় বিনিযুক্তি অর্থাৎ প্রয়োগ এবং তৃতীয় বেধন অর্থাৎ লক্ষ্যশরীরে ছিদ্রীকরণ।

নলিকা।—এই অস্ত্রের নলিকা, নালীক, নাল, এই তিনটী নাম আছে। বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্ব্বেদ, অসুরাচার্য্য শুক্র ঋষির নীতিশাস্ত্র, শার্ঙ্গধর-সংগৃহীত ধনুর্ব্বেদ ও বীরচিন্তামণি প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে ইহার বিস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়, এবং বিশ্বামিত্র-প্রণীত ধনুর্ব্বেদের মধ্যেও ইহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়াও যায়। মহাভারতের অনেক স্থানেই এই নালিকাশাস্ত্রের উল্লেখ আছে, রামায়ণেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় †; তাহাতে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে অসুরেরা এই অস্ত্র ব্যবহার করিত। এই অস্ত্রের আকার প্রকার বর্ণনা দেখিলে আধুনিক বন্দুকের আকার প্রকারের সহিত বড় অধিক ভিন্নতা থাকেনা।

নলিকাস্ত্রের কায়া ঠিক্ সোজা ও সরু (নলের ন্যায় গঠন বলিয়া নলিকা।) ইহার মধ্যে বন্ধ আছে, বর্ত্তনাল এবং ইহা হইতে অয়ঃকণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র লৌহগুলিকা তীরের ন্যায় সবেগে প্রেরিত হইয়া শত্রুর মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া থাকে। এই বর্ণনার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহা এক প্রকার বন্দুক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলেও বন্দুক বলিয়া প্রতীত হইবে। যথা—

প্রথমে গ্রহণ, পরে ধ্মাপন অর্থাৎ প্রজ্বলিত করণ পশ্চাৎ স্যুত অর্থাৎ বিদ্ধকরণ। এই ত্রিবিধ ক্রিয়া নলিকার আশ্রিত, ইহা জানিলে আসন্ন শত্রুকে অনায়াসে জয় করা যায়।

---

† ইহা নীতি প্রকাশিকার এক অংশ। মহর্ষি বৈশম্পায়ন স্বকৃত নীতিপ্রকাশিকায় যে ধনুর্ব্বেদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই আমরা এস্থলে তদুক্ত ধনুর্ব্বেদ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ ডাক্তর গষ্টেভ্ ওপার্ট মহোদয় উল্লিখিত গ্রন্থখানি অতি পরিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত করিয়া আর্য্যসমাজের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকা হইতে আমরা কতিপয় বৈদিকপ্রমাণ গ্রহণ করিলাম।

শার্ঙ্গধর-সংগৃহীত ধনুর্বেদে ইহাকে নালীক-শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাও এই নলিকা বা বন্দুক ভিন্ন অন্য কিছু নহে বলিয়াই বোধ হয়, যথা—

'নালীক বাণ লঘু অর্থাৎ ছোট বা সরু। এই লঘুনালীক নামক বাণ নলযন্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। উহা উচ্চ ও দূরলক্ষ্য স্থলে এবং দুর্গযুদ্ধে প্রয়োজনীয় বা প্রশস্ত।

এই নালিকাস্ত্রের বৈদিক নাম "সূর্ম্মী"। তৎকালের অসুরেরা সূর্ম্মী লইয়া দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিত। অনেক বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্টান্তবিধায় ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক কোষ গ্রন্থে "সূর্ম্মী" শব্দ লৌহ-প্রতিমূর্ত্তি অর্থে নির্দিষ্ট দেখা যায়, কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে উহা লৌহ-স্থূণা বা স্থূণাকার মন্ত্রবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। (তান্ত্রিকদিগের মতে প্রতিমা ও মন্ত্র, এই দুই শব্দের অর্থ অভিন্ন, অর্থাৎ তাঁহারা পূজার সাধ্যকে মন্ত্র বলেন, প্রতিমাও বলেন, সুতরাং সূর্ম্মী শব্দটী লৌহ মন্ত্র অর্থে ব্যবহার অসঙ্গত নহে।)

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে (১।৫।৬।৭) সূর্ম্মী শব্দ আছে, তাহার ভট্টভাস্করকৃত ব্যাখ্যা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, পূর্ব্বে এ দেশের অসুরেরা এক প্রকার বন্দুক ব্যবহার করিত। সে বন্দুক এখনকার মত আকার বিশিষ্ট নহে, অন্য এক সামান্য আকার বিশিষ্ট। যথা—

*   *   *   *

(কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ১।৫।৬।৭। দেখ)

এস্থলে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা এইরূপ—

অর্থ এই যে, সেই লৌহময়ী স্থূণা যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র,—তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন,—যাহা বাহিরাগত হয় তাহাও জলন্ত এই ঋক্ মন্ত্রটীও সেই লৌহময়ী জ্বলন্ত স্থূণার ন্যায় জানিবে। অসুরগণের মধ্যে যাহারা সূর্ম্মীর দ্বারা যুদ্ধ করে—এক আঘাতে শত শত্রু বিনাশ করে,—দেবতারাও তেমনি তাহাদিগকে মারিবার জন্য শতঘ্নী বজ্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ঋক্ মন্ত্র সেই শতঘ্নী বজ্রের বা সূর্ম্মীর তুল্য। যে যজমান অর্থাৎ যে যজ্ঞকর্তা, এই ঋকের দ্বারা সমিদাধান (অগ্নিতে আহুতিদান) করেন, তিনিও এই শতঘ্নী অর্থাৎ শতশত্রু নাশক বজ্র বা সূর্ম্মী উদ্ধৃত করিয়া শত্রুর প্রতি ঋক্ বা মন্ত্ররূপ প্রহরণ প্রহার করিতে সমর্থ হন। এতদ্ভিন্ন

অথর্ব্ববেদের (১।১৬।৩।৪।) এক স্থলে এক একটী উদাহরণ আছে, তাহাতে সীসক দ্বারা শত্রুবিনাশের কথা আছে।

এখন বিবেচনা করুন, লৌহনির্ম্মিত স্থূণা অর্থাৎ লম্বা খোঁটা, তাহার মধ্যে সুষির বা রন্ধ্র, তাহা হইতে প্রজ্বলিত পদার্থ বহির্গত হয়, তাহা আবার এক কালে শতশত্রু বিনাশ করে, আবার সীসকের দ্বারা শত্রু বিনাশ। এরূপ বর্ণনার দ্বারা বন্দুক বা কামান ভিন্ন আর কি উপলব্ধি হইতে পারে? এই বর্ণনা দেখিয়া যদি সূর্ম্মী বা নালিকাস্ত্রের আকার কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে, * * এইরূপ আকার হয় কি, না দেখুন। ঐরূপ দেখিলে বন্দুক ভিন্ন আর কি মনে হইতে পারে? অতএব বোধ হয়, এই সূর্ম্মী বা নালিকাস্ত্রের ক্রমিক উৎকর্ষেই আধুনিক বন্দুক ও কামান হইয়াছে, সুতরাং বন্দুককে বা কামানকে সম্পূর্ণরূপে নবাবিষ্কৃত বলা যায় না। ইহা যে কত পুরাতন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেননা, অসুরগুরু মহর্ষি শুক্র এই নালিকাস্ত্রের বিষয় বিশেষরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিলে আর কোন সংশয়ই থাকে না। কোন রূপ কল্পনা করিতেও হয় না। বৈদিক গ্রন্থের ও ধনুর্ব্বেদের বচনাবলি তত স্পষ্ট নহে বলিয়া অনেক অনুমানের বা কল্পনার সাহায্য লইতে হয়, কিন্তু শুক্রনীতির বচনাবলি দেখিলে আর কিছুই করিতে হয় না।

অসুরগুরু উশনার নীতিশাস্ত্র,—যাহার উল্লেখ মহাভারতেও আছে,—তাহার ৪ অধ্যায়ের ৭ম প্রকরণে নালিকাস্ত্রের উত্তমরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অসুরাচার্য্য শুক্র বলিতেছেন যে, যুদ্ধাস্ত্র প্রধানতঃ দুই প্রকার। নালিক ও মান্ত্রিক। যাহাদিগকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহারা মান্ত্রিক। মান্ত্রিকাস্ত্র না থাকিলে নালিকাস্ত্র ব্যবহার করিবেক। নালিকাস্ত্র কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে। নালিক দুই প্রকার। এক বৃহন্নালিক, অপর লঘু বা ক্ষুদ্রনালিক। লঘুনালিকের লক্ষণ এইরূপ,—পঞ্চ-বিতস্তি পরিমাণ (৪ হাত লম্বা) একটী নাল বা নল (লৌহনির্ম্মিত), তাহার মূলে তির্য্যক দিকে (আড়ভাবে) একটী ছিদ্র, মূল হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃ সুষির (গর্ত্ত), মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু (মাছী), যন্ত্রের আঘাত পাইবা মাত্র অগ্নি নির্গত হয়, এরূপ প্রস্তরখণ্ডযুক্ত,

সেই স্থানে অগ্নি চূর্ণের (বারুদের) আধার স্বরূপ একটী কর্ণ, উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ ধরিবার মুট,—এতদ্রূপ নালাস্ত্রের মধ্যগর্ত্তের পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলী, অর্থাৎ তর্জ্জনীনামক অঙ্গুলিটী প্রবেশ করিতে পারে এরূপ গর্ত্ত,—তাহার ক্রোড়ে অগ্নিচূর্ণ প্রোথিত করণের দৃঢ় শলাকা,—এরূপ নালাস্ত্রের নাম লঘুনালিক। এই লঘুনালিক পদাতি সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যেরাই ব্যবহার করিবেন।

শুক্রাচার্য্য-প্রোক্ত নালিকাস্ত্রের এতদ্রূপ বর্ণনা দেখিলে সাবেক বন্দুকের আকার মনে আইসে কি, না, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বকালের বন্দুক আর অতি পূর্ব্বকালের লঘুনালিক এবং এক্ষণকার কামান আর অতিপূর্ব্বকালের বৃহন্নালিক সমান। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে তিনটী শ্লোকের দ্বারা বৃহন্নালিকের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আধুনিক কামান ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না।

উক্ত নালিকাস্ত্রের ত্বক্ যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন যত বড় হইবে তাহার গর্ত্ত যত স্থূল (মোটা) হইবে, তাহার গোলা যত বড় হইবে,—সে ততই দূরভেদী হইবে। তাহার মূলদেশে কীলক, এবং কাষ্ঠ বুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ধরিবার মুট নাই, শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতির দ্বারা বাহিত হয়। ইহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয়প্রদ হয়। ইহার নাম বৃহন্নালিক।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, শুক্রাচার্য্যের এই বৃহন্নালিক আর এক্ষণকার কামান সমান কি না। অপিচ, নালাস্ত্রের ধারণ, পরিচালন ও প্রয়োগপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে উহাকে আধুনিক বন্দুক ও কামান না বলিয়া থাকা যায় না। যথা,—

প্রথমে নালাস্ত্রের সংশোধন করিবেক। পরে তাহাতে অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ প্রদান করিবেক। অনন্তর দণ্ডের দ্বারা সেই প্রদত্ত বারুদ'কে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবেক। পরে তাহাতে গুলিকা বা গোলা প্রদান করিবেক। অতঃপর কর্ণপ্রদেশে অগ্নিচূর্ণ স্থাপন করিয়া তাহাতে যন্ত্রপ্রস্তরাগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ গুলিকে লক্ষ্য স্থানে পাতিত করিবেক।

উল্লিখিত অগ্নিচূর্ণ যে, "বারুদ" তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, কিরূপে অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়, কিরূপে বা গুলি প্রস্তুত করিতে হয়,

মহর্ষি তাহাও বলিয়াছেন। সে সকল দেখিলে নালাস্ত্রকে বন্দুক এবং অগ্নিচূর্ণকে "বারুদ" না বলিয়া থাকা যায় না। যথা—

*　　*　　*　　*

ইহার অর্থ এই যে, সুবর্চ্চিলবণ অর্থাৎ সোরার ৫ পল, গন্ধক ১ পল, অন্তর্ধূমবিপক্কস্নুহী অঙ্গার অথবা অর্কাঙ্গার* ১ পল সংশোধন পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিবেক। পশ্চাৎ একত্রিত করিয়া তাহা এরূপ ভাবে পেষণ করিবেক, যেন পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়। অনন্তর সেই চূর্ণে, সিজ বৃক্ষের আটা বা রস, আকন্দের আটা বা রস ও রসুনের রস দিয়া পেষণ করিবেক। অনন্তর তাহাকে রৌদ্রশুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার পেষণ করিবেক। পেষণ করিলেই শর্করা অর্থাৎ বালুকার ন্যায় অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত হইবেক।

দ্বিতীয় প্রকার।

গন্ধক ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অঙ্গার সমভাগে লইয়া তাহাতে ৬ বা ৪ ভাগ সুবর্চ্চিলবণ অর্থাৎ সোরার মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে নালাস্ত্রের নিমিত্ত অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবেক।

তৃতীয় প্রকার।

তৃতীয় বিধিতে বলা হইয়াছে যে, অঙ্গার, গন্ধক, সোরার, মনছাল, হরিতাল, সীসকের মল, হিঙ্গুল, উত্তম লোহার মল, কর্পূর, জতু বা গালা, নীলী, ধুনা এই সকল দ্রব্যের কোন কোন দ্রব্য সমভাগে, কোন কোন দ্রব্য অল্প ভাগে এবং কোন কোন দ্রব্য অধিক ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক প্রকার অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যাহারা অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত

---

* সিজবৃক্ষের নাম স্নুহী। আকন্দের নাম অর্ক। সিজবৃক্ষের কাষ্ঠ কিংবা আকন্দকাষ্ঠ অথবা তদ্রূপ হাল্কা অন্য কোন কাষ্ঠ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধূম বাহির হইয়া না যায়, এরূপ ভাবে তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবে। কোন দ্রব্যের দ্বারা ঢাকিয়া দিলেই অঙ্গার গুলি অন্তর্ধূমবিপক্ক হইবে।

করণে পণ্ডিত, তাহারা উল্লিখিত দ্রব্যের ভাগবিশেষ অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার আভাযুক্ত বা নানাবর্ণের অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। †

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, অগ্নিচূর্ণ আর বারুদ, একই বস্তু কি না। গোলা ও গুলিকা প্রস্তুত করণের সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে তাহাও বলিতেছি।

* * * *

ইহার অর্থ এই যে, বৃহৎ নালকের জন্য লৌহের গোল প্রস্তুত করিবে। তাহা সগর্ভ অথবা কেবল অর্থাৎ নিরেট উভয়বিধই করিবেক। সগর্ভ গোলের গর্ভে ক্ষুদ্রগুলিকা প্রভৃতি পূর্ণ করা যাইতে পারে। আর লঘু নালিকের জন্য সীসকের কি অন্য কোন ধাতুর দ্বারা নালছিদ্রের উপযুক্ত গুলিকা প্রস্তুত করিবেক। নালাস্ত্র গুলি লৌহসার দ্বারা কি অন্য কোন কঠিন ধাতুর দ্বারা নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। * দানবগুরু শুক্রাচার্য্যের নালিকাস্ত্র যখন ব্যাসের মহাভারতে আছে, তখন ইহা কখনই আধুনিক নহে।

† এই বিধি অনুসারে বড়দার আলোক ও বারুদ প্রস্তুত হয়। অঙ্গারের ভাগ না দিলেই তাহাতে উত্তম আলোক প্রস্তুত হইবে।

* এই সকল দেখিয়াও হয়ত অনেকের মনে ইহার পুরাণত্বে বিশ্বাস হইবে না। সে জন্য নিম্নে আরও কএকটী প্রমাণ প্রদত্ত হইল।

বৃদ্ধশার্ঙ্গধরকৃত বীরচিন্তামণিগ্রন্থে এই নালিক অস্ত্রের আকার প্রকার বর্ণিত আছে। যথা—

* * * *

লঘুনালিক বাণ অর্থাৎ ক্ষুদ্রনালিকাস্ত্র সকল নলাকার যন্ত্রের দ্বারা বিনিক্ষিপ্ত হয়। এ অস্ত্র উচ্চস্থ ও দূরস্থ লক্ষ্যের ও দুর্গযুদ্ধের উপযুক্ত।

মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে লিখিত আছে। বনপর্ব্বীয় হিরণ্যপুর ধ্বংস প্রকরণে "নালিক" এই বিস্পষ্ট নাম আছে। যথা—

* * * *

অর্জ্জুন বলিলেন হে রাজন! পরে সেই হিরণ্যপুরবাসী প্রভূতপরাক্রম ক্রুদ্ধ দানবেরা আমাকে নালীক, নারাচ ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টী ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা আহত করিতে লাগিল।

মহাভারতের অন্য স্থানে এই নালিকাস্ত্র "অয়ঃকণপ" ও "কণপ" নামে উল্লিখিত হইতে দৃষ্ট হয়।

টীকাকার নীলকণ্ঠভট্ট এই "অয়ঃকণপ" শব্দকে নালিক শব্দের পর্য্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রামায়ণেও এই নালিকাস্ত্রের প্রযোগ দেখা যায়।

* * * *

এ সকল আলোচনা করিলে, বন্দুকের পূর্ব্বাস্তিত্ব পক্ষে বুদ্ধির গতি উপস্থিত হয় কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। বীরচিন্তামণি, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, শুক্রনীতি প্রাচীন গ্রন্থে যখন নালিকাস্ত্রের বর্ণনা আছে, তখন আর ইহাকে কি বলিয়া আধুনিক বলিতে পারি। এ সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পুরাকালে ইহা সকলে জানিত না। দেবতারা ও প্রধান প্রধান আচার্য্যেরা উক্ত অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করায় কোন বিশেষরূপ পুরুষত্ব নাই বলিয়া এবং কূট যুদ্ধের উপকরণ বলিয়া উহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ঋষিকে স্বকৃত ধনুর্ব্বেদের ৫ অধ্যায়ে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিতে দেখা যায়। যথা—

হে মহারাজ জনমেজয়! কলিকালের পৌরুষহীন অধার্ম্মিক রাজাদিগের সমর মদ্রক্ত গুলিকাক্ষেপক যন্ত্র, প্রস্তরক্ষেপক যন্ত্র, এবং অপরাপর কৃত্রিম যন্ত্র সকল কূট যুদ্ধের উপকরণ হইবে। যতই অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, ততই লোক কূটযুদ্ধ ও তদুপযুক্ত প্রহরণের আশ্রয় লইবেক।

পূর্ব্বকালের বীরেরা কূটযুদ্ধ করিতেন না বলিয়া এ অস্ত্র তাঁহাদের নিকট পরিত্যক্ত প্রায় ছিল, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ দুর্গের মস্তকে ও রথের ভিত্তিতে বৃহন্নালিক সকল রক্ষিত থাকিত, এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। রামায়ণোক্ত রাবণের দুর্গবর্ণন, মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারকার দুর্গবর্ণন দেখিলে পাঠক মাত্রেরই সংশয়চ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। বৃহন্নালিক অর্থাৎ আধুনিক কামানের ন্যায় আগ্নেয়যন্ত্র যে পূর্ব্বে ছিল, তাহা বনপর্ব্বোক্ত মাতলিক-আগমন প্রস্তাব পাঠ করিলেই সপ্রমাণ হইবেক। এই বৃহন্নালিক অস্ত্রটী তথায় "তুলাগুডা" নামে লিখিত আছে।

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার স্বর্গ গমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। মহারাজ! অতঃপর মাতলি সেই অদ্ভুত জৈত্র-রথ গ্রহণ পূর্ব্বক মৎসকাশে সমাগত হইলেন। সেই রথে অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, অশনি অর্থাৎ বজ্র, বায়ুস্ফোটযন্ত্র, * নির্ঘাত অর্থাৎ জ্বলদুল্কাপিণ্ডযুক্ত এবং মহামেঘের ন্যায় শব্দকারী চক্রযুক্ত "তুলাগুড়া' প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল।

ব্যাখ্যাকার নীলকণ্ঠ ভট্ট এই "তুলাগুড়া" শব্দের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহাতে তুলাগুড়াকে কামান ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

ভাবিয়া দেখুন যে, পূর্ব্বকালের তুলা নামক পরিমাণ-দণ্ডের এতদ্রূপ আকার বিশিষ্ট গোলনিক্ষেপক একটি পাত্র, তাহা আবার অগ্নেয়দ্রব্য-বলে নিক্ষিপ্ত হয়, বায়ু উৎপাদন করে, বজ্রধ্বনির ন্যায় বা মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হয়, তাহা আবার চক্রযুক্ত অর্থাৎ চাকাওয়ালা; —এরূপ বর্ণনা শুনিলে তাহাকে কামান ভিন্ন আর কি অনুমান করা যাইতে পারে? যাহাই হউক, উল্লিখিত শুক্রনীতি গ্রন্থখানি কত পুরাতন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

শুক্রনীতি সম্বন্ধে যেরূপ প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত গ্রন্থখানি মহাভারত অপেক্ষাও পুরাতন। কেন না, মহাভারতের শত শত স্থানে "শুক্রের নীতি" "শুক্রের বাক্য" "শুক্রের উক্তি" এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ যে সকল শ্লোক লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই আমরা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। ইচ্ছা হইলে পাঠকগণ মিলাইয়া দেখিতে পারেন। দিক্‌প্রদর্শনের নিমিত্ত আমরা তাহার ২।৪ টী প্রতীক মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

* * * *

(সভা, বন ও উদ্যোগ পর্ব্বোক্ত বিদুর বাক্য সকল দেখ)

শুক্র ও বৃহস্পতি এই দুই মহর্ষিই নীতি-শাস্ত্রের আদি গুরু। শুক্রকৃত ও বৃহস্পতিকৃত নীতিশাস্ত্রের অনেক বচন মহাভারতে ও অন্যান্যপুরাণে সংগৃহীত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রতীক গুলির দ্বারা শুক্রাচার্য্যের নীতি-

* বায়ুস্ফোট শব্দ যদি তুলাগুড়ার বিশেষণ না হয়, তাহা হইলে উহা এক স্বতন্ত্র যন্ত্র হইবেক। অর্থাৎ কৌশলে বায়ুপূর্ণ করিয়া তাদ্দ্বারা গুলিকা নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র, এরূপ অর্থ হইবে।

শাস্ত্র থাকা সপ্রমাণ হইতেছে। ঐ সকল প্রতীক উচ্চারণের পরেই যে সকল নীতিকথা তত্তৎ স্থানে লিখিত হইয়াছে, সে সকল কথা শুক্র-নীতিতে অবিকলরূপে লিখিত আছে। সুতরাং গ্রন্থখানিকে মহাভারত অপেক্ষা নবতর বিবেচনা করা যায় না। এ বিষয়ে আমরা এতদধিক বাক্যব্যয় করিতে চাহি না। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক।

লগুড়।—ইহার পাদপ্রদেশ সরু মস্তক স্থূল, স্কন্ধ মোটা, অগ্রভাগটী লৌহের দ্বারা আবদ্ধ। অধিক লম্বা নহে পরন্তু উপযুক্ত রূপ মোটা। ইহার সর্ব্বাঙ্গ লোহার দণ্ড ও অত্যন্ত দৃঢ়। ইহা লম্বে ২ হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে।

এই লগুড় অস্ত্রের ক্রিয়া চার প্রকার। যথা—

উত্থান, পাতন, যাহাতে পড়িবে তাহার পেষণ ও শোধন। লগুড়ের এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া ভিন্ন পঞ্চমী ক্রিয়া নাই। দৃঢ়শরীর পদাতি সৈন্যেরাই ইহার দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকে।

পাশ—বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে পাশাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে তাহার সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে। উক্ত বর্ণনাদ্বয়দ্বারা অনুমান হয়, যে, পাশাস্ত্র দুই প্রকার ছিল। মহাভারতাদি গ্রন্থেও বারুণ পাশ ও ধনুর্ব্বেদের পাশ এইরূপ——

পাশ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত, ত্রিকোণযুক্ত, প্রাদেশপরিমিত পরিধিযুক্ত ও সীসক-গুলিকার দ্বারা সুশোভিত।

এতৎ সম্বন্ধে আগ্নেয়-ধনুর্ব্বেদের মত এইরূপ—

বৃত্ত অর্থাৎ গোল ও লম্বায় ১০ হাত, এরূপ পাশ গুণ রজ্জু, কার্পাস রজ্জু, মুঞ্জ নামক তৃণের রজ্জু, পশুবিশেষের স্নায়ু, আকন্দত্বকের সূত্র ও চর্ম্মবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দৃঢ় অথচ সূত্র প্রস্তুত হয়, এরূপ পদার্থের দ্বারা ও হইতে পারে। সূক্ষ্ম ৩০তন্তু একত্রিত ও সুবর্ত্তিত করিয়া অর্থাৎ উত্তমরূপে পাক দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। এই পাশাস্ত্রের ক্রিয়া এইরূপ—

অর্থাৎ ইহা কক্ষপ্রদেশে রাখা হয়, প্রয়োগের সময় কুণ্ডলাকৃতি করিয়া মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া প্রক্ষেপ করিতে হয়। এই অস্ত্রপ্রয়োগের ৩ তিন প্রকার গতি আছে। তাহাদের নাম বল্গণ, প্রবন ও প্রব্রজন।

ইহার দ্বারা ইচ্ছানুরূপ বন্ধন পূর্ব্বক স্বসকাশে আকর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ কৃপাণ দ্বারা বধ করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন ২৫০ অধ্যায়ে অন্যরূপ ক্রিয়া লিখিত আছে।

বৈশম্পায়নোক্ত পাশ, যাহা প্রথমে উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার কার্য্য এইরূপ -

অগ্রে প্রসারণ পশ্চাৎ তদ্দ্বারা শত্রুকে বেষ্টন, অনন্তর অস্ত্রান্তর দ্বারা কিত্তন। পাশের এই তিন প্রকার প্রয়োগ আছে এবং ইহা ক্ষুদ্রযোদ্ধার আশ্রিত।

অন্য এক প্রকার পাশ আছে, মহাত্মাগণ তাহার পাঁচ প্রকার কার্য্য নিশ্চয় করিয়াছেন। সে পাঁচ প্রকার প্রায় প্রথমোক্তের তুল্য।

চক্র—এইঅস্ত্র কুণ্ডলাকার অর্থাৎ [illegible] প্রান্তভাগ উত্তম শাননযুক্ত বা ধারাল। নীল-জলের ন্যায় বর্ণ এবং মণ্ডল। পরিমাণে দুই প্রাদেশ অর্থাৎ এক হস্ত।

ইহার কার্য্য পঞ্চবিধ। যথা—

গ্রন্থন, ভ্রামণ অর্থাৎ ঘুরাণ, ক্ষেপণ, কর্ত্তন ও দলিত করণ। চক্রের এই পঞ্চবিধ কার্য্য আছে।

আগ্নেয়-ধনুর্ব্বেদে এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

চক্রের কার্য্য ছেদন, ভেদকরণ, নিপাতন, ভ্রামণ, শমন বা শায়ন অর্থাৎ শায়িত করা, বিকর্ত্তন ও কর্ত্তন।

দণ্ডকণ্টক—ইহার গঠন সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। যথা—

ইহার কায়া বা শরীর দণ্ডাকার, তাহার সর্ব্বাঙ্গে লৌহের কাঁটা, আগা মোটা ও গোড়াসরু। বাহুপরিমাণ লম্বা, ধরিবার মুষ্টি অতি সুন্দর, এবং বর্ণ অঙ্গারতুল্য কৃষ্ণবর্ণ। ইহার নিক্ষেপ ও গ্রন্থন অর্থাৎ গাঁথিয়া ফেলা, এই দুই কার্য্য আছে।

ভুসুণ্ডী—এই অস্ত্রের আকার প্রকার ও কার্য্য এইরূপ—

অর্থাৎ ইহা বাহুত্রয় পরিমাণ লম্বা, বড় বড় গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁট আছে, স্থূল কায়, মুষ্টিদেশ উত্তম, এবং ইহার বর্ণ কৃষ্ণসর্পের ন্যায় উগ্রদর্শন। পাতন ও ঘূর্ণন, এই গাতদ্বয় ইহার অনুগত।

এ পর্য্যন্ত যে কএকটী অস্ত্রের কথা বলা হইল, এ সমস্তই মুক্তাস্ত্র অর্থাৎ এ সমস্তই ফেলিয়া বা ছুড়িয়া মারিতে হয়। যাহা অমুক্ত অর্থাৎ যাহা ফেলিয়া বা ছুড়িয়া মারিতে হয় না,—সেই সকল অমুক্ত অস্ত্রের বর্ণনা এক্ষণে শ্রবণ করুন। অমুক্ত অস্ত্রের মধ্যে বজ্রই সর্ব্বপ্রধান। বজ্র কি? তাহা উত্তমরূপ বুঝা যায় না, সুতরাং বুঝানও যায়না। তথাপি তদ্বোধক বাক্য গুলি অন্য প্রবন্ধে বলা যাউক। এক্ষণে "ইলী' প্রভৃতি কএকটী অমুক্ত অস্ত্রের বর্ণনা করা হইবে।

ইলী—ইহা উচ্চে দুই হাত, ইহার অগ্রে ভুগ্ন অর্থাৎ কোলকুঁজা, লৌহ ফলক আছে, তাহার বিস্তার ৫ অঙ্গুলি, বর্ণ শ্যাম, মুষ্টিদেশ করত্র বর্জ্জিত। (তরবারি প্রভৃতির মুষ্টিতে যে হস্তবেষ্টনার্থ এক প্রকার বেষ্টন বা প্যাঁচ থাকে, তাহার নাম করত্র)। ইহার কার্য্য সম্পাত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ ও প্রগ্রহ।

পরশু—বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদে ইহার যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তদনুসারে ইহাকে এক প্রকার টাঙ্গী বলিলেও বলা যায়। যথা—

* * *

অর্থাৎ একটী যষ্টির মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার লৌহ ফলক, তাহার আস্য বিস্তৃত, সম্মুখে মুখ, মুখ চক্চকে, কিন্তু অঙ্গ মলিন। মূলদেশে কসরু অর্থাৎ মুট আছে, এবং মস্তকে শিখা আছে। ইহার পরিমাণ বাহু অর্থাৎ বাহু-পরিমিত লম্বা পরশুর কার্য্য পাতন ও ছেদন। কিন্তু আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে ইহার আরও কএকটী কার্য্যের উল্লেখ আছে।

গোশীর্ষ ইহার আকার সম্বন্ধ এইরূপ লিখিত আছে।

* * * *

অর্থ এই যে, দেখিতে গোমস্তকতুল্য গোশীর্ষ নামক অস্ত্রের দুইটী পদ আছে। তাহার নীচে কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র সংলগ্ন থাকে এবং তাহার উৰ্দ্ধভাগ লৌহফলকে আবদ্ধ থাকে। মধ্যাঙ্গ ত্রিরশ্রি অর্থাৎ তে-শিরে, এবং তাহার ধারণের মুট অতি সুন্দর। তাহার বর্ণ কৃষ্ণরক্ত। ইহার উচ্চতা ১৬ অঙ্গুল অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন এক হস্ত। ইহার মধ্যভাগ স্থূল, কিন্তু অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ। পূর্ব্বে মহেন্দ্র এই অস্ত্র এবং এতদ্ভিন্ন মুদ্রিকা নামক

অস্ত্র মনুকে শিখাইয়াছিলেন। পরে তাহা এই মানবলোকে আসিয়াছে। যে রাজার এই অস্ত্রদ   কে, ইহলোকে তাহার প্রভুত্ব বিস্তার হয়। ইহার ক্রি·া এইরূপ—

মুষ্টিগ্রহ অর্থাৎ মুট্‌ধরা, প.· পরিক্ষেপ, পরিধি ও পরিকুন্তন বা পরিকুন্তন। কুন্তন পক্ষে বন্ধকরণ এবং কুন্ত   কে ছেদন করা, অর্থ এইরূপ অর্থ হয়।

অসিধেনু বা খড়্‌গপুত্রিকা— ·ার আকার প্রকার ও ক্রিয়া এইরূপ

*   *   *

অর্থাৎ অসিধেনু নামক অস্ত্রটী হস্তপ্রমাণ লম্বা, তলঅর্দ্ধিত কিন্তু সরু অর্দ্ধেক মুট আছে। বর্ণ শ্যাম। ক্রিধার ও বিস্তীর্ণতায় দুই অঙ্গুল। ইহার দ্বারা আসন্ন অর্থাৎ নিকটাগত শত্রু বিনষ্ট করা যায়। এই অসিধেনু যদি মেখলায় গ্রথিত (মেখলা—চেইন) থাকে, তাহা হইলে তাহাকে খড়্‌গপুত্র বলা যায়। এই দুই অস্ত্রের ক্রিয়া ত্রিবিধ। মুষ্টিগ্রহণ, বিদারণ ও বিদ্ধ করণ। প্রধান প্রধান রাজারা ইহা ধারণ করিয়া থাকেন।

লঘিত্র—এই অস্ত্রটীর আকার প্রকার ও ক্রিয়া এইরূপ—

লঘিত্রের কায়াটী ভুগ্ন অর্থাৎ বক্র (কোলকুঁজো)। পৃষ্ঠভাগ স্থুল ও গুরুভাবযুক্ত। সম্মুখ ভাগ তীক্ষ্ণ অর্থাৎ ধারাল। ইহার ব্যাস ৫ অঙ্গুল, এবং বর্ণ কাল। ইহার মুট অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষ প্রভৃতি কর্ত্তিত করা যায়। দুই হাতে উত্থান ও প্রহার, এই দুই ক্রিয়া ভিন্ন ইহার তৃতীয় ক্রিয়া নাই।

আস্তর—ইহার পদদেশ গ্রন্থিল, মস্তক দীর্ঘ, কর অর্থাৎ পাতা বিস্তীর্ণ, হস্ত, উদর ও মস্তক বক্র, বর্ণ কৃষ্ণ, পরিমাণ ২ হস্ত। হরণ ও ছিন্ন করণ এই কএক প্রকার ক্রিয়া ইহাতে সাধিত হয়। ইহার দ্বারা যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করিবেক এবং অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যেরাই ইহা ধারণ করিবেক

কুন্ত—এই অস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, শৃঙ্গ অর্থাৎ অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ষড়শ্রি অর্থাৎ ছয় পোয়ালে। ৫ হাত লম্বা এবং পদদেশ বৃত্ত অর্থাৎ গোল এবং দেখিতে ভীষণ, উড্ডীন, অবডীন, নিডীন, ভূমিলীন, তির্য্যক্‌লীন, ও নিখাত অর্থাৎ খনন,—এই ছয় প্রকার ক্রিয়া ইহার আশ্রিত।

উড্ডীন নিড্ডীন প্রভৃতি সঞ্চরণ বিশেষের নাম। এই অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইলে বিবিধ পক্ষিজাতির ন্যায় গতি অবলম্বন করিতে হয়। যথা—

*   *   *

অসুরাচার্য্য শুক্রও স্বকৃত নীতিগ্রন্থে ইহার আকার প্রকারের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ইহা হইতে স্বতন্ত্র। শুক্রপ্রোক্ত কুন্ত আর বর্ষা বা বড়শা সমান। যথা—

*   *   *

লম্বে ৭ হাত এক গাছ বাঁশ—তাহার মস্তকে লোহার তীক্ষলৌহ শলাকাফলের নীচে ও মূলে কেশগুচ্ছকে সুশোভিত। এতদ্রূপ কুন্ত অস্ত্রের ৪ প্রকার আকর্ষণ বিকর্ষণ, ধুনন অর্থাৎ ইতস্ততঃ পরিচালন। পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ ক্রিয়া আছে।

শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থেও প্রাস অস্ত্রের বর্ণনা আছে। তাহার সহিত ইহার প্রায় ঐক্য আছে যথা—।

*   *   *

অর্থাৎ প্রাস অস্ত্র লম্বে ৪ হাত, তাহার দাণ্ডি বেণুদণ্ড নির্ম্মিত এবং মুখ ক্ষুরধার।

পিণাক—ইহা শূলাস্ত্রের নামান্তর মাত্র। যাহাকে আমরা ত্রিশূল বলি, তাহাই পিণাক। যথা—

*   *   *

অর্থাৎ ইহার কায়া কাংস্যদণ্ডে নির্ম্মিত, মস্তকে ত্রিশীর্ষ লৌহফলক, তাহার প্রান্ত বা অগ্রভাগ সুশাণিত এবং তাহার চক্ষু অতি ক্রূর। ভল্লুকের লোমের স্তবকাদির দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত। ইতস্ততঃ সঞ্চালন ও প্রোত্তন অর্থাৎ ফুড়িয়া ফেলা তাহার কার্য্য। উক্ত দুই মাত্র ক্রিয়া ত্রিশূলের আশ্রিত। আগ্নেয়ধনুর্ব্বেদে ইহার অন্য কএকটী ক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

*   *   *

গদা—গদা নামক শস্ত্রের আকার ও ক্রিয়া এইরূপ।

অর্থাৎ মুষ্টিস্থান স্থূল অবয়ব অষ্টাশ্র অর্থাৎ আট পোলা এবং হৃদয় পরিমাণ লম্বা। এতদ্ভিন্ন বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে অন্য এক প্রকার ঘোর দর্শন গদার বর্ণনা আছে। যথা—

এই লৌহময়ী গদা শিকার দ্বারা বাহিত হয়। ইহার শীর্ষদেশস্থূল ও গাত্র শতার অর্থাৎ শতপোয়াল-বিশিষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ কণ্টকে ইহার সর্ব্বাঙ্গ আচিত, লম্বে ৪ হাত এবং স্থূলতায় রথচক্রের নাভির তুল্য। দেখিতে ভয়ঙ্কর, মস্তকে কিরাট অর্থাৎ পাগড়ির ন্যায় বেড় থাকে, এবং ইহা সুবর্ণ শৃঙ্খলে বঙ্কিত বা গ্রথিত। ইহা গজ ও পর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে সক্ষম। ইহার দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইলে বিবিধ গতি শিক্ষা করিতে হয়। সে সকল [illegible] করণ ও গদার পরিচালন বিংশতি সংখ্যক। যথা বিচিত্র-মণ্ডল, গতিপ্রত্যগতি, পার্শ্বনোক্ষ বর্জন, পরিধান, অভিদ্রবণ, আক্ষেপ, নিগ্রহযুক্ত অবস্থান, পরাবর্ত্তন, সন্নিবর্ত্তন অবপ্লুতি উপপ্লুতি, দক্ষিণমণ্ডল, বামমণ্ডল, আবিদ্ধ, প্রসিদ্ধ, স্ফোটন, জ্বালন, উপন্যাস, ও অপন্যাস। মহাভারতোক্ত ভীমের গদা আর এই বৈশম্পায়নোক্ত গদা তুল্য বা এক বলিয়া অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে যে গদার উল্লেখ আছে, তাহাও এইরূপ। এরূপ গদার সদ্ব্যবহার অত্যন্ত বল সাধ্য।

মুদ্গরের মূলদেশকৃশ, স্কন্ধদেশ স্থূল, মস্তকে শীর্ষক থাকে না। লম্বে ৬ হাত, গুরুত্বে অষ্টভার।* ৎসরু অর্থাৎ মুটযুক্ত, আকার বর্ত্তুল বা গোল। ইহার পরিধি এক হস্ত। ইহার ঘূর্ণন ও নিপাতন এই দুইটি মাত্র ক্রিয়া আছে। পরন্তু আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে ইহার ৪ প্রকার ক্রিয়ার উল্লেখ আছে।

যথ ——

* * * *

হে ব্রাহ্মণ, তাড়ন, ছিন্নভিন্নকরণ চূর্ণিতকরণ ও প্রবণা ঘাত,—মুদ্গরের এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য জানিবে।

সীর—

* * * *

সীর বা লাঙ্গল অস্ত্রটী দ্বিবক্র অর্থাৎ দুই স্থানেই বাঁকা ও শিখাশূন্য।

---

* ২০ তোলা ও ৮০০ তোলায় এক ভার, পরন্তু এস্থলে ৮০০০ তোলা অর্থাৎ গ্রাহ্য এবং ৮ গুণে ২০ মোন। ২০ মোন লোহার গদা লইয়া যুদ্ধ করিত, এ কথা মনে করিতে ভয় হয়।

মূলদেশ ও মুখ লৌহবর্দ্ধ। সাৰ্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত দীর্ঘ এবং স্নিগ্ধ আকর্ষণ ও নিপাতন এই ক্রিয়াদ্বয় ইহাতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মুসল—

মুসলের, চক্ষু মস্তক হস্ত ও পদ কিছুই নাই। অর্থাৎ, সর্ব্বাঙ্গ সমান এবং ইহার নিপাতন পোথন এই দুইটী মাত্র ক্রিয়া আছে।

পট্টিশ—ইহা এক প্রকার তরবারি বিশেষ। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদ ও শুক্রনীতি এই তিন পুস্তকেই সমান বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা—

* * *

অর্থ এই যে, পট্টিশ নাম অস্ত্রটী খড়্গের সহোদর অর্থাৎ প্রায় খড়্গাকার। ইহা পুরুষ-প্রমাণ লম্বা, দুই দিকেই সমান ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ, ইহার মুষ্টী অর্থাৎ মুট হস্তত্রাণ যুক্ত। শুক্রনীতির বর্ণনাও এই রূপ।

* * *

ইহার ক্রিয়া খড়্গক্রিয়ার ন্যায় অনেক বিধ।

মৌষ্টিক—এই মৌষ্টিক অস্ত্রটী কেবল বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয়। যথা

মৌষ্টিক অস্ত্রের ৎসরু অর্থাৎ মুষ্টিস্থান অতি উৎকৃষ্ট। ইহার উচ্চতা প্রাদেশ অর্থাৎ অর্দ্ধহস্ত। অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ বা শাণিত এবং গ্রীবাদেশ কিছু উচ্চ। উদর প্রদেশ স্থূল ও সুশাণিত। এই মৌষ্টিকাস্ত্রের কার্য্য খড়্গ কার্য্যের ন্যায় বিচিত্র ও বহুবিধ।

পরিঘ—পরিঘ অস্ত্রটী বর্ত্তুল অর্থাৎ সুগোল। লম্বে পুরুষপ্রমাণ অর্থাৎ সার্দ্ধ ত্রিহস্ত। ইহা কেবল বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে হয়।

ময়ূখী—এ অস্ত্রের অন্য নাম কি? তাহা জানি না। ফল, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে এ নাম দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত গ্রন্থে ইহার যেরূপ বর্ণনা আছে, পাঠকবর্গ তাহা দৃষ্ট করুন।

পুরুষপ্রমাণ এক দীর্ঘ যষ্টি, তদগ্রে ফলা ও তদগ্রে কিঙ্কিণীজাল এবং ইহার মুষ্টি আছে। আঘাত, প্রতিঘাত, এবং বিঘাত, পরিমোচন ও অভিদ্রবণ, এই পাঁচকার্য্য ইহার আশ্রিত।

শতঘ্নী—এই শতঘ্নী সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া

থাকেন। কেহ বলেন, আধুনিক কামান্ আর পূর্ব্বকালে এক প্রকার প্রস্তর নিক্ষেপ কাষ্ঠযন্ত্র ছিল তাহাই তৎকালের শতঘ্নী। বস্তুতঃ এই দুই মতের কোন মতেরই পোষক প্রমাণ পাওয়া যায় না পরন্তু "শতঘ্নী" এই নামের ব্যুৎপত্তি প্রতি দৃষ্টি করিলে উক্ত উভয় মতই যথার্থবাদী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নীলকণ্ঠ ভট্ট মহাভারতের টীকায় উক্ত উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণের টীকাকার রামানুজ স্বামী ইহাকে কণ্টকময়ী বৃহৎ মুদ্গর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদের ৫ম অধ্যায়ে আমরা রামানুজের মতের পোষক প্রমাণ দেখিতেছি; যথা—

* * *

কণ্টকাচিত, লৌহসার নির্ম্মিত, মুদ্গরকল্প, সুদৃঢ় ও বর্ত্তুল শতঘ্নী নামক আয়ুধের প্রমাণ ৪ হাত এবং তাহার ধনুক অর্থাৎ মূট আছে। গদাযুদ্ধের বন্ধন অর্থাৎ প্রয়োগ কালীন আস্ফালন যেরূপ, ইহারও বন্ধন সেই রূপ।

বৈশম্পায়নের এই বচন শতঘ্নীকে মুদ্গরবিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেও তন্নামক আগ্নেয়-অস্ত্রবিশেষ যে ছিল না এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেন না ইহার দ্বারা এক কালে শত পুরুষের হনন সিদ্ধি হয় না এবং অগ্নি প্রদীপ্তও হয় না সুতরাং শতঘ্নী নামক অন্য কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। মহাভারতে অন্য একটী বচন আছে, তদ্দৃষ্টে এ অনুমান নিঃশঙ্কিত হইতে পারে। যথা—

* * * *

এবচনে মুদ্গর হইতে ভিন্ন এক প্রকার প্রদীপ্ত শতঘ্নী পাওয়া যাইতেছে,। এতদ্ভিন্ন মহাভারতের মধ্যে এরূপ শত শত বাক্য আছে, যাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে মুদ্গর কল্প শতঘ্নী হইতে ভিন্ন একরূপ আগ্নেয়শতঘ্নী ছিল বলিয়া নির্ণয় হইতে পারে। সেই জন্যই টিকাকার নীলকণ্ঠ ভট্ট ইহাকেও সেই সেই স্থানের শতাঘ্নীকে আগ্নেয়দ্রব্যবলপ্রয়োজ্য "কামান" বলিয়াছেন। ফল, (শতাঘ্নী-শব্দের দ্বারা কামানের পূর্ব্বাস্তিত্ব সিদ্ধ না হউক,) পূর্ব্বে যে সকল প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্বারা কামানের পূর্ব্বাস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।